কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক বি. এ. পরীক্ষার
জন্য নির্দিষ্ট সমাজদর্শনের নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত

সমাজদর্শনের রূপরেখা

(ত্রৈবার্ষিক বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক)

ডক্টর সুধীররঞ্জন দাশ

এম. এ., ডি. ফিল.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচীন ভারতীয়
ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রভৃতির অধ্যাপক ; দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

অধ্যাপিকা মীনু গুহ এম. এ.

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা, উইমেন্‌স্‌ কলেজ, কলিকাতা ;
দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা মুরলীধর গার্লস
কলেজ, কলিকাতা।

বাণীরূপা

৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক
অমিয়কুমার ভট্টাচার্য
বাণীরূপা
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅজিতকুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১-এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

নিবেদন

সমাজদর্শন-বিষয়টি নূতন হইলেও আধুনিক যুগে সকল মনীষীই ইহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন। কারণ, ইহাতে দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দর্শন বলিতে জনসাধারণ ও শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণ কেবল জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা বুঝিয়া থাকে। কিন্তু সমাজকে আদর্শের পথে পরিচালিত করিবাব জন্য ইহার ব্যবহারিক মূল্য যে কিছুমাত্র কম নয়, ইহা বর্তমানের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্‌গণ বিশেষভাবে স্বীকার কবেন।

এই-সকল কারণে দর্শনশাস্ত্রের একটি অংশরূপে সমাজদর্শন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্যসূচীব মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিযাছে। কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও সমাজদর্শনকে তাহাদের ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর দর্শনেব পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজদর্শন অত্যাধুনিক বিষয় হওয়াতে এই বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, ইংরেজীতেও এই বিষয়ে পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাহাদের এই অসুবিধা-দূরীকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত পাঠ্যসূচী-অনুসরণে মাতৃভাষায় সমাজদর্শনের পুস্তক-রচনারূপ দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইযাছি।

মাতৃভাষায় সমাজদর্শনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা খুব সহজ নহে। কাবণ, এই বিষয়ে পুস্তক বচনা করিতে হইলে গ্রন্থকারকে দর্শন ব্যতীতও সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সহিত, বিশেষ করিয়া সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতির সহিত সুপরিচিত হইতে হয়। এই-সকল বিষয়ের ব্যাপকতা পরিহার করিয়া কেবলমাত্র সারাংশটুকুর উল্লেখ কবা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

উপরন্তু, মাতৃভাষায় বিষয়বস্তুর সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করাও সহজ কাজ নহে। কারণ, উপযুক্ত পরিভাষার অভাব হওয়াতে গ্রন্থকারকে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে এই-সকল পরিভাষার ব্যবহার যেখানে যেখানে করা হইয়াছে, তাহার পাশেই ইংরেজী শব্দও রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের সুবিধা ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া

আমরা যথাসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছি।

এই পুস্তকের ভালমন্দ সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন; ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দই তাহার বিচার করিবেন। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারা যায় যে, ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনার্থে এবং তাহাদিগকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই পুস্তকটি রচিত হইয়াছে। এইজন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলা উভয় প্রকারের সংজ্ঞা দিয়া ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে বিষয়বস্তুর আলোচনা ও সমালোচনা করিয়া পরিশেষে মূলসিদ্ধান্ত সম্পর্কেও আভাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরীক্ষার সময়ে ছাত্রছাত্রীদের স্মরণ-শক্তির সহায়তার জন্য প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের সারাংশ তাহার বামপার্শ্বে ছোট ছোট অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের বুঝিবার ও মনে রাখিবার সুবিধার্থে আমরা প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় যথাসম্ভব ভারতীয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বিষয়টি সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং সংখ্যা-নির্দেশপূর্বক প্রধান প্রধান যুক্তি উল্লেখ করিয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের সম্পর্কে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চিত্র ও নকশার সাহায্যে বিষয়-বস্তু আরও সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি ও মতামত আলোচনা করিয়া মূলসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর যথাসম্ভব সহজ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক আলোচনা করিবার চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই।

অধ্যায়গুলি ভাগ করা হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী-অনুসারে এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগ পাঠ্যসূচী-অনুসারেই পর পর লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র তাহাদের উত্তরের নির্দেশ দিয়াছি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির সহায়তার জন্য। যে-সকল প্রামাণ্য পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহার একটি তালিকাও শেষাংশে যোগ করা হইল। আশা করি, ছাত্র-ছাত্রীরা তাহার দ্বারাও উপকৃত হইবে। ম্যাকেঞ্জি, ম্যাকাইভার, হবহাউস, গিসবার্ট, গিন্সবার্গ, রাইট প্রভৃতির রচিত গ্রন্থ আমাদের প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। এই গ্রন্থকারদের প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। পরিভাষার জন্য বাংলা

ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের যে সকল পুস্তক পূর্বেই রচিত হইয়াছে, সে-সকল পুস্তকের গ্রন্থকারদের কাছেও আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পুস্তকটিকে ত্রুটিহীন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও কয়েকটি ছাপার ভুল পুস্তকের মধ্যে রহিয়া গেল। যথাসময়ে প্রকাশ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া এই ত্রুটিটুকু পরিহার করা গেল না। সহৃদয় পাঠকগণ, আশা করি, তাহা মার্জনা করিবেন। পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকটিকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। সাধারণ লোকও পুস্তকটি পাঠ করিয়া সমাজদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন। সমাজতত্ত্বের ছাত্রছাত্রীরাও পুস্তকটি পাঠ করিয়া কিছুটা উপকৃত হইবে বলিয়া আশা করি। যাহা হোক, এই পুস্তকের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা যদি যথার্থই উপকৃত হয়, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। আশা করি, সমাজদর্শনের এই স্বল্প-পরিসর পুস্তকটি পাঠ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা সর্বাধিক উপকৃত হইবে।

পুস্তকটির আরও উন্নতির জন্য ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের মতামত সাদরে গৃহীত হইবে।

পরিশেষে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্যকে, যাঁহার উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা সম্ভব হইত না।

কলিকাতা,

২রা জুলাই, ১৯৬০

গ্রন্থকারদ্বয়

Calcutta Uuiversity Syllabus

SOCIAL PHILOSOPHY

Social Philosophy : Its meaning and scope. Relation to Sociology, Psychology, Politics and Ethics.

The Social nature of man. Society and the Individual. ndividualism and Socialism. Society as an Organism. The Idea of Common good.

Social Groups and Institutions : Family, Community, State, Church, Educational Institutions and Cultural Associations. Their Psychological and Philosophical Bases.

Conditions of Social Development. Social Ideals Herd Sentiments, Common interests. Religion as a cohessive force.

The Marxist Interpretaion. Naturalistic Theories.

Social Pathology : Crime and Punishment. Social Evolution and Progress. The Social Self. The Ethos of a People.

Burdwan University Syllabus

SOCIAL PHILOSOPHY

Social Philosophy : Its meaning and scope. Relation to Sociology, Psychology, Politics and Ethics.

The Social nature of man. Society and the Individual.

Individualism and Socialism. Society as an Organism. The Idea of Common Good.

Social Groups and Institutions : Family, Community, State, Church, Educational Institutions and Cultural Associations.

Their Psychological and Philosophical Bases.

Conditions of Social Development, Social Ideals. Herd Sentiments, Common Interests. Religion as a Cohesive Force. The Marxist Interpretation. Naturalistic Theories.

Social Pathology : Crime and Punishment. The Philosophical basis of Social Evolution and progress. The Social Self. The Ethos of a People.

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজদর্শনের রূপরেখা

সমাজ, সামাজিক বিজ্ঞান এবং সমাজদর্শন

(Society, Social Science and Social Philosophy)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজেই জন্মগ্রহণ করে এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকে, কোন-না-কোনপ্রকার সমাজের মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন একত্র হয়, তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তখনই একটা সমাজ গড়িয়া উঠে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন-না-কোন প্রকারের সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। এই সম্বন্ধ নিয়ত পরিবর্তনশীল ও জটিল। এই সামাজিক সম্বন্ধের জালকেই সমাজ বলা হয়।[১] অর্থাৎ মানুষের সহিত অন্যান্য ব্যক্তির সম্পর্কের জটিলতাই হইল সমাজ।

সমাজ কি?

মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের দ্বারাই ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে। এইজন্য সমাজকে মানুষের সামাজিক কার্যাবলীর উপর, তাহাদের যোগাযোগের উপর নির্ভর করিতে হয়। মানুষের সহিত মানুষের যোগাযোগ বা পারস্পরিক সম্পর্ক তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা—(১) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগ, (২) ব্যক্তির সহিত গোষ্ঠীর যোগাযোগ ও (৩) গোষ্ঠীর সহিত গোষ্ঠীর যোগাযোগ। গোষ্ঠীকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) প্রাথমিক গোষ্ঠী ও (২) মাধ্যমিক গোষ্ঠী। প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচয় গভীর থাকে। তাহাদের মুখোমুখি পরিচয় থাকে বলিয়া তাহাদিগকে মুখোমুখি গোষ্ঠীও বলা হইয়া থাকে। খেলার দল, পরিবার, গ্রাম ইত্যাদি এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি সভ্যদের স্বার্থভাবের বা অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে পরিচয়

বিভিন্ন প্রকারের পারস্পরিক সম্পর্ক

১। "Society is the changing pattern of social relationship".—Maciver

খুব গভীর থাকে না। শ্রমিকসঙ্ঘ, কর্পোরেশন, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ইত্যাদিকে মাধ্যমিক গোষ্ঠী বলা হয়। আধুনিক যুগে মাধ্যমিক গোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশী।

গোষ্ঠীর বাহিরে ব্যক্তির কোন সত্তা নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তির জীবনের সমস্ত কার্য, তাহার অভ্যন্তরীণ বা বাহ্য জীবন গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই যে সামাজিক সম্পর্কের জাল, যাহার দ্বারা মানুষের জীবন গঠিত হয়, তাহাকেই বলে সমাজ। ইহাই সামাজিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ রূপ।

ক্ষুদ্র সমাজ ও বৃহৎ সমাজ

সমাজ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয়প্রকারই হইতে পারে। গ্রাম ও শহরের যে সমাজ তাহা ক্ষুদ্র, জাতি বা সাম্রাজ্যের যে সমাজ তাহা বৃহৎ, আর সমগ্র পৃথিবীর সমাজকে বৃহত্তম সমাজ বলা যাইতে পারে। মানুষের কার্যাবলী কেবল গ্রাম, শহর, জাতি বা সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা-বৃদ্ধির ফলে আধুনিক যুগে মানুষের কার্যাবলী সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রবৃত্তি

সুতরাং সমাজ ব্যতীত মানুষ জন্মিতে পারে না, বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, জীবনের প্রতি মুহূর্তে মানুষকে সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। মানুষই কেবল সমাজবদ্ধ জীব নয়, পশুপক্ষীদের মধ্যেও আমরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার এই প্রবৃত্তি লক্ষ্য করি। নিজেদের খাদ্যের জন্য, নিরাপত্তার জন্য, শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য, দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা পশু-পক্ষীদের মধ্যেও বর্তমান। মানুষকেও তাহার সকলপ্রকার সুযোগ-সুবিধা-লাভের জন্য সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়।[১] মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সফল করিতে হইলে সমাজের মধ্য দিয়াই তাহা করা সম্ভব হয়। এইজন্যই গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, যে-মানুষ সমাজে বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, সে হয় দেবতা, না হয় পশু।

আধুনিক যুগে মানুষের সমাজের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন

১। "Man is dependent on society for protection, comfort, nurture, education, equipment, opportunity and the multitude of definite services which society provides".—Maciver and Page

বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, যথা—নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি। এই-সকল বিজ্ঞানে মানুষের বিভিন্ন প্রকারের কার্যকলাপ লইয়া আলোচনা করা হয়। এই বিজ্ঞান-গুলিকে সামাজিক বিজ্ঞান বা Social Science বলা হয়। যে-বিজ্ঞান সমগ্রভাবে সমাজের আলোচনা করে, তাহাকে সমাজতত্ত্ব (Sociology) বলা হয়। সমাজতত্ত্ব মানুষের কার্যাবলী, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাহাদের কারণ ও ফলাফল লইয়া সমগ্রভাবে আলোচনা করে।

সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব

সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বে (Sociology) পার্থক্য আছে। সামাজিক বিজ্ঞান মানুষের বিভিন্ন কার্যের, সমাজের বিভিন্ন দিকের বিশদ আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে করে। সমাজতত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে সমাজের বিভিন্ন দিকের আলোচনা না করিয়া সমগ্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের আলোচনা করে। সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য সামাজিক জীবনের সমগ্রভাবে আলোচনা করা। বিজ্ঞান হিসাবে ইহা বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলকে একত্র করিয়া মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে একটা সুশৃঙ্খল মতবাদ গড়িয়া তোলে। সুতরাং সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্র সামাজিক বিজ্ঞানগুলি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক।

সমাজদর্শন আবার সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের ফলাফলগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজদর্শন এই-সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে ও সর্বোচ্চ আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের বিচার করে। তবে সমাজদর্শনের প্রধান কাজ মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়া। সমাজদর্শন সমাজের সম্মুখে সুচিন্তিত আদর্শ স্থাপন করে ও ঐ আদর্শকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নির্দেশ দেয়।

সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শন

প্রথম অধ্যায়

সমাজদর্শনের অর্থ এবং পরিধি

(The Meaning and Scope of Social Philosophy)

১। **সমাজদর্শনের অর্থ** (The Meaning of Social Philosophy): সমাজদর্শনের আলোচনা অপেক্ষাকৃত নূতন। কারণ, সমাজদর্শনকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পড়িবার রীতি কেবল আধুনিক যুগেই প্রচলিত হইয়াছে। সমাজদর্শন সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। সমাজতত্ত্বের মধ্যে সমাজের উৎপত্তি, গঠন, আইন-কানুন, ভাষা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি সবই আলোচিত হয়। ইহা ছাড়াও রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদি সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর, সমাজদর্শন প্রধানতঃ সমাজের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূল্য লইয়া আলোচনা করে। এখন সমাজ কেমন, কি ছিল বা কি হইবে, তাহা লইয়া আলোচনা করা সমাজদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সমাজ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া আলোচনা করাই সমাজদর্শনের প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ সমাজদর্শন আদর্শমূলক, তবে সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে বা সমাজতত্ত্বের কোন অংশকে সমাজদর্শন অবহেলা করে না। তাহাদের ফলাফলগুলির বিচার করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ করে। প্রকৃতপক্ষে সমাজদর্শন সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মিলনস্থল।[১]

সমাজদর্শন সমাজের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূল্য লইয়া আলোচনা করে

ব্যক্তির জীবনে যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে, সমাজজীবনেও সেইরূপ একটা উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকে। সমাজজীবনের আদর্শ জনকল্যাণসাধন করা, জনকল্যাণের ভিত্তিতে সমাজের উন্নতিসাধন করা, সামাজিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করা, সমাজজীবনের চরম মূল্য লাভ করা। কিন্তু কি উপায়ে এই আদর্শে পৌছান যায়, তাহা

সমাজজীবনের আদর্শ জনকল্যাণসাধন করা, সমাজজীবনের চরম মূল্য লাভ করা

১। "Social Philosophy, as the very name indicates, is the meeting point of Sociology and Philosophy."—Gisbert

বলা কষ্টকর। তবে একমাত্র সমাজদর্শনই এই উপায় সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু এই বিষয়টি এখনও প্রগতির পথে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় নাই বলিলেই চলে।

সমাজদর্শনের কাজ সম্পর্কে গিস্‌বার্ট (Gisbert) বলিয়াছেন, সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার জন্য এবং বিশ্বে তাহাদের স্থান নিরূপণ করিবার জন্য সমাজদর্শনের কাজ সমাজজীবনের মূলনীতি ও ধারণাগুলির জ্ঞানবিষয়ক (Epistemological) ও মূল্যবিষয়ক (Axiological) আলোচনা করা। সমাজদর্শনের জ্ঞানবিষয়ক কাজ তিন প্রকারের—(১) **তত্ত্বমূলক** (Ontological), (২) **সমালোচনামূলক** (Criteriological) এবং (৩) **সমন্বয়মূলক** (Synthetic)।

সমাজদর্শনের দুইটা দিক

তত্ত্বমূলক কাজের মধ্য দিয়া সমাজদর্শন সমাজজীবনের মৌলিক ধারণা ও নীতিগুলির, যথা—মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, সুখ, ন্যায়পরতা ইত্যাদির আলোচনা করে। সমালোচনামূলক কাজের দ্বারা সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানের ভিত্তি, নীতি ও সিদ্ধান্তগুলির সত্যতা অন্বেষণ করে ও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহাদের বিচার করে। অর্থাৎ এই দর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির যাহা স্বীকার্য সত্য, সমাজের মূলনিয়ম ও পূর্বকল্পিত ধারণাগুলির সমালোচনা করিয়া তাহাদের যৌক্তিকতা বিচার করে ও মূল্য নির্ধারণ করে। সমন্বয়মূলক কাজের দ্বারা সমাজদর্শন নিজস্ব ফলাফলের সহিত অন্যান্য যে-সকল বিজ্ঞান 'মানুষ' সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাহাদের ফলাফলকে একত্র করে, অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সহিত সমাজদর্শনের সিদ্ধান্তকে সংযুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। দর্শনের কাজই হইল বিভিন্ন বিজ্ঞানের নির্ধারিত সত্যগুলিকে সংযুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা। এইভাবে সামাজিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়ের দ্বারা সমাজদর্শন দর্শনের স্তরে উন্নীত হয়।

(১) সমাজদর্শনের জ্ঞানের দিক

সমাজদর্শনের অপর একটি কাজ হইল—মূল্যবিষয়ক আলোচনা। এই দিকটি সমাজের চরম আদর্শ কি, তাহা নির্ধারণ করে এবং কি উপায়ে সমাজ চরম আদর্শে পৌছিতে পারে, তাহার নির্দেশ দেয়। সমাজদর্শন আদর্শমূলক, ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় সমাজের মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ।

ইহার মূল্যবিষয়ক কাজের উদ্দেশ্য হইল চরম মূল্যের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া সামাজিক কল্যাণ লাভ করা।[১] ম্যাকেঞ্জির মতেও সমাজদর্শনের আদর্শ মানুষের মধ্যে সামাজিক ঐক্য স্থাপন করা এবং সেই ঐক্যের ভিত্তিতে মানবজীবনের বিশেষ দিকগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করা। এখন সমাজের অবস্থা কেমন, কি ছিল বা কি হইতে পারে, তাহা আলোচনা করা সমাজদর্শনের কাজ নয়, বরং ইহার অস্তিত্বের তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণ করাই সমাজদর্শনের কাজ।

(২) সমাজদর্শনের মূল্যের দিক

সুতরাং সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজের সম্মুখে সুচিন্তিত আদর্শ স্থাপন করে। সমাজ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আলোচনা করে এবং আদর্শকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নির্দেশ দেয়। কিভাবে আদর্শ সমাজজীবন যাপন করা যায়, কি ভাবে ঐক্য ও শান্তি লাভ করা যায়, কিভাবে সমাজের প্রকৃত উন্নতি করা যায়, সমাজদর্শন তাহার উপায় অন্বেষণ করে।

সমাজদর্শনের লক্ষ্য

২। সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু বা পরিধি (The Scope of Social Philosophy):

সমাজদর্শনের পরিধি কতদূর বিস্তৃত, তাহা জানিতে হইলে ইহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই সমাজতত্ত্বের (Sociology) সহিত সমাজদর্শনের সম্পর্ক কি, তাহা আলোচনা করিলে সমাজদর্শনের পরিধি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সহজ হইবে।

(ক) সমাজতত্ত্বের পরিধি অতি ব্যাপক। কারণ, সমাজতত্ত্বের মধ্যে সমাজের উৎপত্তি, আইন-কানুন, ভাষা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, কাজ, অনুভূতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদি সব-কিছু বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। সমাজতত্ত্বের পরিধি এত ব্যাপক যে, কোন একটি বিশেষ পুস্তক পাঠ করিয়া সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভক্ত। ইহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ইহার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। সেই অনুপাতে সমাজদর্শনের পরিধি অনেক

১। "Its object is, therefore, the attainment of the social good in itself and in its relations with ultimate ends".—Gisbert

সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমাজদর্শন আদর্শমূলক। সমাজের আদর্শ কি হওয়া উচিত এবং কি উপায়ে আদর্শে পৌছিতে পারা যায়, তাহা নির্ধারণ করাই সমাজ-দর্শনের কাজ।

(খ) সমাজদর্শনের প্রধান কাজ মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়া—সমাজ কেমন, কি ছিল বা কি হইতে পারে, তাহা আলোচনা করা সমাজদর্শনের কাজ নহে, বরং ইহার অস্তিত্বের তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণ করাই সমাজদর্শনের কাজ। সুতরাং সমাজদর্শন সমাজতত্ত্বের মত বাস্তব সমস্যা লইয়া আলোচনা করে না, তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সমাজদর্শনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত :—

(১) সমাজদর্শন সাধারণ দর্শনের মত চরমতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করে না। মানুষের সহিত সমগ্র বিশ্বের সম্পর্কের আলোচনা করিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করাই সমাজদর্শনের কাজ।

(২) সমাজদর্শন সমাজতত্ত্বের ফলাফলগুলির সহিত মানবজীবনকে সম্পর্কিত করে। রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মানুষের সহিত তাহাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করে।

(৩) সমাজদর্শন সর্বোচ্চ মূল্য বা আদর্শের সহিত মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে। সমাজতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলির আলোচনা করিয়া কিভাবে আদর্শের দিকে তাহাদিগকে পরিচালিত করা যায়, তাহার নির্দেশ দেয়।

(৪) সমাজদর্শন মানবজীবনের আচরণের বিভিন্ন দিকের বিচার করিয়া উচিত-অনুচিতের, ভাল-মন্দের, সৎ-অসতের মান নিরূপণ করে। প্রকৃতপক্ষে কোন কাজটি সমাজের পক্ষে ভাল এবং কোনটি মন্দ, সমাজদর্শন তাহার নির্দেশ দেয়। এই কাজে সমাজদর্শনের সহিত নীতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে।

(৫) মানুষের ও সমাজের উন্নতি লক্ষ্য করা এবং তাহাদের কিভাবে উন্নতি হইবে, তাহার নির্দেশ দেওয়া সমাজদর্শনের কাজ। সমাজের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সমাজদর্শন নিরূপণ করে।

(৬) ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির কি আদর্শ হওয়া উচিত, অর্থাৎ সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করিতে হইলে কি আদর্শে সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত, সমাজদর্শন তাহার নির্দেশ দেয়।

(৭) সমাজের আদর্শ নিরূপণ করিতে হইলে সমাজ কি, কাহাকে লইয়া সমাজ গঠিত, সমাজের মানুষের প্রকৃতি কিরূপ, সমাজের সহিত তাহাদের সম্পর্ক কিরূপ ইত্যাদি প্রশ্ন লইয়া সমাজদর্শনকে আলোচনা করিতে হয়। এক কথায় মানুষ ও তাহার সামাজিক প্রকৃতি, ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি আলোচনা সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

(৮) সমাজকে জানিতে হইলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। সুতরাং ইহারাও সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু।

(৯) ইহাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্ধারণ করা সমাজদর্শনের কাজ। এইজন্য সামাজিক আদর্শের (Social Ideals) আলোচনাও সমাজদর্শনের অন্যতম বিষয়।

(১০) ধর্ম সমাজজীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ। সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। ইহার ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকারের প্রভাবেই সমাজ প্রভাবান্বিত হয়। এইজন্য ধর্ম কি, ধর্ম কিরূপ হওয়া উচিত, সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ইত্যাদি আলোচনাও সমাজদর্শনকে করিতে হয়।

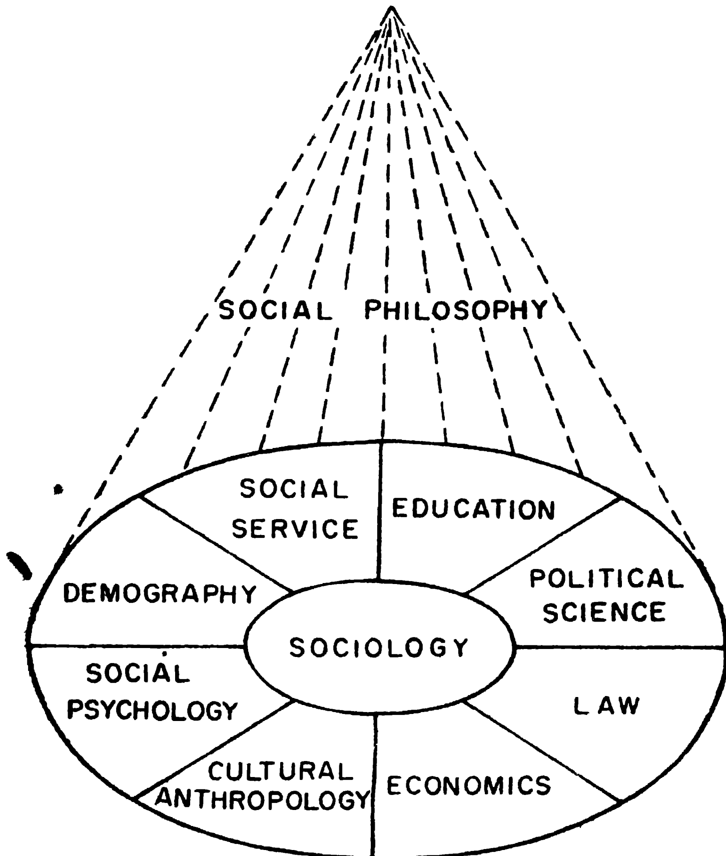
(১১) সমাজব্যাধির আলোচনা সমাজদর্শনের আর একটি কাজ। কারণ, যখন ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের সংশোধনের ও শাস্তিবিধানের সমস্যা উপস্থিত হয়। এইজন্য সমাজব্যাধির ও অপরাধীদের শাস্তিবিধানের আলোচনা সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

(১২) ইহা ছাড়া সামাজিক বিবর্তন (Social Evolution), সমাজ-জীবনের মূলনীতি ও ধারণাগুলির আলোচনাও সমাজদর্শনের অন্যতম বিষয়বস্তু।

(১৩) পূর্বেই বলা হইয়াছে, সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ, আর সমাজতত্ত্ব বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু সমাজদর্শন আদর্শমূলক হইলেও সমাজতত্ত্বের সহিত ও তাহার অন্তর্গত সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সহিত ইহার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজ-দর্শন সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত জীবতত্ত্ব (Biology), মনস্তত্ত্ব, শিক্ষাবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, রাজনীতি, আইন, অর্থনীতি ইত্যাদি কোন বিষয়কে অবহেলা করে না। কারণ, এই-সকল বিজ্ঞান মানুষের বিভিন্ন প্রকারের কার্যকলাপ লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করে। সমাজদর্শন ইহাদের সিদ্ধান্তের বিচার করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ করে।

(১৪) অবশ্য, ইহা সত্য যে, সামাজিক বিজ্ঞানগুলি উপায় লইয়া আলোচনা করে, আর সমাজদর্শন আলোচনা করে উদ্দেশ্য বা আদর্শ লইয়া। কিন্তু উপায় ও আদর্শ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সহিত সমাজ-দর্শনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। উদ্দেশ্য উপায়কে অবজ্ঞা করিতে পারে না, আবার উদ্দেশ্য না থাকিলে উপায়ও অর্থহীন হইয়া পড়ে। এইজন্য সমাজদর্শন আদর্শ লইয়া আলোচনা করিলেও উপায়কে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিতে পারে না।

এইজন্যই গিস্‌বার্ট (Gisbert) মনে করিয়াছেন যে, সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির স্বর্ণ মুকুট হইতে বাধ্য। ("Social Philosophy is bound to be the golden crown of the social sciences.")। সুতরাং সমাজদর্শনের কাজ সামাজিক বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে, উচ্চতর সমন্বয়ের দিকে।



সামাজিক বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শন

পূর্বপৃষ্ঠায় গিন্সবার্ট-প্রদত্ত সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শনের সম্পর্কের একটি নকশা দেওয়া হইল। সমাজতত্ত্ব সামাজিক বিজ্ঞানগুলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহাদের কাজ তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা। সমাজদর্শন ইহাদের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া উচ্চতর সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হয়।

৩। সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব (Importance of Social Philosophy) :

মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সমাজদর্শনের প্রয়োজন

মানুষের জীবনের আদর্শ নিরূপণ করিবার জন্য, মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করিবার জন্য, সমাজের মধ্য দিয়া মানুষের পরিপূর্ণতার পথের নির্দেশ দিবার জন্য সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে বিষয় হিসাবে ইহা এখনও খুব সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে নাই। কারণ, সমাজদর্শনের আলোচনা অপেক্ষাকৃত নূতন। কিন্তু মানুষ দিন দিন এই দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে। মানবজাতির জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করিয়া এই দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নততর আকার ধারণ করিবে আশা করা যায়।

বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার জন্য সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজদর্শনের ভিত্তি সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ফলাফল। কিন্তু সমাজদর্শন তাহাদের পৃথক পৃথক ফলাফলের মধ্যে এক মূলগত ঐক্য লক্ষ্য করে এবং তাহাদের সংযুক্ত করিয়া সমন্বয়সাধন করে। প্রকৃত সত্যকে লাভ করিতে হইলে এইরূপ সমগ্রভাবে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

সমাজদর্শন সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ

সমাজদর্শন এখনও সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ না করিলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজদর্শনই মানবজাতির ও সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং মানুষের মধ্য হইতেই এই দর্শনের ক্রমবিকাশ সম্ভব। সমাজের আদর্শকে জানিতে পারিলেই সমাজের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। আদর্শকে লাভ করিবার চেষ্টার দ্বারাই সমাজের ক্রমোন্নতি সম্ভব হয় এবং আদর্শ সমাজ গড়িয়া ওঠা সহজসাধ্য হয়।

কিন্তু সমাজদর্শন মানবজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিরূপে সুস্পষ্ট

আকার তখনই ধারণ করিতে পারে, যখন সমাজতত্ত্ব শিক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। কারণ, সমাজতত্ত্ব হইল সমাজদর্শনের ভিত্তি। মানুষ যখন সমাজে তাহার স্থান কোথায় বা সমাজের সহিত তাহার কি সম্পর্ক, তাহা আবিষ্কার করিতে পারে, তখনই জীবনের আদর্শ কি হওয়া উচিত, তাহা সঠিক নির্ধারণ করিতে পারে। মানুষ তখন বুঝিতে পারে যে, সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দ্বারা প্রকৃত উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। সকলের সহযোগিতার দ্বারাই আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিবে, যে সমাজে সকল ব্যক্তিই পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করিবে।

সমাজদর্শন জীবনের আদর্শ নির্ধারণ করে

কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে সমাজদর্শন মূল্যহীন। সমাজদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ, সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে তাহাদের এমন কোন জ্ঞানই নাই, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ দর্শনের জ্ঞান গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহাদের কাছে সমাজদর্শন জ্ঞানী ব্যক্তিদের কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ ধারণার সমষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সমাজদর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সকলকেই যে সমাজবিজ্ঞানী হইতে হইবে, তাহা নয়। সমাজতত্ত্বের মূলনীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করিয়া লোকে সমাজদর্শন কি, সমাজবিজ্ঞানীর কাছে ও সাধারণ লোকের কাছে ইহার কি মূল্য হইতে পারে—এই-সকল আলোচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে।

সাধারণ লোক ও সমাজদর্শন

সমাজদর্শনের কাজ ও দায়িত্ব যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। সামাজিক বিজ্ঞানগুলির পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত একত্র করিয়া দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহাদের বিচার করা ও তাহাদের মূল্য নিরূপণ করা এবং সর্বোচ্চ আদর্শের পথে সমাজকে পরিচালিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সমাজদর্শন এই কার্যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইবে। কিন্তু এই দুরূহ কার্য সফল করিতে হইলে সমাজদর্শনকে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মূলনীতি ও ভিত্তির বিচার করিতে হইবে, সমাজতত্ত্বের জটিল মূলতত্ত্ব, অনুমান, স্বীকার্য সত্য ইত্যাদির সমালোচনা করিয়া আদর্শের আলোকে তাহাদিগকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে।

সমাজদর্শনের কাজ

এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে প্রয়োজন সমাজদার্শনিকের। সমাজদার্শনিকই সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া প্রকৃত সমাজদর্শন গড়িয়া তুলিতে পারেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এইজন্য ইহার কেবল জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবার আশংকা রহিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে প্রকৃত ফলপ্রসূ সমাজদর্শন গড়িয়া উঠিতে পারে, যাহাতে সমাজদর্শনের আদর্শকে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। সমাজে সকলেই যদি জ্ঞানী ও শিক্ষিত হয়, তবেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বলিতে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বুঝায় এবং ভাষা-শিক্ষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা জন্মে। আদর্শকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সকলের কাছে তাহা সহজ ও সুস্পষ্ট করিতে হইলে, সমাজদর্শনের মূলনীতিগুলির সহজ ও সরল প্রকাশের ব্যবস্থা করা সমাজদার্শনিকের কর্তব্য। অবশ্য, নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও অস্পষ্টভাবে হইলেও সমাজদর্শনের কাজ অগ্রসর হইতেছে।

সমাজদার্শনিকের দায়িত্ব

সমাজদার্শনিকের কর্তব্য সমাজদর্শনকে আরও সুস্পষ্ট করা, আরও ব্যাপক করা, আরও সহজবোধ্য করা। সমাজদার্শনিককে মূল্য বা আদর্শের মানদণ্ডকে সামাজিক জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের নৈতিক মূল্য বিচার করিতে হইবে। তাঁহার প্রধান কর্তব্য এই-সকল কার্যের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করা, সমাজের কল্যাণের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা। সমাজদার্শনিক অবশ্য নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার কার্য ও দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা কঠিন ও দুঃসাধ্য।

সমাজদার্শনিকের কর্তব্য

৪। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক (Relation of Social Philosophy with other subjects) ঃ

সমাজদর্শন সমাজতত্ত্বের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজতত্ত্বের ফলাফলগুলিকে সমাজদর্শন একত্র করিয়া আদর্শের দিকে সমাজকে পরিচালিত করে। সুতরাং সমাজদর্শনকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলিতে হয়। তবে সমাজদর্শন

তাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এবং মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের বিচার করিয়া তাহাদের সম্মুখে সুচিন্তিত আদর্শ স্থাপন করে। নিম্নে কয়েকটি সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত সমাজদর্শনের সম্পর্ক আলোচনা করা হইল :—

(ক) সমাজদর্শন ও সমাজতত্ত্ব (Social Philosophy and Sociology) :

Sociology is "the science or study of the origin, history and constitution of human society".—অর্থাৎ যে-বিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস, রীতিনীতি, কর্মপ্রণালী, আইনকানুন, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা করে, তাহাকে সমাজতত্ত্ব বলা হয়।

সমাজদর্শনের সহিত সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক খুব নিবিড়।

সম্পর্ক :—(১) সমাজদর্শনের প্রধান ভিত্তি হইল সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্ত। সামাজিক বিজ্ঞানগুলির যেখানে শেষ হয়, সমাজদর্শন সেখান হইতে আরম্ভ হয়। কারণ, সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তের বিচার করিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও সমাজের সম্মুখে সুচিন্তিত আদর্শ স্থাপন করে। আদর্শ ও বাস্তব পরস্পরবিরোধী নয়। বাস্তবের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করা উচিত। আবার বাস্তবই আদর্শের ভিত্তি। উদ্দেশ্য ও উপায় পরস্পরসাপেক্ষ পদ। সমাজদর্শন আদর্শমূলক হইলেও উপায়কে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিতে পারে না। গিস্‌বার্ট সমাজদর্শনকে সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মিলনস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার জন্য এবং বিশ্বে তাহাদের স্থান নিরূপণ করিবার জন্য সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের মূলনীতি ও ধারণাগুলির জ্ঞানের দিক (epistemological aspect) ও মূল্যের দিক (axiological aspect) আলোচনা করে।

সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে

(২) সমাজদর্শন ও সমাজতত্ত্ব পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করে। সমাজদর্শন সমাজতত্ত্বের সমস্ত সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। কারণ, সমাজতত্ত্বের সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। এই-সকল সত্য সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজদর্শনকে অগ্রসর হইতে হয় বলিয়া সমাজদর্শনের কাছে সমাজতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) সমাজতত্ত্বও আবার সমাজদর্শনকে পথপ্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করে এবং সমাজদর্শনের প্রদর্শিত আদর্শ অনুসারে নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠা করে। সমাজের সর্বোচ্চ আদর্শের নিরূপক হিসাবে সমাজতত্ত্ব সমাজ-দর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করে। এইজন্য সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শনকে অভিন্ন বলা যাইতে পারে।

(৪) সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শন প্রকৃতপক্ষে একই সঙ্গে চলে। সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সমন্বয়সাধন করিয়া লক্ষ্য বা আদর্শকে লাভ করিবার পথ প্রশস্ত করে।

(৫) সমাজতত্ত্বের মধ্যে যদি কোন অবাস্তবতা, দুর্বোধ্যতা বা বিচ্ছিন্নতা আসিয়া পড়ে, সমাজদর্শন তাহা সংশোধন করে এবং সমগ্রভাবে তাহার বিচার করিয়া নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইবার উপায় নির্দেশ করে।

পার্থক্য ঃ—(১) সমাজতত্ত্বের পরিধি বা আলোচনা-ক্ষেত্র সমাজদর্শন অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর। সমাজদর্শনকে সমাজতত্ত্বের একটি অংশ বলা যায়। কারণ, সমাজ-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত সকল সামাজিক বিজ্ঞানের বিশদ আলোচনা করা সমাজদর্শনের কাজ নয়।

(২) সমাজদর্শন আদর্শবাদী, আর সমাজতত্ত্ব বাস্তববাদী, অর্থাৎ সমাজ-দর্শন সমাজের মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়া আলোচনা করে। সমাজতত্ত্বকে সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন সমস্যা, যেমন—অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদির বাস্তবরূপ লইয়া আলোচনা করিতে হয়। সমাজদর্শন বিশেষ করিয়া মানবের সামাজিক ঐক্যের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সেই ঐক্যের ভিত্তিতে মানবজীবনের বিশেষ দিকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ। সুতরাং সমাজের বাস্তবরূপ সমাজতত্ত্বের ও তাহার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক বিজ্ঞানগুলির আলোচ্য বিষয়। আর, সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় সমাজ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া।

(৩) সমাজতত্ত্ব তথ্য লইয়া আলোচনা করে, সমাজদর্শন সেই তথ্যের সত্যতা যাচাই করে ও তাহার মূল্য নিরূপণ করে। সমাজতত্ত্বের মধ্যে আমরা সমাজের রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি লইয়া আলোচনা করি, কিন্তু ইহাদের ভালমন্দ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় না। সমাজদর্শন আদর্শবাদী বলিয়া

ইহা সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের ভালমন্দ বিচার করে। সমাজতত্ত্ব উপায় লইয়া আলোচনা করে, আর সমাজদর্শন আলোচনা করে উদ্দেশ্য লইয়া।

কিন্তু এই-সকল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শনের নিবিড় সম্পর্ককে ছিন্ন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সমাজদর্শন সমাজতত্ত্বের ধর্ম-স্বরূপ ("Social Philosophy is the religion of Sociology.")।

(খ) সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান (Social Philosophy and Psychology) :

Psychology is "the science of nature, functions and phenomena of the human soul or mind."

যে-বিজ্ঞান মানব-আত্মা বা মানব-মনের প্রকৃতি, কার্যাবলী ও স্বভাব লইয়া আলোচনা করে, তাহাকে মনোবিজ্ঞান বলা হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মনোবিজ্ঞানকে "the study of the soul and its accidents" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই মনোবিজ্ঞান মন-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা মনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

সমাজদর্শন সমাজের রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, ধারণা ইত্যাদির যৌক্তিকতা বিচার করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ করে। মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে, যথা—চিন্তা (thinking), অনুভূতি (feeling) ও ইচ্ছা (willing) ইত্যাদি। উভয়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু ভিন্ন হইলেও নিম্নলিখিত বিষয়ে তাহাদের মধ্যে গভীর ঐক্য আছে :

প্রথমতঃ, সামাজিক রীতিনীতি, ধারণা ইত্যাদির উৎপত্তি-স্থান মানুষের মন। তাহাদের অভিব্যক্তি মানুষের মনের উপর নির্ভরশীল। আমরা দেখিতে পাই, বিভিন্ন সমাজের রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের সমাজের প্রথা ও ইউরোপীয় সমাজের প্রথার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ, তাহাদের মনের প্রকৃতি আমাদের মনের প্রকৃতি অপেক্ষা ভিন্ন। সুতরাং সমাজদর্শনকে মনোবিজ্ঞানের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি ও আদর্শের আলোচনা করিতে গেলে সমাজের ব্যক্তিদের মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করাও বিশেষ দরকার।

তৃতীয়তঃ, সমাজের উৎপত্তি ও কার্যাবলীর আলোচনা করিতে হইলে মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ প্রভৃতির আলোচনাকেও অবহেলা করা যায় না। বস্তুতঃ মানসিক তথ্যের ভিত্তির উপরও সমাজদর্শন প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে। সমাজদর্শনও এক প্রকারের মানসিক বিজ্ঞান (Mental Science)।

ইহা হইতে সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে যে-গভীর সম্বন্ধ বর্তমান, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু গভীর সম্পর্ক থাকিলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট **পার্থক্য**ও আছে।

প্রথমতঃ, সমাজদর্শন আদর্শবাদী, আর মনোবিজ্ঞান বাস্তববাদী। সমাজ-দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় সমাজের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, আর মনোবিজ্ঞান মানব-মনের বাস্তব প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজদর্শন সমাজের রীতি-নীতি, মৌলিক ধারণা, প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদির বিচার করে। যে-নীতি বা ধারণা আদর্শের দিক হইতে ভাল, সমাজদর্শন তাহার প্রশংসা করে, যাহা মন্দ, তাহার নিন্দা করে। মনোবিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে সকল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি লইয়াই আলোচনা করে। মানুষের মনের মধ্যে যে-সকল প্রক্রিয়ার স্বতঃই উদ্ভব হয়, তাহাদের শুধু পর্যবেক্ষণ করা বা বিশ্লেষণ করাই মনো-বিজ্ঞানের কাজ, উহাদের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিচার করা মনোবিজ্ঞানের কাজ নহে।

তৃতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞান বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাহা আছে, তাহা লইয়াই আলোচনা করে; যাহা আছে তাহা থাকা উচিত কি অনুচিত, তাহা লইয়া আলোচনা করে না। কোন আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে না।

চতুর্থতঃ, সমাজদর্শন প্রধানতঃ দল বা গোষ্ঠীর কথা লইয়া আলোচনা করে, ব্যক্তির কথা লইয়া আলোচনা করে না। কারণ, সমাজ বলিতে আমরা দল বা গোষ্ঠীই বুঝি। অবশ্য, সমাজ ব্যক্তিকে লইয়াই গঠিত, ব্যক্তি না থাকিলে সমাজ হইতে পারে না, কিন্তু সমাজদর্শনে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। সমাজ-জীবনের রীতিনীতি লইয়াই সমাজদর্শনে আলোচনা করা হয় এবং সমাজের আদর্শই ইহার আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তির কাজ বা ব্যক্তির জীবনের আদর্শ লইয়া সমাজদর্শন আলোচনা করে না। মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য

বিষয় কিন্তু ব্যক্তি, ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি-বিশ্লেষণই ইহার প্রধান কাজ।

(গ) সমাজদর্শন ও সমাজমনোবিজ্ঞান (Social Philosophy and Social Psychology):

আজকাল অবশ্য মনেবিজ্ঞানের নূতন একটি বিভাগের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে সমাজমনোবিজ্ঞান (Social Psychology) বলা হয়।

সমাজমনোবিজ্ঞানের পরিধি মনোবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক। সমাজমনোবিজ্ঞান সমাজজীবনের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করে। যে-মানসিক প্রক্রিয়া সমাজে বিভিন্ন প্রকারের (১) সম্প্রদায়, (২) সঙ্ঘ ও (৩) প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে এই বিজ্ঞান সেই মানসিক প্রক্রিয়া লইয়া আলোচনা করে। তদুপরি (৪) জনতার মনস্তত্ত্ব, (৫) সামাজিক অনুষ্ঠানের মানসিক প্রক্রিয়া, (৬) রাজনৈতিক দলের মনোবৃত্তি, (৭) জাতীয় ও সামাজিক কার্যাবলীর মানসিক প্রকৃতি, (৮) সমাজমনের মূলনীতিগুলি পরীক্ষণ, (৯) ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্কের মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদির আলোচনা সমাজমনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এক কথায়, সমাজের সহিত সম্পর্কিত মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করা সমাজমনোবিজ্ঞানের কাজ।

সমাজমনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

মনোবিজ্ঞান অপেক্ষা সমাজমনোবিজ্ঞানের সহিত সমাজদর্শনের সম্পর্ক আরও গভীর। কারণ, সমাজের আদর্শ নিরূপণ করিতে হইলে দল বা গোষ্ঠীর চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এইজন্য সামাজিক মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজ-দার্শনিকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

সমাজমনোবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন

উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সমাজমনোবিজ্ঞান আদর্শবাদী নয়, বাস্তববাদী। সমাজদর্শন আদর্শবাদী বলিয়া সমাজমনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিলেও ইহার লক্ষ্য উর্ধ্বে নিবদ্ধ। ইহা সমাজের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করে এবং কি উপায়ে সেই আদর্শ লাভ করা যায়, তাহার নির্দেশ দেয়।

(ঘ) সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Social Philosophy and Politics) :

Politics is "the science dealing with the form, organisation and administration of a state or part of one, and with the regulation of its relations with other states".—অর্থাৎ যে-বিজ্ঞান রাষ্ট্রের নীতি, গঠনপদ্ধতি, শাসনপ্রণালী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মাবলী লইয়া আলোচনা করে, তাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

রাজনৈতিক জীবন ও কার্যাবলী, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক-আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং এই দিক হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শন অভিন্ন। যে-সমস্ত মূলনীতি বা শক্তি রাষ্ট্র গঠন করে ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহারও আলোচনা করে। তাহা ছাড়া, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত এবং রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কাজেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পারিবারিক, নাগরিক, জাতীয়, যুক্তরাষ্ট্রীয়, সাম্রাজ্য-সম্বন্ধীয় (imperial), বৈদেশিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সমাজদর্শনের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, উভয়ের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য বর্তমান।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করা, অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা, এক কথায়, জনকল্যাণসাধন করা। সমাজদর্শনেরও আদর্শ জনসাধারণের কল্যাণসাধন করা। আদর্শের দিক হইতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, উভয়েই আদর্শবাদী বটে, কিন্তু কেবল আদর্শ নির্ধারণ করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় না, আদর্শের ব্যবহারিক প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়াও তাহাদের অন্যতম কাজ। ইহারা জনসাধারণের সম্মুখে যে-আদর্শ স্থাপন করে, সেই আদর্শ লাভ করিবার উপায় সম্পর্কেও যথাযথ নির্দেশ দেয়।

এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান :

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে-সকল বিষয় লইয়া আলোচনা হয়—যেমন রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী, গঠনপ্রণালী, সার্বভৌম ক্ষমতা ইত্যাদি, সেগুলি সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গেই কেবল সমাজদর্শনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

(খ) তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের কেবল মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী লইয়াই আলোচনা করে। কিন্তু সমাজদর্শন সমাজের অন্তর্গত সকলপ্রকার সংগঠন লইয়াই আলোচনা করে, তাহাদের কার্যাবলীর যৌক্তিকতা বিচার করিয়া সমাজজীবনের মূল্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিরূপণ করে। সুতরাং সমাজদর্শনের পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর।

(গ) উভয়ে আদর্শবাদী হইলেও উভয়ের আদর্শ ভিন্ন। রাষ্ট্র প্রাচীনকালে নৈতিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁহার 'রাজনীতি' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে নৈতিক আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞান নৈতিক আদর্শের পরিবর্তে সুবিধাবাদ-আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য থাকে জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার উপর। যে-কায সকলের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহাই রাষ্ট্রানুমোদিত। রাষ্ট্রের আইন রচিত হয় জনগণের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া। কিন্তু সমাজ-দর্শনের আদর্শ কেবল তাহা নহে। সমাজদর্শন নৈতিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজদর্শনের উদ্দেশ্য হইল চরম নৈতিক মূল্যের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া সামাজিক কল্যাণ লাভ করা।

(ঘ) বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থ-চিন্তায় মগ্ন। দুইটি রাষ্ট্রের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী হইতে পারে। বিরোধী রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি কোন রাষ্ট্রের কোনরূপ সহানুভূতি থাকে না। সমাজ কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ নয় বলিয়া পৃথিবীর সকল মানবের প্রতি সমাজদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী একইরূপ। সমাজদর্শনের আদর্শ মানবের মধ্যে সামাজিক ঐক্য স্থাপন করা। সেই মানব কোন্ বিশেষ ভূখণ্ডের মানব নয়, সমগ্র মানবজাতি।

এই-সকল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একথা বলিতে হইবে যে, সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পৃথক নয়। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

(ঙ) সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান (Social Philosophy and Ethics) :

নীতিবিজ্ঞান নৈতিক আদর্শ-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। "Ethics is the department of study concerned with the principles of human duty."—অর্থাৎ নীতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণ বা কর্তব্যের মূলনীতি ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করে।

সমাজদর্শনের সহিত নীতিবিজ্ঞানের **সম্বন্ধ** সর্বাপেক্ষা গভীর :

(ক) সমাজদর্শন যেমন মূল্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া আলোচনা করে, নীতিবিজ্ঞানেরও বিষয়বস্তু আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ বা লক্ষ্য। নীতিবিজ্ঞান সাধারণতঃ ব্যক্তির আচরণ লইয়া আলোচনা করে, তবে ব্যক্তি সমাজেরই একজন। সমাজ ব্যতীত মানুষ থাকিতে পারে না। ব্যক্তির সহিত সমাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ যান্ত্রিক সম্বন্ধ নহে, আঙ্গিক সম্বন্ধ। যাহাদের মধ্যে যান্ত্রিক সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাদের পৃথক করিলে উভয়ের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাহাদের মধ্যে আঙ্গিক সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলে উভয়েরই ক্ষতি হয়। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এইরূপ আঙ্গিক সম্বন্ধ বর্তমান, উহাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ হয়। সমাজই ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র। সুতরাং নীতিবিজ্ঞান যে-ব্যক্তির আচরণ লইয়া আলোচনা করে, সেই ব্যক্তি সমাজে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(খ) সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান উভয়েই আদর্শবাদী। সমাজদর্শন যে-আদর্শ নির্ধারণ করে, তাহা ব্যক্তির উপরেও প্রযোজ্য। ব্যক্তি সেই আদর্শ অনুসারে তাহার জীবন পরিচালিত করিলে তবেই আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব। নীতিবিজ্ঞান যে-আদর্শ নিরূপণ করে, তাহাও আদর্শ সমাজগঠনে সহায়তা করে; সুতরাং উভয়ের আদর্শের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, উহারা একে অপরের পরিপূরক।

এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে **পার্থক্য** বর্তমান :

(ক) উভয় বিষয়েরই পৃথক আলোচনা করিবার মত যথেষ্ট বিষয়বস্তু আছে। সমাজদর্শন আলোচনা করে দল বা গোষ্ঠী সম্পর্কে, আর নীতি-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইল ব্যক্তি। সমাজদর্শনে ব্যক্তিকে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

(খ) সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় সমাজের কার্যাবলী, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি। আর, নীতিবিজ্ঞান আলোচনা করে ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে। ব্যক্তির নৈতিক উন্নতিসাধন কিরূপে করা যায়, তাহাই নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকিলে তাহার নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন করা সম্ভব নয়।

(গ) সমাজদর্শন আলোচনা করে সমাজের কার্যাবলী, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদি লইয়া, আর নীতিবিজ্ঞান আলোচনা করে ব্যক্তির মানসিক কার্যাবলী লইয়া।

কিন্তু সামান্য পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গী নৈতিক। ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব (Individual Psychology) ও সমাজ-মনস্তত্ত্বের (Social Psychology) মধ্যে যে-পার্থক্য, সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যেও সেই পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যথায় তাহাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ম্যাকেঞ্জি সত্যই বলিয়াছেন,—"Social Philosophy might, indeed, be said to be a part of Ethics or Ethics might be said to be a Part of it."

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি

(The Social Nature of Man)

১। **মানব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ঃ** বহুসহস্র বৎসর পূর্বে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার ফলে জীবশ্রেণীর মধ্যে মানুষ নামে এক নূতন জীবের আবির্ভাব হয়। ধীরে ধীরে এই নূতন জীব নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্যান্য জীব হইতে পৃথক হইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হয়। কিন্তু কি উপায়ে মানুষ সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হইল? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, বিচারবুদ্ধিই মানুষের বৈশিষ্ট্য, ইহার দ্বারাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হইতে সমর্থ হইয়াছে। বিচার-বুদ্ধি দ্বারা মানুষ পশুর মত একঘেয়ে শব্দ না করিয়া ভাষা ব্যহহার করিতে শিখিয়াছে, বহির্জগতের বস্তুকে নিজস্ব কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে, নানাপ্রকারের যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছে এবং আপন সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত ও সুপরিচালিত করিয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। তবে একদিনেই মানুষ এই-সকল কাজ করিতে সক্ষম হয় নাই। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি প্রথমে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। ধীরে ধীরে অনুশীলনের দ্বারা তাহা উদ্বুদ্ধ, মার্জিত ও উন্নত করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হইয়াছে।

বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হইয়াছে

কিন্তু কেবল বিচারবুদ্ধিই মানুষের উন্নতির একমাত্র কারণ নয়। মানুষের দৈহিক গঠনও তাহার উন্নতিতে কম সহায়তা করে নাই। মানুষের পেশী ও ইন্দ্রিয়সমূহের গঠন ঠিক এইরূপ না হইলে মানুষ এত উন্নতি করিতে সমর্থ হইত না। তাহার স্বাধীন গতিশীল হস্তযুগল তাহাকে নানাপ্রকারের কাজ করিতে সহায়তা করিয়াছে। স্বরযন্ত্র না থাকিলে কথা বলা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। সুতরাং মানুষ কেবল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব নয়, এমন একটি জীব, যাহার দৈহিক গঠন এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, ইহা দ্বারা তাহার চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদি নির্ধারিত হইয়া থাকে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি

মানুষের দৈহিক গঠনও তাহার উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে

থাকা সত্ত্বেও তাহার দেহ যদি এইরূপ না হইত, তাহা হইলে সে শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হইতে পারিত না।

২। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি (The Social Nature of Man):

মানুষ নিঃসঙ্গ, একক জীবন যাপন করিতে পারে না। অন্যের সাহচর্য ভিন্ন জীবনধারণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ দল, সম্প্রদায়, গ্রাম, শহর, জনপদ ইত্যাদির মধ্যে বসবাস করে, যাহাতে সে সহজে অন্যান্য ব্যক্তির সহায়তা ও সহযোগিতা লাভ করিতে পারে।

মানুষের সহিত সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

এইজন্যই মানুষকে সমাজবদ্ধ জীব বলা হয়। সমাজেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। সমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া মানুষের পক্ষে জন্মগ্রহণ করা ও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। মানুষে-মানুষে এই যে সম্পর্ক, তাহাকে সামাজিক সম্পর্ক বলে। মানুষের প্রকৃতিই এমন যে, সে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে পারে না। এই জন্য অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন,—"He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a god or a beast."—অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমাজে বাস করিতে পারে না, বা যে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া সমাজে বাস করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, সে হয় দেবতা, না হয় পশু। আদিম যুগ হইতে মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। তাহার নিরাপত্তার জন্য, সুখ-সুবিধার জন্য মানুষকে পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে হয়। পরিবার, দল, রাষ্ট্র ইত্যাদি সবই সমাজজীবনের অন্তর্ভুক্ত, মানুষকে এই-সকলের মধ্যেই বাস করিতে হয়। সুতরাং মানুষ সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা।

সমাজগঠনে মানব-প্রকৃতির উপাদান: মানুষের সামাজিকতার প্রকৃতি বিবেচনা করিতে হইলে মানব-প্রকৃতির প্রধান উপাদানগুলির কথা প্রথমেই আলোচনা করা প্রয়োজন।

মানবজীবনের তিনটি দিক

ম্যাকেঞ্জি মানবজীবনের তিনটি প্রধান দিকের কথা বলিয়াছেন: (১) **উদ্ভিদবৎ দিক** (Vegetative Aspect), (২) **জৈবিক দিক** (Animal Aspect) ও (৩) **মানুষের নিজস্ব দিক** (An aspect that is more particularly his own)।

(১) **উদ্ভিদবৎ দিক :** উদ্ভিদবৎ জননশীলতাকে (Vegetative aspect) সামাজিক ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি বলা যায়। সকল উদ্ভিদই জননশীল অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি করে, দলবদ্ধ হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে চায়। পশুপক্ষীর জীবনেও যে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহাকে তাহাদের প্রকৃতির উদ্ভিদবৎ দিক বলা যায়। কিন্তু পশুপক্ষীর জীবনে এই সঙ্ঘবদ্ধতা এক বিশেষ রূপ ধারণ করে। কারণ, পশুপক্ষীর বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়-সংযোগের। তারপর সন্তানের জন্ম হইলে সন্তানেরা প্রথমে অসহায় থাকে এবং কিছুদিন পর্যন্ত পিতামাতার যত্নের উপর তাহাদের নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। নানাপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া তাহাদের দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয়। আবার পশুপক্ষীদের মধ্যে যাহারা উন্নততর, তাহাদের মধ্যে সঙ্গপ্রিয়তার প্রবৃত্তি বেশি দেখা যায়। তাহাদের জীবনের এই দিকটা প্রধানতঃ উদ্ভিদপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হইলেও পশুপক্ষী সচল বলিয়া এবং তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি উদ্ভিদ অপেক্ষা উন্নততর বলিয়া তাহারা ইচ্ছামত দলগঠন করিয়া বাস করিতে পারে, যাহা উদ্ভিদের পক্ষে সম্ভব নয়।

উদ্ভিদ্‌বৎ দিক জীবশ্রেণীকে সামাজিক হইবার প্রেরণা দিয়াছে

মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতার প্রকৃতিকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, জীবনরক্ষার জন্য প্রথমে সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে, পরবর্তী যুগে জীবনকে সুন্দরতর ভাবে পরিচালনা করিবার জন্য সমাজের প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। শিশুদের সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য, খাদ্য ও পানীয় দুঃসময়ের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য, আশ্রয় এবং নিরাপত্তার জন্য সমাজের প্রয়োজন। যদিও মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের সমাজ গঠন করিয়াছে, তবুও এই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রকৃতি ও কারণ সর্বত্রই এক। সুতরাং বংশরক্ষা ও জীবনের সুন্দর পরিচালনার জন্য সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল। ম্যাকেঞ্জি মানুষের এই দিকটাকে বর্ধনশীল (Vegetative aspect) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) উদ্ভিদ্‌বৎ দিক মানুষকে সমাজবদ্ধ করিয়াছে

(২) **জৈবিক দিক :** উদ্ভিদবৎ দিক ছাড়াও মানুষের জৈবিক দিকও (Animal aspect) তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে। পশুপক্ষীদের মধ্যে দেখা যায়, এক শ্রেণীর পশু অন্য শ্রেণীর পশুকে আক্রমণ করে, ইহার জন্য তাহাদের প্রয়োজন হয় দলবদ্ধ হইয়া বাস

করিবার। নিজেদের আত্মরক্ষা এবং অপর শ্রেণীকে আক্রমণ করিতে হইলে দলবদ্ধভাবে থাকাই সুবিধাজনক। আবার একই প্রকারের প্রাণীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একটা তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়। প্রতিযোগিতার ফলে তাহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধই তাহাদিগকে দলবদ্ধ করে। হেরাক্লিটাসের মতে প্রাণী-জগতে যদি প্রতিযোগিতা না থাকিত, তবে পৃথিবীতে জীবন বা প্রাণ থাকিত না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, সাহায্য ও প্রতিযোগিতার ইচ্ছা, ভালবাসা ও ঝগড়া ইত্যাদি প্রবৃত্তি প্রাণীদের মধ্যে সামাজিক ঐক্য গঠন করিয়াছে।

(২) মানুষের জৈবিক দিকও মানুষকে সমাজবদ্ধ হইবার প্রেরণা দিয়াছে

এই-সকল প্রবৃত্তি মানব-জীবনের উপরেও একইভাবে কার্যকরী। পরস্পর সাহায্য ও বিরোধিতার ফলে বিভিন্ন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ পরস্পরকে সাহায্যও করে, আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইও করে। উভয়-প্রকার প্রবৃত্তিই মানুষের একতার সূত্রকে দৃঢ় করিয়াছে। অতএব মানুষও স্বাভাবিক জৈবিক প্রবৃত্তিবশেই সমাজবদ্ধ হইয়াছে।

(৩) **মানুষের নিজস্ব দিক**ঃ কিন্তু মানুষ হিসাবে মানুষের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তাহার সঙ্ঘবদ্ধতার প্রবৃত্তিকে একটা নূতন রূপ দান করিয়াছে। কারণ, মানুষের পক্ষে খাদ্য-সংরক্ষণ অপেক্ষা জ্ঞান-সংরক্ষণের জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আরও অনেক বেশি। জ্ঞান শুধু বৎসরের জন্য সংগ্রহ করিলেই হয় না, বংশানুক্রমের জন্য সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে হয়। পরবর্তী বংশধরদের শিক্ষার জন্য, তাহাদের আচরণকে সুপরিচালিত করিবার জন্য, চিন্তাশক্তিকে সুগঠিত করিবার জন্য জ্ঞানের গভীরতর সংরক্ষণের প্রয়োজন। দাঁত বা থাবা-ব্যবহারের জন্য যে-সাহায্য বা বিরোধিতার প্রয়োজন হয়, যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষা করিবার জন্য তাহা অপেক্ষা জটিলতর সহযোগিতা বা বিরোধিতার প্রয়োজন। ভাষার মাধ্যমে মানুষে-মানুষে বংশানুক্রমে যে ঐক্য চলিয়াছে, তাহা কোন পশুর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার, ইহারই দ্বারা নানাপ্রকারের বিরোধের সৃষ্টি হইতেছে, যাহার ফলে আরও গভীরতর ঐক্য সম্ভবপর হয়। কারণ, মানুষের বিচারবুদ্ধির মধ্যেই একতার শক্তি নিহিত আছে।

(৩) মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তাহাকে সুপরিকল্পিত সমাজগঠনে সাহায্য করিয়াছে

মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক। তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইল সামাজিক ঐক্য গঠন করা। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে-বিরোধিতা বা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, মানব-সমাজের ঐক্য অস্বাভাবিক। বরং মানব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই হইতেছে বিরোধের মধ্য দিয়া বৃহত্তর ঐক্য স্থাপন করা।

মানব-জীবনের উপরে এই তিনটি দিকের প্রভাব এত বেশি যে, ইহারাই একদিকে যেমন মানবকে উন্নত করিতে পারে, আবার ইহারাই তাহাকে অবনত করিতে পারে। বিচারবুদ্ধি সুপরিচালিত হইলে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারে, আবার বিপথে চালিত হইলে মানুষকে পশুর অধম করিতে পারে। মানব-জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইতেছে এই জটিলতাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। মানুষের সামাজিক জীবনের উপরে এই তিনটি দিকের প্রভাব অসীম, মানব-জীবনের এই তিনটি দিকই মানুষকে সামাজিক জীবে পরিণত করিয়াছে।

তিনটি দিকের প্রভাব

সমাজ এবং ব্যক্তি

(Society and the Individual)

সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে মানুষ :

আদিমকাল হইতে মানুষ কোন-না-কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে। সমাজ ব্যতীত মানুষের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। একান্ত প্রয়োজনবোধেই মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেও মানুষের মানসিক উন্নতি বা বিচারবুদ্ধির বিকাশও সমাজ ব্যতীত সম্ভব হয় না। সামাজিক জীবন যাপন না করিলে কেহ স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহার মানসিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয় না। সামাজিক চেতনার বিকাশ সমাজের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। অতি শৈশবাবস্থায় শিশু মানুষ ও জড় পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাহার চেতনা অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যখন সে সচেতন হয়, তখন অন্যান্য ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাহার চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। এইভাবে তাহার ব্যক্তিত্ববোধ (Individuality) ও সামাজিক চেতনাবোধ (Sociality) সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়। কয়েক সপ্তাহের শিশুও মায়ের হাসিমুখ দেখিলে হাসে, ভৎর্সনা করিলে কাঁদে, সমবয়সী শিশুদের দেখিলে আনন্দে উল্লসিত হয়। সমবয়সীদের প্রতি শিশুর ব্যবহার অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। কখনও সে তাহাদের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে, তাহাদের ভালবাসে, খেলা করে; আবার কখনও তাহাদের সহিত ঝগড়া করে, মারামারি করে। এই-সকল ব্যবহারের মধ্যে সে তাহার ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দেয়, আবার তাহার সামাজিক চেতনাবোধও ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়। শিশু যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, যত বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে থাকে, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব-বোধ ও সামাজিক বোধ জাগ্রত হইতে থাকে এবং ইহার দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় ও চরিত্রগঠন হয়।

ব্যক্তির বিকাশ সমাজ ব্যতীত সম্ভব নয়

সমাজের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা-বোধ জাগ্রত হয়

সুতরাং সমাজে বাস না করিলে কাহারও মানসিক গঠন সুস্থ ও স্বাভাবিক হইতে পারে না।

১। সমাজের উৎপত্তি (Origin of Society):

সমাজের উৎপত্তি কোন্ সময়ে, কিভাবে হইয়াছিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমাজ আগে ছিল, না ব্যক্তি আগে ছিল, তাহারও কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সমাজবিহীন ব্যক্তির কল্পনা করা যায় না, আবার ব্যক্তিহীন সমাজের কল্পনা করাও অসম্ভব। বীজ আগে, না উদ্ভিদ আগে, ডিম আগে, না পাখী আগে, এই-সকল প্রশ্নের জবাব যেমন পাওয়া যায় না, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কেও সেইরূপ সঠিক কোন জবাব দেওয়া যায় না। মানুষের সামাজিক প্রকৃতির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব-প্রকৃতির মধ্যে এমন-সব উপাদান নিহিত আছে, যাহার দ্বারা সে সমাজবদ্ধ না হইয়া বাস করিতে পারে না। মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইল সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা। আমাদের ভালমন্দ সকল সহজাত প্রবৃত্তিই আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ আনিয়া দেয়। আবার মানুষের বিচারবুদ্ধিও তাহাকে সর্বদা অন্যের সহিত মিলিত হইবার প্রেরণা দেয়। তবে মানুষের সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার ইচ্ছাকে পশুদের দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রবৃত্তির সহিত তুলনা করা উচিত হইবে না। কারণ, মানুষের মন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহার নির্বাচন করিবার ক্ষমতা আছে ও প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তনসাধনের ক্ষমতা আছে, যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিবার ও ব্যবহার করিবার দিকে আগ্রহ আছে। আমরা পছন্দমত বন্ধু নির্বাচন করিতে পারি, শত্রুকে চিনিতে পারি। কাহারও সঙ্গ আমাদের কাছে প্রিয়, কাহারও সঙ্গ আমরা অপছন্দ করি; তবে এই-সকল ব্যাপারে আমরা কোন কোন সময় খুব সুবিবেচনার পরিচয় দেই, আবার কোন কোন সময় খেয়ালখুশিমত বা সহজাতপ্রবৃত্তি-অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকি। আমাদের রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার কোন কোন সময় খুব সুচিন্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া থাকে, আবার কোন কোন সময় আমরা প্রচলিত রীতিকেই একান্ত-ভাবে গ্রহণ করি।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করে

এইভাবে সমাজের রীতিনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই-সকল ক্ষেত্রে মানুষের নির্বাচন-ক্ষমতা তাহাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু মানুষের নির্বাচন-

ক্ষমতাও পরিবেশের প্রভাবে, প্রচলিত ভাবধারা ও বিশ্বাসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং মানুষের তৈয়ারী আইন-কানুন, রীতিনীতি ইত্যাদির গঠন একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। পাখী যেরূপ সহজাত প্রবৃত্তির বশে বাসা নির্মাণ করে, মানুষও প্রাকৃতিক নিয়মেই সমাজ, রীতিনীতি, আইন-কানুন ইত্যাদি গঠন করে। মানুষের যে-বহুল ক্ষমতা, তাহাও প্রাকৃতিক, তবে সহজাত প্রবৃত্তির বশে যে-কাজ কবা হয়, তাহার প্রকৃতি একইরূপ হয়। আর, নির্বাচন-ক্ষমতার ফলে যে-কাজ হয়, তাহার প্রকৃতি বহুরূপ হইতে পারে। বাবুই পাখী বাসা-নির্মাণের কাজে যত নিপুণতারই পরিচয় দিক না কেন, তাহারা সকলে এক ধরনের বাসাই নির্মাণ করিবে। অন্য কোনরূপ বাসা তৈয়ারি করিতে পারিবে না, কিন্তু মানুষের সমাজের গঠন কেবল পরিবেশের প্রভাবে বা সহজাত প্রবৃত্তিব বশেই সম্পন্ন হয় নাই। সুতরাং যাহার ভিত্তি কিছুটা প্রবৃত্তি, কিছুটা নির্বাচন-ক্ষমতা, কিছুটা পরিবেশের প্রভাব—তাহার ফল যে বৈচিত্র্যময় হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মানুষের নির্বাচন-ক্ষমতার ফলে সমাজে বৈচিত্র্য সম্ভব হইয়াছে

২। **সমাজ-উৎপত্তির মতবাদ**ঃ সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলন করিয়াছেন। এই বিষয়ে সামাজিক চুক্তিবাদ (Social Contract Theory) সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত।

(ক) **সামাজিক চুক্তি মতবাদ** (Social Contract Theory) ঃ সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে যে-মতবাদগুলি প্রচলিত আছে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ তাহাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই মত-বাদটি অতি প্রাচীন। প্লেটোর (Plato) রিপাব্লিকের (Republic) মধ্যেই ার ধারণা পাওয়া যায় বটে, তবে সেখানে খুব বেশী প্রাধান্য লাভ করে ়। তিনি এই মতবাদকে সমর্থনও করেন নাই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে ইংরাজ দার্শনিক হব্‌স্ (Hobbes) ও লক্ (Locke) এবং ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) এই মতবাদের সমর্থক। তাঁহাদের মতে সামাজিক চুক্তির ফলে সমাজ গঠিত হইয়াছে। সমাজ মানুষের দ্বারা গঠিত। এমন একদিন ছিল, যখন সমাজ ছিল না, মানুষ ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন বন্ধন তাহার ছিল না, সামাজিক কোন আইন-কানুনও ছিল না। মানুষ তখন প্রাকৃতিক পরিবেশে (State of Nature) বাস করিত। তখন কেহ

মানুষের চুক্তির ফলে সমাজ-সৃষ্টি

কাহারও উপর অন্যায় অবিচার করিলে তাহার প্রতিকারের বিশেষ কোন উপায় ছিল না। এইজন্য মানুষ শান্তি ও শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই চুক্তির ফলে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া সমাজের সৃষ্টি করিল।

(খ) হব্‌সের মতবাদ : হব্‌স্ (Thomas Hobbes) তাঁহার 'দি লেভিয়াথান্' (The Leviathan) নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের স্বভাব ছিল একে অপরের বিরুদ্ধতা করা, অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করা। মানুষ মানুষের কাছে ছিল হিংস্র নেকড়ের ন্যায় (homo homini lupus)। এই অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল অতি অসহায়, ঘৃণ্য, পাশবিক ও স্বল্পকাল-স্থায়ী এবং সর্বপ্রকারের সামাজিক অরাজকতা এই সময় বিদ্যমান ছিল। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সকলকে একটা শান্তি-চুক্তির মধ্যে আসিতে হয়। তাহারা আপন আপন যুদ্ধ-প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার জন্য বিনা শর্তে নিজেদের একজন রাজা বা নেতার হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিল। এইভাবে শাসক ও শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই চুক্তি অনুসারে সকলেই শাসকের কাছে আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য, সুতরাং মানুষই চুক্তির দ্বারা সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে সমাজ ও শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া মানুষ মানুষের কাছে ঈশ্বরে পরিণত হইয়াছে (homo homini deus)।

অরাজকতা ও সামাজিক চুক্তি

(গ) লকের মতবাদ : জন লকও (John Locke) এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থক। তাঁহার মতে প্রকৃতির রাজত্বে (State of Nature) মানুষ শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীন জীবন যাপন করিত, কোন সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইত না। লকের মতে মানুষ স্বভাবতঃই কলহপ্রিয় ছিল না। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের কার্য প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রকৃতির রাজত্বকে লক 'golden age' বা 'সুবর্ণ-যুগ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কতকগুলি অসুবিধা দেখা গিয়াছিল। প্রকৃতির রাজত্বে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে বা কেহ অন্যায় আচরণ করিলে তাহার কোন বিচার হইত না। এই-সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য সকলে মিলিয়া একটা চুক্তি করিয়া সমাজের সৃষ্টি করিল এবং

প্রকৃতির রাজত্বের অসুবিধা ও সামাজিক চুক্তি

অপর এক চুক্তির দ্বারা কোন ব্যক্তিকে রাজা করা হইল। রাজা সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও দোষীর বিচার করিবেন। এই চুক্তিতে রাজা অপেক্ষা জনসাধারণের হস্তে ক্ষমতা রহিল বেশি। রাজা যতদিন জনসাধারণের চুক্তির শর্ত অনুসারে কাজ করিবেন, ততদিনই তিনি রাজত্ব করিবেন, কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুসারে কার্য না করিলে বা রাজা অক্ষম হইলে জনসাধারণ রাজাকে তাঁহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। লক ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

(ঘ) **রুশোর মতবাদ ঃ** রুশো (Rousseau) তাঁহার 'কন্‌ট্রাক্ট সোশ্যাল' (Contract Social) গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ শান্তিপূর্ণ, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত। এই প্রাক্-সামাজিক, স্বাধীন, মুক্ত জীবনযাত্রাকে রুশো পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তখন কাহারও মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কখনও হইত না, মানুষ শান্তিময় ও আনন্দময় জীবন যাপন করিত। কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষে-মানুষে কলহ হইতে লাগিল; তখন এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহাদিগকে সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইল। এই চুক্তি অনুসারে তাহারা কোন ব্যক্তি বা রাজার উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিল না। কারণ, তাহাতে জনসাধারণের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ন করা হয়। সকলের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তাহারা স্থির করিল যে, প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমষ্টিগত ইচ্ছার অর্থাৎ সকলের সম্মিলিত ইচ্ছার অধীনে সমর্পণ করিবে। এইরূপ সকলের মিলিত ইচ্ছাকে রুশো 'সাধারণ ইচ্ছা' (General Will) নাম দিয়াছেন। এই সাধারণ ইচ্ছাকে সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য। যখন সকলে একত্র আলোচনার দ্বারা এমন একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, যাহা দ্বারা সকলের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের সম্মতি থাকিবে, তখনই তাহাকে 'সাধারণ ইচ্ছা'[১] বলা যাইবে ('সাধারণ ইচ্ছা' কাহাকে বলে, তাহার বিশদ আলোচনা পরে করা হইয়াছে)। রুশো এই সাধারণ ইচ্ছাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রকৃতির রাজত্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সামাজিক চুক্তি

১। 'সাধারণ কল্যাণ'-এর ধারণা দেখ।

সমালোচনাঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান প্রধান ত্রুটি :

প্রথমতঃ, চুক্তির ফলে যদি সমাজ গঠিত হইয়া থাকে, তবে সমাজ-সৃষ্টির পূর্বেই ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি সমাজেই জন্মগ্রহণ করে। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির জন্ম হইতে পারে না। কাজেই সমাজ-সৃষ্টির পূর্বে ব্যক্তির অস্তিত্ব কিরূপে থাকিতে পারে, তাহা বুঝা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। যাঁহারা এই-সকল মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই প্রকৃতির রাজ্যে বাস করেন নাই। এই সকলই তাঁহাদের কল্পনা মাত্র।

তৃতীয়তঃ, ডারউইন-প্রবর্তিত বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) স্বীকার করিলে দেখা যায় যে, সমাজ প্রকৃতির বিবর্তনের ফল। কোন নির্দিষ্ট চুক্তি বা পরিকল্পনার দ্বারা সমাজ গঠিত হয় নাই।

চতুর্থতঃ, সামাজিক চুক্তি মতবাদকে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আঘাত করিয়াছেন বার্ক (Burk)। তাঁহার মতে সমাজ একটা চুক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু যে-সকল নিম্নস্তরের চুক্তি সাময়িক সুখ-সুবিধার জন্য করা হয়, সেগুলি ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সমাজকে এইরূপ অস্থায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তির সহিত তুলনা করা যায় না। সমাজ কোন অস্থায়ী যৌথ কারবার নয়, সমাজের কারবার সকল বিজ্ঞানের সহিত, সকল কলাব সহিত, সকল ধর্ম ও পূর্ণতার সহিত। এইরূপ যৌথ কারবারের উদ্দেশ্যসিদ্ধি এক পুরুষে হওয়া সম্ভব নয়, ইহার সম্পর্ক কেবল যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের সঙ্গে নয়, যাহারা মৃত এবং যাহারা এখনও জন্মে নাই, তাহাদের সঙ্গেও।

সমাজ চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সামাজিক চুক্তি এই বৃহৎ সমাজের অংশ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইন বা নিয়ম এই বৃহৎ সমাজের বৃহৎ নিয়মের অধীন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পৃথিবী একই সমাজ-শাসিত, একই নিয়মের অধীন। এই বৃহৎ সমাজের আদিও নাই, অন্তও নাই। সুতরাং উপরি-উক্ত যুক্তির দ্বারা সমাজের উৎপত্তির ধারণা করা অসম্ভব।

সিদ্ধান্তঃ সমাজ প্রকৃতপক্ষে কোন চুক্তির ফলে গঠিত হয় নাই। সমাজ যদি চুক্তির ফলে গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয়, সমাজ-সৃষ্টির পূর্বেই পৃথিবীতে মানুষ বর্তমান ছিল। কিন্তু সমাজহীন ব্যক্তির কল্পনাও করা যায় না। সমাজ না থাকিলে ব্যক্তি পৃথিবীতে থাকিতে পারিত না। সুতরাং এমন কোন সময়ের কথা ভাবা যায় না, যখন সমাজ বলিতে কিছু ছিল না।

প্রাণিমাত্রই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, ইহাই তাহাদের জৈবিক প্রবৃত্তি। পশু-পাখী, এমন কি, উদ্ভিদ-শ্রেণীর মধ্যেও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সমাজ পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান ছিল, আছে এবং থাকিবেও। তবে মানুষ আপন বুদ্ধিবলে তাহাকে উন্নত করিয়াছে, বৈচিত্র্যময় করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতির পথে পরিচালিত করিবে।

৩। সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক (The Relation of the Individual to the Society) :

সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমান। তাহাদের মধ্যে চারিটি মতবাদ বিশেষ প্রচলিত। যথা—

(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) ;

(খ) সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) ,

(গ) আঙ্গিকবাদ (Organismic or Organic Theory of Society) ;

(ঘ) ভাববাদ (Idealism) বা গোষ্ঠী-চেতনাবাদ (Group-mind Theory)।

(ক) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ** (Individualism) : Individualism is "the social theory which advocates the free and independent action of the individual as opposed to the communistic methods of organisation and state-interference." ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এমন একটি সামাজিক মতবাদ, যাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষপাতী এবং সর্বপ্রকার সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী।

সংজ্ঞা

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে সমাজ হইল ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি কৃত্রিম সংগঠন। ব্যক্তিই সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। সমাজ না থাকিলেও ব্যক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি ব্যতীত সমাজ থাকিতে পারে না। সুতরাং সমাজে ব্যক্তির প্রাধান্য যে বেশী, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে সমাজে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির কোন

ব্যাখ্যা

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে না। কারণ, তাহাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন স্বাধীন ইচ্ছানুসারে কার্য করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

সমালোচনা: কিন্তু এই মতবাদ কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য নহে। (১) এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, ব্যক্তি সকল সময় কোন্‌টি তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক, আর কোন্‌টি ক্ষতিকারক, তাহা সঠিক নির্ধারণ করিতে পারে না। অতিরিক্ত স্বাধীনতা লাভ করিলে ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতে পারে। এই-সকল অবস্থায় সমাজকে ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতেই হয়। ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই সমাজের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

অতিরিক্ত স্বাধীনতা ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে পারে

(২) একজনের স্বাধীনতা অন্যের সুখ-সুবিধার পরিপন্থী হইতে পারে। চোরকে চুরি করিবার স্বাধীনতা দিলে সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না। তাহার আচরণকে বাধা দিতেই হইবে। আবার, যাহারা দুর্বল ও অক্ষম, তাহাদিগকে সমাজের সাহায্য করিতে হয়। তবে সমাজের অতিরিক্ত শাসন-ক্ষমতাকেও বরদাস্ত করা যায় না। সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার স্বপক্ষেও কোন বিশেষ যুক্তি নাই। সমাজ কেবল দৃষ্টি রাখিবে—ব্যক্তি যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়।

একের স্বাধীনতা অন্যের সুখের পরিপন্থী হইতে পারে

সমাজে সকলেরই ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় থাকিবে। তবে যখন দেখা যাইবে, ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা অন্যের স্বার্থে আঘাত করা হইতেছে, তখনই সমাজ তাহার আচরণকে নিয়ন্ত্রন করিবে।

(খ) **সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism):** Socialism is "a theory or policy of social organisations which aims at or advocates the ownership and control of the means of production, capital, land, property etc. by the community as a whole, and their administration or distribution in the interest of all." সমাজতন্ত্রবাদ এমন একটি সামাজিক মতবাদ, যাহা সকলের কল্যাণের জন্য সমাজের জায়গা-জমি, ধনসম্পদ, উৎপাদনের পদ্ধতি ইত্যাদির রক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, বণ্টন, মালিকানা ইত্যাদি সকল কর্মের ভার ও দায়িত্ব সমাজ বা রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। এই

সংজ্ঞা

মতবাদ অনুসারে সমাজে ব্যক্তির কোন স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। ব্যক্তির সমস্ত কর্ম সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মতবাদে ব্যক্তির কোন মূল্য না দিয়া সমাজকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্লেটো, অ্যারিস্টটল্, মুর প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন, সমাজ আছে বলিয়াই ব্যক্তি বাঁচিয়া আছে। সমাজ না থাকিলে ব্যক্তির পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইত না। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, যে-মানুষ সমাজ ব্যতীত বাঁচিতে পারে, সে হয় পশু, না হয় দেবতা, অর্থাৎ সে মানুষ নয়। কারণ, মানুষকে জীবন ধারণ করিতে হইলে, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে, তাহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইলে, সমাজের উপর পদে পদে তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং সমাজই প্রধান, সমাজের মূল্যের কাছে ব্যক্তির মূল্য অতি নগণ্য। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে ব্যক্তির নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত নহে। সে সম্পূর্ণভাবে সমাজের অধীন থাকিবে ও সমাজের নির্দেশ নির্বিচারে মানিয়া লইবে।

ব্যাখ্যা

সমালোচনা: সমাজতন্ত্রবাদও একটি চরমপন্থী মতবাদ। কারণ, সমাজ ব্যক্তির দ্বারাই গঠিত, ব্যক্তি না হইলে সমাজ থাকিতে পারে না। সমাজের সকল কাজ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই। সমাজের উন্নতি বলিতে আমরা সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির উন্নতিই বুঝিয়া থাকি। সমাজের উন্নতি ও অবনতি ব্যক্তির উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভর করে। সমাজে ব্যক্তি বাস করে বলিয়া তাহার কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকিবে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

সিদ্ধান্ত: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়ই চরমপন্থী। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ে পরস্পরের উপর সমান নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। সুতরাং কাহাকেও অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া অথবা অতিরিক্ত ক্ষুণ্ন করা উচিত নহে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ পরস্পরবিরোধী হইলেও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিক চেতনাবোধ একই সঙ্গে জাগ্রত ও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি বা সমাজ কাহাকেও অতিরিক্ত প্রাধান্য না দিয়া উভয়কেই উভয়ের উন্নতির সহায়ক বলিয়া গণ্য করা উচিত।

(গ) আঙ্গিক মতবাদ (Organic Theory of Society):

আঙ্গিক মতবাদ অনুসারে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এই সম্পর্ককে আঙ্গিক (Organic) সম্পর্ক বলা যাইতে পারে। জীবদেহের সঙ্গে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে-সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে আঙ্গিক সম্পর্ক বলা হয়। সমাজের সহিত ব্যক্তির এইরূপ আঙ্গিক সম্পর্ক বর্তমান। সমাজ হইতে কোন ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। আবার, ব্যক্তির ক্ষতিতে সমাজেরই ক্ষতি হয়। দেহের কোন একটি অংশে ক্ষত হইলে তাহা সমগ্র শরীরের ক্ষতিসাধন করে। সমাজের ব্যক্তিরাও এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইলে সমগ্র সমাজ তাহাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তি থাকিতে পারে না, আবার ব্যক্তির উপর সমাজের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এই মতবাদে সমাজকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ব্যক্তি হইল সমাজরূপ দেহের কোষ। কাজেই সমাজ হইতে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক আঙ্গিক

সমালোচনা: এই মতবাদে বলা হয় যে, ব্যক্তির সহিত সমাজের আঙ্গিক সম্পর্ক বর্তমান। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সমাজ হয় না, আবার সমাজের উপর ব্যক্তি নির্ভরশীল।

(১) এই আঙ্গিক সম্পর্কের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া উচিত হইবে না। ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক আঙ্গিক হইলেও এই সম্পর্ককে জীবদেহের সহিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে-সম্পর্ক, তাহার সহিত একেবারে এক করিয়া দেখা চলে না। কারণ, জীবদেহ হইতে কোন অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করিলে, সমগ্র দেহই তাহাতে অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির মৃত্যুতে সমাজের সেইরূপ কোন ক্ষতি হয় না।

(২) ইহা ভিন্ন এই মতবাদে সমাজকে যে জীবদেহের সহিত তুলনা করা হয়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। জীবদেহের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে; সমাজের কিন্তু আদিও নাই, অন্তও নাই।

(৩) এতদ্ভিন্ন ব্যক্তির ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য আছে। ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সমাজের বাহিরে গিয়াও বাস করিতে পারে। কিন্তু জীবকোষ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তির সহিত সমাজের যে-

আঙ্গিক সম্পর্ক, তাহাকে রূপক (metaphor) হিসাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া উচিত হইবে না।

(ঘ) **ভাববাদ বা গোষ্ঠীচেতনাবাদ** (Idealism or Group-Mind Theory) **:**

ভাববাদ অনুসারে সমাজ এক দেবতুল্য ব্যক্তি। ইহার নিজস্ব একটা সত্তা আছে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্নও সমাজের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির কোন সত্তা নাই। সমাজের অংশরূপেই ব্যক্তির প্রকৃত সত্তা। ভাববাদীদের মতে এই জন্য ব্যক্তির একমাত্র কতব্য সমাজের নির্দেশ পালন করা, তাহা হইলেই ব্যক্তির জীবন সার্থক ও সুন্দর হইবে।

সমাজে দেবত্ব-আরোপ

প্লেটো, হেগেল, গ্রীন, ব্রাড্‌লি, বোসাঙ্কে প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই মতবাদের সমর্থক; তাঁহাদের মতে ব্যক্তি ব্যতীতও সমাজ-মনের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এইজন্য সমাজের স্থান ব্যক্তির অনেক উর্ধ্বে। সমাজ কেবল ব্যক্তির সমষ্টি নয়, তাহার নিজেরই স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এই সমাজ-মনকে বা গোষ্ঠী-মনকে 'Group-Mind' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তি-মনের উচিত সমাজ-মনের কাছে সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য স্বীকার করা। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা ভাববাদীরা স্বীকার করেন না।

সমাজ-মনের স্বতন্ত্র সচেতন সত্তা

সমালোচনা: ভাববাদীরা ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া সমাজের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তাঁহারা কোন স্থান দেন নাই। ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সমাজের নির্দেশ পালন করিতে হইবে। এই মতবাদও স্বীকার করা যায় না।

ভাববাদীদের মতে সমাজ কোন অন্যায় করিতে পারে না, ইহাও স্বীকার্য নহে। সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজ ও রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান দিয়া, তাহাতে দেবত্ব আরোপ করা যুক্তিহীন, বাস্তবতাবর্জিত কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। গোষ্ঠী-মন বা সমাজ-মনকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না।

মূল সিদ্ধান্ত: ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহাদের একে একে আলোচনা করা

হইয়াছে। (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে ব্যক্তি বড়, সমাজ ছোট। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে সমাজ বড়, ব্যক্তি ছোট। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই দুইটিই চরমপন্থী মতবাদ। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান, কিন্তু তাহাদিগকে বড়-ছোট-রূপে বিচার করা যায় না। ব্যক্তি না থাকিলে সমাজ হয় না, সমাজ না থাকিলে ব্যক্তি থাকিতে পারে না। কাজেই উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়ই চরমপন্থী

(খ) এইজন্যই আঙ্গিক মতবাদীরা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে আঙ্গিক সম্বন্ধ বিদ্যমান বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সমাজের ক্ষতিতে ব্যক্তির ক্ষতি, ব্যক্তির ক্ষতিতে সমাজের ক্ষতি। এই মতবাদ পূর্বে বর্ণিত চরমপন্থী মতবাদগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মতবাদীরা আঙ্গিক সম্পর্কের উপর এত প্রাধান্য দিয়াছেন যে, সমাজকে তাঁহারা জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া ব্যক্তিকে সমাজের কোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সমাজ ও ব্যক্তিকে জীবদেহের সহিত রূপক হিসাবে তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া উচিত নহে।

আঙ্গিক সম্পর্কের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া অনুচিত

(গ) ভাববাদীরা গোষ্ঠী-মনের স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপর এত জোর দিয়াছেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গোষ্ঠী-মনের কাছে সম্পূর্ণ খর্ব করিয়াছেন। সুতরাং কোন একটি মতবাদকেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

গোষ্ঠী-মনের স্বাধীন অস্তিত্বের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া অনুচিত

সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তাহাদের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি চলে না। সুতরাং সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করিতে হইবে। আবার প্রয়োজন হইলে ব্যক্তিও সমাজের জন্য আপন স্বার্থত্যাগ করিয়া সমাজের সেবা করিলে উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে। সমাজের কর্তব্য ব্যক্তির সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা, সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধনে যথাযথ সহায়তা করা ও জনকল্যাণসাধন করা। আর, ব্যক্তির কর্তব্য যথাসাধ্য সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করা ও

সমাজ ও ব্যক্তির উভয়ের পরস্পরের সহায়ক হওয়া উচিত

সামাজিক ঐক্য-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিলে আদর্শ সমাজগঠন সহজসাধ্য হইবে। সমাজ ব্যক্তিকে যে-স্বাধীনতা দান করিবে, ব্যক্তি সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিবে। সমাজ এমন হওয়া উচিত, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি পূর্ণতা-প্রাপ্তির সুযোগ পায়, আবার স্বাধীনতার যাহাতে অপব্যবহার না হয়, সেদিকেও সমাজ দৃষ্টি রাখিবে। জনকল্যাণের আদর্শই সমাজের আদর্শ হইলে আদর্শ সমাজ গঠিত হইবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিবে না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ

(Individualism and Socialism)

১। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) :

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে সমাজ ও রাষ্ট্র একটি অভিশাপ। কারণ, মানুষ হীন ও কলহপ্রিয় বলিয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। মানুষ সৎ ও উন্নত হইলে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে হব্‌স্, লক্, রুশো প্রভৃতি দার্শনিকেরা কি বলিয়াছেন, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। হব্‌সের মতে মানুষ সমাজ-সৃষ্টির পূর্বে অতি কদর্য, ঘৃণ্য, পাশবিক জীবন যাপন করিত। সেইজন্য সকলে মিলিয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটা চুক্তি স্থাপন করিয়া সমাজের সৃষ্টি করিল। লক ও রুশো ঠিক হব্‌সের ধারণা পোষণ না করিলেও তাঁহাদের মতে প্রথমে সমাজ ছিল না, পরে নানা অসুবিধার ফলে মানুষ চুক্তি করিয়া সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে।

সমাজ একটি অভিশাপ

এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন, মানুষ স্বার্থপর ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত কম হয়, ততই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের উপর বেশী ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে রাজী নন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা। ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রাষ্ট্রের বা সমাজের থাকা উচিত নয়। ব্যক্তির বিকাশ-সাধনের ভার ব্যক্তির উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, ব্যক্তির যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞান আছে। কারণ, ব্যক্তি রাষ্ট্রের হস্তের পুত্তলিকামাত্র নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, ব্যক্তিই আপন প্রয়োজনে সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তির প্রয়োজনের জন্যই সমাজ, সমাজের প্রয়োজনের জন্য ব্যক্তির সৃষ্টি হয় নাই।

ব্যক্তিগত অধিকারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত

আধুনিক যুগের বহু দার্শনিক এই মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া

ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা রাষ্ট্রের অত্যধিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। দার্শনিক মিল এই মতবাদের অন্যতম সমর্থক। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের হস্তে অত্যধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করিলে রাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বাধা প্রদান করিবে। অবশ্য, তিনি বলিয়াছেন, ব্যক্তির স্বাধীনতা যাহাতে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অ্যাডাম স্মিথও (Adam Smith) এই মতবাদের একজন উল্লেখযোগ্য সমর্থক।

মিলের মতবাদ

হার্বার্ট স্পেনসার তাঁহার যুক্তির সমর্থনে ডারউইনের বিবর্তনবাদকে (Theory of Evolution) প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ডারউইনের মতে প্রত্যেক জীবের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একটা প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এই প্রতিযোগিতায় যাহারা দুর্বল ও অক্ষম, তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়, আর যাহারা যোগ্যতম, তাহারা রক্ষা পায় (Survival of the fittest)। হার্বার্ট স্পেনসার বলেন, মানুষের মধ্যেও এইরূপ স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি বর্তমান এবং ইহার ফলে যাহারা যোগ্যতম, তাহারা বাঁচিয়া থাকে ; আর দুর্বলেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্পেনসার বলেন, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নীতিকে সমাজ বা রাষ্ট্র বাধা প্রদান করে। দুর্বল ও অক্ষমদিগকে সাহায্য করিয়া রাষ্ট্র প্রাকৃতিক নিয়মকে বাধা প্রদান করে। রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ কার্য করা একান্তই অন্যায় ও অনুচিত।

হার্বার্ট স্পেনসারের মতবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহাদের মতের সমর্থনে অর্থনৈতিক যুক্তিও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় থাকা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কারণ, তাহার ফলে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে এবং প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। এই-সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও কর্তৃত্ব ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী করিয়া থাকে।

অর্থনৈতিক যুক্তি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা আরও বলেন, রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কর্তৃত্বের ফলে ব্যক্তির কর্মের উৎসাহ কমিয়া যায়। ব্যক্তির উন্নতি-অবনতি, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তি নিজেই সর্বাপেক্ষা বেশী অবহিত থাকে, সুতরাং তাহার আত্মবিকাশের দায়িত্ব তাহার উপরেই

অবাধ নীতি

ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সমাজ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তির উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপরন্তু, সে আত্মপ্রত্যয় হারাইয়া সমাজের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী বলিয়া ইহাকে অবাধ নীতি বা Laissez-faire নীতিও বলা হইয়া থাকে।

সমালোচনা ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে যে-যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সমর্থনযোগ্য বটে, কিন্তু সবগুলি নয়।

প্রথমতঃ, তাঁহাদের সমাজ বা রাষ্ট্রকে অভিশাপ বলিয়া বর্ণনা করিবার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই সমাজ; সুতরাং সমাজ ব্যক্তির পক্ষে অভিশাপ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের মতে মানুষ যখন সৎ ও উন্নত হইবে, তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকিবে না, ইহাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, সমাজ কোন অস্থায়ী সাময়িক চুক্তি নয়। সমাজ একটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, ইহার ধ্বংস সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তি সকল সময় নিজের ভালমন্দ-নিরূপণে সমর্থ হয় না। যেক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করিলে ব্যক্তির প্রকৃত ক্ষতি হইবে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করিতেই হয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষার (Compulsory education) ব্যবস্থা রাষ্ট্র না করিলে দেশের অশিক্ষিত লোকেরা তাহাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে চাহে না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীতা স্বীকার করিতেই হইবে।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে দুর্বল ও অক্ষমদের সহায়তা করা রাষ্ট্রের উচিত নয়। এই যুক্তি মানবতা-বিরোধী। দুর্বলদের অপসারণ করা উচিত, এই মতবাদকেও সমর্থন করিতে পারা যায় না। রাষ্ট্র দুর্বলদের সবল করিবার চেষ্টা করিবে। কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া তাহাকে চিকিৎসা না করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে—এই মতবাদ কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নহে।

পঞ্চমতঃ, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। কিন্তু এইরূপ অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। ইহার ফলে সমাজে যাহারা দরিদ্র, তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে, সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, ধনসম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হইবে।

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের সহযোগিতা ভিন্ন দরিদ্রদের অবস্থা উন্নত হইবে না, বেকার-সমস্যা সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে না, সকলের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে না। সমাজের উৎপাদিত সামগ্রীর সুবণ্টন বরিতে হইলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অপরিহার্য।

উপসংহার : ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে, তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। তবে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা কখনও সম্ভব হইবে না। সমাজে 'অবাধ-নীতি'র প্রচলন হইলে মানুষের নৈতিক চেতনাবোধও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। সুতরাং সমাজ বা রাষ্ট্রকে অভিশাপ বলিয়া বর্ণনা করা অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক। সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই জনকল্যাণকারী; মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধনের জন্য ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

২। সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) :

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে মানবের উন্নতিলাভের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজ অপরিহার্য। কারণ, ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষুদ্র, রাষ্ট্রের সহায়তা ভিন্ন তাহার পক্ষে উন্নতিলাভ করা সম্ভব নয়। সুযোগ-সুবিধার অভাবে অনেক প্রতিভার নষ্ট হইয়া যাইতে দেখা যায়। রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করে, তাহা হইলে এত শক্তির অপচয় হয় না। সুতরাং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ-সাধনের জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

রাষ্ট্র বা সমাজ অপরিহার্য

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য না থাকিলে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং তাহার ফলে উৎপাদনও হ্রাস পায়। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন থাকা উচিত। অন্যথায় সমাজে নানাপ্রকার সমস্যার উদ্ভব হয়।

(২) সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে পুঁজিপতিদের একমাত্র দৃষ্টি থাকে মুনাফার উপর। যে-বস্তুতে মুনাফার সম্ভাবনা কম, সেই বস্তু সমাজে প্রয়োজনীয় হইলেও মালিকেরা উৎপাদন করে না, মুনাফার সম্ভাবনা যদি বেশী

থাকে, তাহা হইলে তাহারা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তুও উৎপাদন করিয়া থাকে।

(৩) এই মালিকানার ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং এই নীতি চলিতে থাকিলে ধনিক-সম্প্রদায়ের গৃহে উত্তরোত্তর ধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর দরিদ্রেরা ক্রমশঃ আরও দরিদ্র হইতে থাকে। শ্রমিকেরা তাহাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। পুঁজিপতিরা তাহাদের উপর শোষণ-নীতি চালাইয়া থাকেন। এই-সকল কারণে শ্রমিক-মালিক-সংঘর্ষ চিরকালই লাগিয়া থাকে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে এই-সকল অসুবিধা দূর করা যাইতে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অসুবিধা দূর করিবার জন্যই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

(৪) সমাজতন্ত্রবাদের মতে জায়গা, জমি, খনি, বিদ্যুৎ, রেলপথ ইত্যাদির মালিক হইবে রাষ্ট্র, ব্যক্তি নয়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, বণ্টন-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হইবে, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য দূরীভূত হইবে, শ্রমিক-মালিক-বিরোধের অবসান হইবে। এই-সকল কারণেই সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপসাধনের পক্ষপাতী।

বস্তুতঃ, সমাজ বা রাষ্ট্র কোন অকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান নহে। সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা :

গুণ : (১) সমাজতন্ত্রবাদীরা বর্তমান সমাজব্যবস্থার দোষ-ত্রুটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই মতবাদ অনুসারে সমগ্র সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে, কাহারও কোন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না, তাহা হইলে সকলেই নিজস্ব শ্রমের মূল্য লাভ করিতে পারিবে, সমাজে কেহ অতিরিক্ত ধনী হইতে পারিবে না বা কেহ অত্যন্ত দরিদ্রও হইতে পারিবে না। ন্যায়পরতার ভিত্তিতে সমগ্র সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলিকে দূর করিবার জন্যই সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত

উৎপাদন হইতে পারিবে না, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ হইবে এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হইবে। সকলে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারিলে, অভাব দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা হইতে সমাজ মুক্তিলাভ করিবে।

দোষ : (১) সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান ত্রুটি হইল তাহারা রাষ্ট্রকে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় মনে করে। সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়। মানুষই আপন প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের হস্তের পুত্তলিকা করিয়া তোলা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

(২) সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্তন হইলে ব্যক্তির কর্মতৎপরতা, কার্যে উৎসাহ কমিয়া যাইবে। কোন বস্তু উৎপাদন করিয়া তাহার ফল যদি ব্যক্তি নিজে ভোগ করিতে না পারে, তাহা হইলে উৎপাদনের উৎসাহ কমিয়া গিয়া উৎপাদন হ্রাস পাইবে।

(৩) তদুপরি ব্যক্তির জীবন যদি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে। কোন কার্যে ব্যক্তির কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিবে না।

উপসংহার : এইজন্য অনেকে রাষ্ট্রের হস্তে ব্যক্তিজীবন-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে করেন। কাহারও মতে সমাজতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ প্রবর্তন হওয়া সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়। তাঁহাদের মতে সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর। সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তিত হইলে ব্যক্তিকে সমাজের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইতে পারে। কিন্তু এতটা স্বার্থত্যাগী হওয়া খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব।

৩। সমাজতন্ত্রবাদের প্রকার-ভেদ (Different kinds of Socialism) :

সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যথা—রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism), সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism), অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Marxian Socialism)।

(ক) **রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ঃ** রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করিবে। শ্রমিকদের কল্যাণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম অবশ্যকর্তব্য।

(খ) **সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ঃ** সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত না করিয়া শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত সমিতির হস্তে ন্যস্ত করা উচিত।

(গ) **অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ ঃ** অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে জনসাধারণের সমস্ত কার্য শ্রমিক-সঙ্ঘের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

(ঘ) **মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ ঃ** কার্ল-মার্কস সমাজতন্ত্রবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের তিনটি মূলসূত্র আছে। প্রথমটি হইল উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্র (Theory of Surplus Value), দ্বিতীয়টি ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা (Materialistic Interpretation of History) এবং তৃতীয়টি হইল শ্রেণী-সংগ্রাম মতবাদ (Theory of Class-Struggle)।

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের তিনটি মূলসূত্র

(১) **উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্র ঃ** (১) মার্কসের মতে মালিকগণ শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিয়া উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থের অধিকাংশই নিজেরা মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করে।

(২) তাঁহার মতে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত দ্রব্য-উৎপাদনের জন্য যে-শ্রম-ব্যয় হয়, তাহার উপর। যে-দ্রব্য উৎপাদন করিতে অধিক শ্রম-ব্যয় হয় তাহার মূল্য অধিক, আর যাহার উৎপাদনে কম শ্রম-ব্যয় হয় তাহার মূল্য কম। শ্রমের পরিমাণের দ্বারা দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। কিন্তু দ্রব্য উৎপাদন করিতে শ্রমিকেরা যে-পরিমাণ পরিশ্রম করে, তাহা অপেক্ষা অনেক কম মজুরি তাহারা পায়। তাহাদের মজুরি ও বিক্রয়-মূল্যের মধ্যে যে-পার্থক্য, তাহাই মার্কসের মতে উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)। তিনি বলেন, মালিকেরা এই উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকদের ঠকাইয়া নিজেরা আত্মসাৎ করে।

মজুরি ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে যে-পার্থক্য, তাহাই উদ্বৃত্ত মূল্য

(৩) ইহার ফলে মালিকদিগের ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর শ্রমিকেরা আরও দরিদ্র হইতে থাকে।

(৪) মার্কসের মতে এই অবস্থা খুব বেশীদিন চলিতে পারে না। কেননা,

সমাজে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই। একদিন শ্রমিকরা এই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। তিনি বলেন, ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেশেই এইরূপ শ্রেণীভেদ বর্তমান ছিল। কিন্তু একদিন তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, যাহার ফলে পুরাতন অবস্থার বিলোপ ঘটিয়া নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

(২) ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা ঃ

মার্কস বলেন, উৎপাদন-নীতিই সমাজের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের প্রধান চেষ্টা জীবনধারণের উপায় আবিষ্কার করা। এইজন্য আদিমযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদনশক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই উৎপাদন-পদ্ধতিই সমাজের গতি ও পরিবর্তনকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা হইতে ধনতান্ত্রিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ধনতান্ত্রিক অবস্থা হইতে সমাজতান্ত্রিক অবস্থার দিকে সমাজ অগ্রসর হইতেছে।

উৎপাদন-নীতিই সমাজ-অভিব্যক্তির ভিত্তি

মার্কসের মতে মধ্যযুগের কৃষিপ্রধান সমাজে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা প্রচলিত ছিল। পূর্বে সকল গোষ্ঠীর মধ্যে যৌথসম্পত্তি-প্রথা প্রচলিত ছিল, কাহারও ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, উৎপাদিত সামগ্রী গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হইত। কিন্তু লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। এই সংঘর্ষে যাহারা জয়লাভ করিত, তাহারা পরাজিত গোষ্ঠীকে উৎপাদিত সামগ্রীর সমান অংশ দিতে চাহিত না। পরাজিত শ্রেণীকে তাহারা দাসরূপে নিজেদের কার্যে ব্যবহার করিতে লাগিল, জমি ও উৎপাদিত সামগ্রীর সমস্ত স্বত্ব বিজয়ী শ্রেণীদের হইল। এইভাবে সমাজে শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এক শ্রেণী জমি ও উৎপাদিত সামগ্রীর সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী, উৎপাদন-রীতির পরিচালক; অপর শ্রেণী কেবল পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন করিত, কিন্তু উৎপাদিত সামগ্রীর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। ইহার ফলে সামন্ত ও দাসদের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়।

শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি

সেই প্রাচীন গোষ্ঠী-সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজ পর্যন্ত সমাজের ইতিহাসে এই শ্রেণীবৈষম্য লাগিয়াই রহিয়াছে। এক শ্রেণী সমাজের সকল সম্পদের মালিক, সমস্ত মুনাফার অধিকারী; অপর

শ্রেণী সর্বহারা, সর্ব-অধিকার-বঞ্চিত, কেবল দারিদ্র্য ও দুঃখভোগের অধিকারী। বর্তমান যুগে উৎপাদনশক্তি-বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের বহুল উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়া রহিয়াছে। বর্তমান যুগে উৎপাদন-শক্তির এত উন্নতি হইয়াছে যে, সমাজের সকলের প্রয়োজন মিটাইবার মত পর্যাপ্ত সামগ্রী সমাজে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সমাজে শ্রেণীবৈষম্য থাকার ফলে তাহার সমবণ্টন হয় না। মালিকশ্রেণীর গৃহে ধন পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, আর মজুরশ্রেণী প্রয়োজনমত সামগ্রীও পায় না।

উৎপাদন-রীতি ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংঘর্ষ

মার্কসের মতে উৎপাদন-শক্তিই সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদন-পদ্ধতি ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শ্রেণীবৈষম্য লাগিয়াই রহিয়াছে। এইভাবে মার্কস বাস্তবকেই সমাজ-ইতিহাসের ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উৎপাদন-ব্যবস্থাই সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুর ভিত্তি। সমাজ কোন অলৌকিক সত্তার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে—এই বিশ্বাসেব মূলে মার্কস কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এইভাবে মার্কস ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

(৩) শ্রেণী-সংগ্রাম :

কিন্তু এই বৈষম্যমূলক অবস্থা সমাজে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধের একটা সমন্বয় হইবেই। শ্রেণীবৈষম্যের ফলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম নানা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মার্কস বলেন, এই শ্রেণী সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সমাজ-বিপ্লব, যে-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণী মালিকশ্রেণীর হস্ত হইতে সমস্ত অধিকার ও শক্তি করায়ত্ত করিবে, মালিকশ্রেণীকে সমাজ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিবে, শ্রমিকশ্রেণীর শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে, কোন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না, সমস্তই শ্রমিক-রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। কিন্তু এই শাসনকার্যের উদ্দেশ্য হইবে শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তোলা। যতদিন শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া না উঠে, ততদিনই কেবল শ্রমিক-শাসনের প্রয়োজনীয়তা

শ্রেণী-সংগ্রামের পরিণতি শ্রেণীহীন সমাজ

থাকিবে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রশক্তির আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, শাসনব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া যাইবে। উৎপাদিত সামগ্রীর উপর সকলের সমান অধিকার থাকিবে, সকলের মধ্যে সমাজের ধনসম্পদের সমবণ্টন করা হইবে। নূতন সমাজের একমাত্র কর্তব্য হইবে সমাজের উৎপাদিত বস্তুসমূহের তত্ত্বাবধান করা।

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা ঃ

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদে কার্ল মার্কস শ্রমের পরিমাণের উপর দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিতে চান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হওয়া সম্ভব নয়।

১। চাহিদা অনুসারে বস্তুর মূল্য বাড়ে কিংবা কমে। চাহিদা না থাকিলে শ্রমের পরিমাণ বেশী হইলেও বস্তুর মূল্য বাড়ে না। মূল্য-নির্ধারণ আরও অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে।

২। মার্কস মানব-ইতিহাসের কেবল সংগ্রাম ও ধ্বংসের দিকটাই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার গঠনমূলক দিকটাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়াছেন।

৩। সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্তনের দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠে না। পুঁজিপতিদের বিলোপ ঘটিলেও আর এক নূতন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, যাহাকে বলা যায় পরিচালকশ্রেণী। এই পরিচালকশ্রেণী রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে।

উপসংহার ঃ

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দেশে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচলন হইলেও তাহা পুরোপুরি মার্কসীয় সমাজতন্ত্র নহে, একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে বলা চলে। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আধুনিক যুগের সকল রাষ্ট্রই সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিগুলি মোটামুটি অনুসরণ করিয়া চলে। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মালিকশ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণনীতিকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মূলসিদ্ধান্ত ঃ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়েরই দোষগুণ বিচার করা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সমাজের

প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়ের সমন্বয়সাধন করিলে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব হইতে পারে। এমন একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা কল্পনা করিতে হইবে, যেখানে ব্যক্তি নিজেকে বিকশিত করিবার সুযোগ পাইবে; দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ দূরীভূত হইবে, ধনী-দরিদ্রে শ্রেণীবৈষম্য দূর হইবে, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকিবে, পারস্পরিক মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হইবে, সকলে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই দুই বিরোধী মতবাদের সমন্বয়ের ফলেই এইরূপ আদর্শ সমাজ-গঠন সম্ভব হইতে পারে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়সাধন করা কর্তব্য

আধুনিক রাষ্ট্রকে কেবল পুলিশী রাষ্ট্র হইলে চলিবে না, জনকল্যাণের আদর্শই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ পরস্পরবিরোধী হইলেও, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিক চেতনাবোধ একই সঙ্গে জাগ্রত ও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি বা সমাজ কাহাকেও অতিরিক্ত প্রাধান্য না দিয়া উভয়কেই উভয়ের উন্নতির সহায়ক বলিয়া গণ্য করা উচিত।

ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ে উভয়ের উন্নতির সহায়ক

সমাজের জৈব প্রকৃতি

(Society as an Organism)

১। **জৈব মতবাদ** (Organic or Organismic Theory)ঃ

যে-মতবাদ সমাজকে একটি জীবরূপে কল্পনা করে, তাহাকে জৈব মতবাদ বলা হয়। এই মতবাদ অনুসারে সমাজ একটি জীববিশেষ। জীবের যেমন জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু হয়, সমাজেরও সেইরূপ উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংস হয়। জীবদেহ যেরূপ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত, সমাজও সেইরূপ অসংখ্য ব্যক্তির দ্বারা গঠিত। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সমাজদেহের কোষবিশেষ। জীবদেহের অনুরূপ সমাজদেহেও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্তমান।

জৈব মতবাদ কাহাকে বলে

সামাজিক চুক্তি মতবাদের দোষত্রুটি দূর করিবার জন্য এই মতবাদের

উদ্ভব হইয়াছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে সমাজ মানুষের চুক্তির ফলে গঠিত একটি কৃত্রিম সংগঠন। কিন্তু জৈব মতবাদীরা সমাজকে একটি জীবন্ত দেহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রাকৃতিক উপায়ে সংঘটিত হইয়াছে, কোন চুক্তির ফলে নহে।

সামাজিক চুক্তিবাদ ও জৈব মতবাদ

অতি প্রাচীন কালেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমাজের সহিত জীবদেহের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর অনেক উক্তির মধ্যেও ইহার সূত্র পাওয়া যায়।

প্রাচীন দার্শনিকদের মতবাদ

সামাজিক চুক্তিবাদী হবস্ ও রুশোও সমাজকে জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। হবস্ বলিয়াছেন, সমাজ লিভিয়াথান নামে একটি সামুদ্রিক জন্তুর ন্যায় অতিকায় ও বৃহৎ জীববিশেষ। রুশোর মতেও সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। জীবদেহ যেরূপ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি, সমাজদেহেও সেইরূপ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্তমান।

হবস্ ও রুশোর মতবাদ

কিন্তু এই মতবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করে ব্লানৎস্লি (Bluntschli) ও হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) হস্তে। তাঁহারা সমাজকে সম্পূর্ণরূপে একটা জীবরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ব্লানৎস্লি বলিয়াছেন, সমাজ নিজেই একটা পুরুষ আর গীর্জা বা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সমাজের স্ত্রী। হার্বার্ট স্পেনসারের মতে মানুষের দেহের মত সমাজদেহেও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, স্নায়ুমণ্ডলী, জীবকোষ ইত্যাদি বর্তমান। জীবকোষ ব্যতীত যেমন জীবদেহ বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ ব্যক্তিকে বাদ দিয়াও সমাজ হইতে পারে না। জীবদেহের মত সমাজদেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ইত্যাদি হয়। সমাজের যাতায়াত-ব্যবস্থা, যান-বাহনের ব্যবস্থা ইত্যাদি জীবদেহের শিরা-উপশিরা, স্নায়ুমণ্ডলী ইত্যাদির অনুরূপ। জীব যেরূপ শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্ধক্যে উপনীত হয়, সমাজেরও উন্নতি এইরূপ ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। জীবদেহের মত সমাজও নানাপ্রকারের ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে এবং উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা তাহাকে নিরাময় করিতে হয়।

ব্লানৎস্লি ও হার্বার্ট স্পেনসারের মতবাদ

সমালোচনা: এই মতবাদ সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে।

প্রথমতঃ, ইহা স্বীকার্য যে, সমাজ জীবন্ত, ইহা একটি যন্ত্র-বিশেষ নয়, ইহার

বৃদ্ধি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দিলে ইহার মধ্যে মানুষের নির্বাচনের যে-অংশ আছে, তাহাকে অবজ্ঞা করা হয়। মানুষ ইচ্ছামত তাহার শরীরের বৃদ্ধি করিতে পারে না বা শরীরের কোন অংশের সামান্যতম পরিবর্তনও করিতে পারে না। কিন্তু সমাজ ইচ্ছামত নিজেকে পরিবর্তিত করিতে পারে—নিজের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করিয়া আবার নূতন করিয়া নিজেকে গঠন করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, জীবদেহ যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই সঙ্গে তাহার শরীরে ক্ষয়-সাধনের ক্রিয়াও চলিতে থাকে। সমাজের যখন বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়, তখন তাহার ক্ষয় হয় না।

তৃতীয়তঃ, মানুষের যৌবন একবার গেলে আর ফিরিয়া আসে না। সমাজ পুনঃ পুনঃ তাহার যৌবন ফিরাইয়া আনিতে পারে।

চতুর্থতঃ, মানবদেহে প্রত্যক্ষ করিবার ও চিন্তা করিবার জন্য যেরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, সমাজের তাহা নাই। সমাজ কিছু প্রত্যক্ষও করিতে পারে না, চিন্তাও করিতে পারে না। সমাজ ব্যক্তির জন্য চিন্তা করে না, ব্যক্তিই সমাজের জন্য চিন্তা করে।

পঞ্চমতঃ, মানবদেহের কোন একটি কোষ যদি সমগ্র দেহের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া চলে, তাহা হইলে মারাত্মক রোগে দেহ আক্রান্ত হয়। কারণ, জীবকোষের একমাত্র কাজ দেহের জন্যই। কিন্তু সমজের বেলায় ব্যক্তি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া কার্য করে, কেবল সমাজের জন্য কার্য করা তাহার উদ্দেশ্য নহে।

ষষ্ঠতঃ, সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা চিরাচরিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা-পদ্ধতির বিনাশসাধন করিয়া নূতন সংস্কারের দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকারসাধন করিয়া থাকেন। এইজন্য গিস্‌বার্ট (Gisbert) বলিয়াছেন: "সমাজে ব্যক্তিই উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজ করিয়া থাকে। আর জীবদেহে সমগ্র দেহই উদ্দেশ্যমূলক কাজ করে।"[১] আবার ম্যাকেঞ্জির মতে "সমাজকে জীব বলিতে হইলে, সমাজ এমন একটি জীব, যাহা বহু জীব দ্বারা গঠিত।" সেখানে প্রত্যেক জীবেরই স্বতন্ত্র জীবন আছে,[২] সুতরাং

(১) "In other words, in society it is the individuals who act teleologically, in the organism it it is the organism itself which acts teleologically."—Gisbert

(২) "If it is an organism, it is at least an organism of organisms, each one of which has a life of its own."—Mackenzie

সমাজের মধ্যে দুই প্রকারের উপাদানই বর্তমান—একটি সমাজের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অপরটি মানুষের নির্বাচন-ক্ষমতা ও বিচার-বুদ্ধি।

২। **জনকল্যাণের ধারণা (Idea of Common good) ঃ**

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ জনকল্যাণ-সাধন করা। বস্তুতঃ, দেশের রাজা কিংবা কর্তৃপক্ষ জনগণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। তবে কোন নীতি বা আইন প্রণয়ন করিবাব পূর্বে জনসাধারণের মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া বা না-দেওয়া তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। কোন কোন সময কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য করেন, কিন্তু সকল সময় তাহা সম্ভব হয় না। জনমত যদি শক্তিশালী হয়, তবে তাহারাও কর্তৃপক্ষকে তাহাদের দাবি মানিয়া লইতে বা মতামত গ্রাহ্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন উপায়ে যে-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহা সকলের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া হয না এবং তাহা সকলের পক্ষে কল্যাণজনক না-ও হইতে পারে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজের সকল কর্মপদ্ধতির মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনকল্যাণের আদর্শ প্রচ্ছন্ন থাকে।

সমাজেব আদর্শ জনকল্যাণসাধন কবা

বিভিন্ন মতবাদ ঃ (১) রুশোর মতে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে, সামাজিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে 'সাধারণ ইচ্ছার' (General will) উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। 'সাধাবণ ইচ্ছার' অর্থ হইল জনসাধারণের ইচ্ছা। সাধারণতঃ দেশের কর্তৃপক্ষ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিবার সময়ে 'সাধারণ ইচ্ছার' উপর সেইরূপ প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। 'সাধারণ ইচ্ছা' বলিতে রুশো অবশ্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের মতামতকে বুঝাইয়াছেন।

সাধারণ ইচ্ছা

(২) কিন্তু ডঃ বোসাঙ্কে (Dr. Bosanquet) তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সাধারণ ইচ্ছা জনসাধারণের এমন একটি 'বাস্তব ইচ্ছা' (Real will), যাহা ভোটের দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। কারণ, ভোটের দ্বারা যে-মতামত গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা অধিকাংশ ব্যক্তির মত হইলেও সকলের মত নহে। সমাজের কাজ কাহারও ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নহে।

ডাঃ বোসাঙ্কের মত

তাঁহাদের মতে সাধারণ ইচ্ছার উপরে ভিত্তি করিয়াই সমাজের কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

(৩) ম্যাকেঞ্জি একটি উদাহরণের দ্বারা 'সাধারণ ইচ্ছার' স্বরূপটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনে করা যাক যে, কোন একটি পরিবারের প্রত্যেকেই পূজার ছুটিতে কোথাও বেড়াইতে যাইতে চায়, কিন্তু এ সম্পর্কে কাহারও সঙ্গে কাহারও মতের মিল হইতেছে না। কেহ চায় নৌকা করিয়া ভ্রমণ করিতে, কেহ চায় সাইকেলে ভ্রমণ করিতে, কেহ চায় পাহাড়ী জায়গায় গিয়া পর্বতারোহণ করিতে। যদি পরিবারের কর্তার ইচ্ছা সকলে মানিয়া লয়, তাহা হইলে একজনের ইচ্ছাই রক্ষা করা হয়, অন্য সকলের ইচ্ছাব কোন মূল্য দেওয়া হয় না। যদি অধিকাংশ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হয়, কয়েকজনের মতামত অগ্রাহ্য কবা হয়, তাহাকে 'যুক্ত ইচ্ছা' (joint will) বলা যায় না। সকলে একমত হইলে যুক্ত ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। যদি তাহারা এমন একটি স্থান পছন্দ করে, যেখানে সকলের সকল ইচ্ছাই পূরণ হইবে, সকলে এবিষয়ে একমত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যুক্ত ইচ্ছা (joint will) বলা যাইতে পারে।

যুক্ত ইচ্ছা কাহাকে বলে

যদি আবার তাহারা সকলে এই বিষয়ে একসঙ্গে আলোচনা করিয়া এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যাহা কাহারও পক্ষে সন্তোষজনকও হইল না, আবার সম্পূর্ণ অসন্তোষজনকও হইল না—এইরূপ ইচ্ছাকে 'সম্মিলিত ইচ্ছা' (Co-operative will) বলা যাইতে পারে।

সম্মিলিত ইচ্ছা

এখন 'সাধারণ ইচ্ছার' স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ম্যাকডুগালের (McDougall) মতে সাধারণ ইচ্ছা তখনই সম্ভব হয়, যখন কোন দল বা সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির দল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা থাকে এবং সকলেই দলের বা সমাজের কল্যাণকে আপন কল্যাণ বলিয়া মনে করে ("A general will is coming to be when every individual in a group or Society has a conception of a group as a whole and identifies his own good with the good of the group."—McDougall)।

সাধারণ ইচ্ছার সংজ্ঞা

অনেক সময় পরিবারের সকলে আলোচনা করিয়া একজন ব্যক্তির প্রয়োজনকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়। যেমন, পরিবারে যদি কেহ অসুস্থ থাকে,

তাহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হাওয়া পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী—এইজন্য পরিবারের সকলে আলোচনা করিয়া এমন একটি স্থানে যাওয়া স্থির করিল, যে-স্থান অসুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। অন্যান্য সকলেই যদি তাহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে সানন্দে সম্মতি দেয়, তবে এই ইচ্ছাকে সাধারণ ইচ্ছা (General will) বলা যাইতে পারে। সুতরাং সাধারণ ইচ্ছা কেবলমাত্র সকলের মতামত নহে, ইহা এমন একটি সিদ্ধান্ত, যাহা সম্পূর্ণ ব্যাপারটি আলোচনা করিয়া, ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। কাজেই 'সাধারণ ইচ্ছা'র মধ্যে দুইটি জিনিস থাকা চাই। প্রথমতঃ, সকলের একত্র আলোচনা; দ্বিতীয়তঃ, সকলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এইজন্য ম্যাকেঞ্জি বলিয়াছেন, 'সাধারণ ইচ্ছা' তখনই সম্ভব হয়, যখন দলের অন্তর্গত সকলে আলোচনা করিয়া এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যেখানে দলের অন্তর্ভুক্ত সকলের মতামত গ্রাহ্য করা হয় এবং মতের পার্থক্যকে দলের ইচ্ছার অধীনে একীভূত করা হয়।

সাধারণ ইচ্ছার ব্যাখ্যা

সমালোচনা ঃ রুশো মনে করিতেন, এই সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার মত আমরা ঠিক বলিয়া মানিতে পারি না। কারণ, সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। তবে অন্যান্যরূপে গৃহীত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা ইহা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু ইহার অপর একটি দিকও বিবেচনার যোগ্য।

রুশোর মত সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নহে

প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিভিন্ন মতামত আছে। একজনের ইচ্ছা অপরের ইচ্ছার সহিত মিলে না। যেমন, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ-পরিচালনার ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। এইসকল পরস্পরবিরোধী মতবাদ কি একটি সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে একীভূত হওয়া সম্ভব? যদি বা তাহা সম্ভব হয়, এবং সকলেই সাধারণ ইচ্ছাকে মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও সেই 'সাধারণ ইচ্ছা'র মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিসর্জন দিতেই হয়। তাহার ফলে দল বা সমাজকে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়, যেন সমাজের জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব, ব্যক্তির জন্য

সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করে

সমাজের অস্তিত্ব নয়। ইহাতে সমাজের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

আবার, একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতামত মূর্খ ও অল্পশিক্ষিত অনেক ব্যক্তির মতামত অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান।

সাধারণ ইচ্ছা সকলেরই কল্যাণ-কারী হওয়া চাই

এইজন্য ডঃ বোসাঙ্কে (Dr. Bosanquet) বলিয়াছেন যে, সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে কেবল সকলের সম্মতি থাকিলেই চলিবে না, তাহা সর্বসাধারণের কল্যাণকারী হওয়া চাই।

সাধারণ কল্যাণ (Common good) ঃ পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, যে-কাজের দ্বারা অধিকসংখ্যক লোকের অধিক সুখ উৎপন্ন হয়, সেই কাজই সকলের পক্ষে কল্যাণজনক।

কিন্তু এই মতবাদের কতকগুলি অসুবিধা আছে। কারণ, ইহার দ্বারা 'সাধারণ কল্যাণ' সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। পূর্বে বর্ণিত পরিবারের উদাহরণটি দ্বারা সাধারণ কল্যাণের ধারণা স্পষ্ট হইবে। যথা—ছুটি পরিবারের সকলেই কামনা করে; কারণ, ইহা সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। ইহাতে পরিবারের সকলেরই উপকার হইতে পারে, অথবা একজন বা কয়েকজন, যাহাদের ছুটির প্রয়োজন বেশী, তাহাদের উপকার হইতে পারে। ছুটির দ্বারা যতখানি উপকার হইবে আশা করা গিয়াছিল, ততখানি না হইলেও আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, উপকৃত হইবার আশাতেই ছুটির দিন কামনা করা হইয়াছিল। এমন কি, যদি কেবল একজন ব্যক্তির জন্যও ছুটি কামনা করা হয়, তথাপি তাহাকে 'সাধারণ কল্যাণ' বলা যাইতে পারে। কারণ, সকলেই ইহা কামনা করিয়াছিল এবং সকলেরই ইহাতে উপকার হয়। আদর্শ সমাজে সকল কাজের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই 'common good' বা সর্বসাধারণের কল্যাণ। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কোন্ কাজকে জনসাধারণের কল্যাণকর কাজ বলা হইবে? একই কাজের দ্বারা সকলের কল্যাণ না-ও হইতে পারে, কিন্তু স্পিনোজা (Spinoza) বলিয়াছেন : "The highest good is common to all and all may equally enjoy it." অর্থাৎ সর্বোচ্চ কল্যাণে সকলেরই কল্যাণ হয়, সকলেই ইহা ভোগ করিতে পারে। এইজন্যই যে-কাজে সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়, তাহাকে 'সাধারণ কল্যাণ' বা

আদর্শ সমাজের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের কল্যাণ করা

সর্বোচ্চ কল্যাণে সকলেরই কল্যাণ হয়

'common good' বলা হয়। সমাজে প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সর্বসাধারণের কল্যাণ করা। যেমন, জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, খাদ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা, শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যবস্থা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের কল্যাণ করা এবং সকলেরই ইহাতে কল্যাণ হয়।

এখন 'সাধারণ ইচ্ছা' ও 'সাধারণ কল্যাণের' মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা প্রয়োজন। 'সাধারণ ইচ্ছা'র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সর্বসাধারণের কল্যাণ করা এবং যাহাতে সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়, তাহাতেই সাধারণ ইচ্ছার সম্মতি আছে মনে করিতে পারা যায়। এইজন্য 'সাধারণ ইচ্ছা' না বলিয়া কেবল 'সাধারণ কল্যাণ' কথাটি ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে-কাজের দ্বারা সকলের কল্যাণ হয়, তাহাই সাধারণ কল্যাণ। সাধারণ কল্যাণ সকলেই ভোগ করিতে পারে, ইহার উপরেই জাতির তথা সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে।*

সাধারণ ইচ্ছা ও সাধারণ কল্যাণ

---

* ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সংজ্ঞার জন্য যথাক্রমে ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান

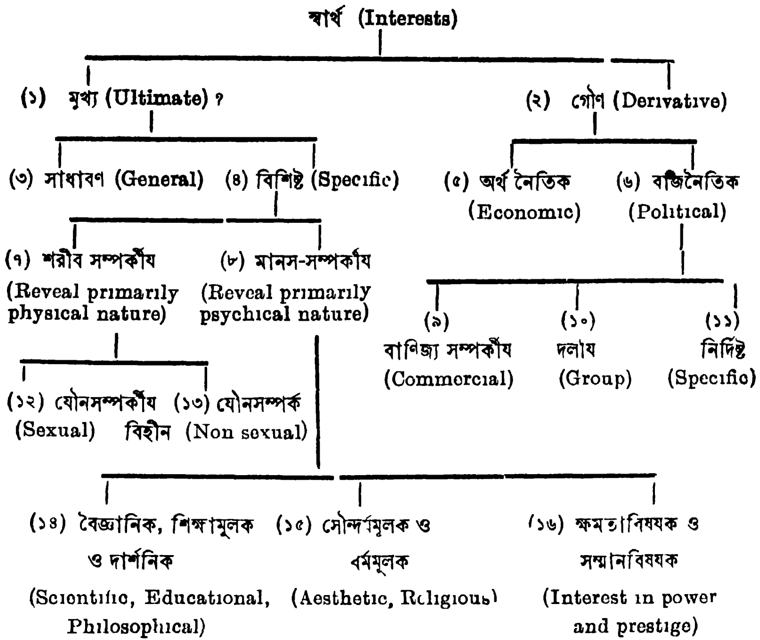
(Social Groups and Social Institutions)

১। **সমাজের কাঠামো (Structure of the Society)ঃ** বৃহত্তর অর্থে সমাজ বলিতে সমগ্র মানব-সমাজকে বুঝায়। কিন্তু সমাজের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গোষ্ঠী বর্তমান থাকে, যাহাদের মধ্যে ভাষায়, ধর্মে, শিক্ষায়, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে অনেক প্রকারের বিভিন্নতা বর্তমান। সমাজের এই-সকল ক্ষুদ্র অংশকে সামাজিক গোষ্ঠী বলা হইয়া থাকে। সমাজ সামাজিক গোষ্ঠীগুলি অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর, সুসংবদ্ধ ও দীর্ঘকালস্থায়ী। তবে তাহাদের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নাই, তাহাদের পার্থক্য কেবল পরিমাণের।

সমাজ ও গোষ্ঠী

মানুষ তাহাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধন করিবার নিমিত্ত এই-সকল গোষ্ঠী গড়িয়া তোলে। ম্যাকাইভার মনে করেন, সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক গোষ্ঠী সমাজের এক-একটি অঙ্গবিশেষ। সুন্দর ও উন্নত জীবনযাপন করিবার নিমিত্ত মানুষ এই-সকল গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে। এই-সকল গোষ্ঠীর মাধ্যমে যে-সকল সুখ-সুবিধালাভ হয়, তাহা গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকলেই সমানভাবে ভোগ করিতে পারে। সমাজের এই-সকল গোষ্ঠীর গঠন সম্পর্কে ম্যাকাইভার সুন্দর একটি নক্‌শা তৈয়ারি করিয়াছেন। তাঁহার মতে গোষ্ঠীর ভিত্তি হইল 'স্বার্থ' (Interest) বা সুযোগ-সুবিধা। তিনি বলেন, 'স্বার্থ'ই মানুষকে কর্মে উদ্দীপিত করে এবং সমাজেরও ভিত্তি হইল 'সাধারণ স্বার্থ' (Common interest)। কাজেই মানুষের বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর পিছনে কোন-না-কোন প্রকারের স্বার্থবোধ আছে। পরপৃষ্ঠায় ম্যাকাইভার-বর্ণিত স্বার্থের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ দেখানো হইল।

স্বার্থই গোষ্ঠীর ভিত্তি



ম্যাকাইভার স্বার্থকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—(১) মুখ্য ও (২) গৌণ। মুখ্য স্বার্থের উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থ কামনা করা, আর গৌণ স্বার্থের উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে স্বার্থ কামনা করা। তিনি মুখ্য স্বার্থকে আবার দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—(৩) সাধারণ ও (৪) বিশিষ্ট। সাধারণ মুখ্য স্বার্থের উদ্দেশ্য সকলের জন্য স্বার্থ কামনা করা। এই প্রকারের মনোভাব হইতে ক্লাব, জনহিতকর সঙ্ঘ, সাহায্য-সমিতি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। বিশিষ্ট স্বার্থের উদ্দেশ্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট স্বার্থলাভ। বিশিষ্ট স্বার্থ আবার (৭) শরীর-সম্পর্কীয় ও (৮) মানস-সম্পর্কীয়—দুই প্রকারের হইতে পারে। শরীর-সম্পর্কীয় বিশিষ্ট স্বার্থকে আবার (১২) যৌন-সম্পর্কীয় ও (১৩) যৌন-সম্পর্কবিহীন স্বার্থ—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যৌন-সম্পর্কীয় স্বার্থ হইতে গড়িয়া উঠে বিবাহ, পরিবার, আত্মীয়তা ইত্যাদি। আর, যৌন-সম্পর্কবিহীন স্বার্থ হইতে গড়িয়া উঠে কৃষি-সঙ্ঘ, শিল্প-সঙ্ঘ, স্বাস্থ্য-সঙ্ঘ, ইত্যাদি। মানস-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগত স্বার্থ হইতে তিন প্রকারের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে: (১৪) বৈজ্ঞানিক, শিক্ষামূলক ও দার্শনিক। এই ধরনের

বিভিন্ন প্রকারের মুখ্য স্বার্থ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে

স্বার্থ হইতে গড়িয়া উঠে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। (১৫) সৌন্দর্যমূলক ও ধর্ম-বিষয়ক স্বার্থ হইতে গড়িয়া উঠে চিত্রকলা-প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান, নাট্য-সঙ্ঘ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ইত্যাদি ; (১৬) ক্ষমতা-বিষয়ক ও সম্মান-বিষয়ক স্বার্থ হইতে গড়িয়া উঠে এমন-সব জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান, যাহার মাধ্যমে মানুষ ক্ষমতার অধিকারী বা সম্মানের অধিকারী হইতে পারে।

গৌণ স্বার্থকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(৫) অর্থনৈতিক ও (৬) রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক স্বার্থ হইতে ব্যাঙ্ক, সমবায়-সমিতি ইত্যাদির উদ্ভব হয়। (৬) রাজনৈতিক স্বার্থ তিন প্রকারের হইতে পারে : (৯) বাণিজ্য-সম্পর্কীয় স্বার্থ, (১০) দলীয় স্বার্থ ও (১১) নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ। বাণিজ্য-সম্পর্কীয় স্বার্থ হইতে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ, যথা—মিউনিসি-প্যালিটি, কর্পোরেশন ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। দলীয় স্বার্থ হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে; নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ হইতে কতকগুলি বিশেষ প্রকারের সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে, যেমন—করদাতাদের সঙ্ঘ (Rate-Payers' Association)।

বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সঙ্ঘ বা সামাজিক গোষ্ঠী বাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ভিত্তি হইল কোন-না-কোন প্রকারের স্বার্থবোধ। কিন্তু যে-স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া সামাজিক গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে, কেবল সেই স্বার্থের মধ্যে সঙ্ঘ সীমাবদ্ধ থাকে না, যেমন—রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি ধর্মবিষয়ক স্বার্থ হইলেও ইহা কেবল ধর্ম-কার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যেও অগ্রণী হইয়া থাকে। আবার যৌনসম্পর্ক-বিহীন ব্যক্তিগত গোষ্ঠীরও অর্থনৈতিক স্বার্থ থাকিতে পারে। এক কথায়, গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ স্বার্থ হইতে উদ্ভূত হইলেও সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইতে থাকে।

সঙ্ঘ কোন নির্দিষ্ট স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না

ম্যাকাইভার-বর্ণিত স্বার্থের শ্রেণীবিভাগের সহিত হব্‌হাউসের (Hob-house) শ্রেণীবিভাগের পার্থক্য আছে। হব্‌হাউসের মতেও সকল গোষ্ঠীর ভিত্তি মূলস্বার্থ (root-interest)। এই স্বার্থ আবার (১) আত্মকেন্দ্রিক, (২) পর-কেন্দ্রিক ও (৩) বস্তু-কেন্দ্রিক—এই তিন প্রকারের হইতে পারে। হব্‌হাউস মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়াই সমাজ-সংগঠনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হব্‌হাউসের শ্রেণীবিভাগ

কিন্তু এইভাবে স্বার্থ ও স্বার্থোদ্ভূত গোষ্ঠীকে সর্বদা পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে ম্যাকাইভারের পরিকল্পনার দ্বারা সমাজের কাঠামো সম্পর্কে বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে।

২। সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ (Its nature and Divisions):

গিস্‌বার্ট সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে কতকগুলি ব্যক্তি যখন একটি স্বীকৃত সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক কার্য করে, তখন তাহাকে সামাজিক গোষ্ঠী বলা হয় ("A social group is a collection of individuals interacting on each other under recognizable structure".), যথা—পরিবার, রাজনৈতিক দল, ক্রিকেট-ক্লাব অথবা বিশেষ কোন সামাজিক শ্রেণী ইত্যাদি। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন স্বীকৃত সংগঠনের মাধ্যমে মিলিত হয় এবং যে-উদ্দেশ্যে তাহারা মিলিত হয়, তাহা সাধন করিবার জন্য তৎপর হয়।

সামাজিক গোষ্ঠী

গিস্‌বার্ট আবার সামাজিক গোষ্ঠীর সহিত আধাআধি গোষ্ঠী বা প্রচ্ছন্ন গোষ্ঠীর (Quasi group or Potential group) পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। যে-জনসমষ্টি কোন স্বীকৃত সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহাদিগকে সামাজিক গোষ্ঠী বলা যায় না, তাহারা আধাআধি গোষ্ঠী। আধাআধি গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকিলেও তাহা কোন স্বীকৃত সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়াই তাহাকে সামাজিক গোষ্ঠী হইতে পৃথক করা হইয়াছে। একটি আধাআধি গোষ্ঠীর উদাহরণ লওয়া যাক। বাংলা দেশে যত শিক্ষক আছেন, তাঁহারা সকলেই এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা কোন স্বীকৃত সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত না করেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগকে আধাআধি গোষ্ঠী বলা হয়। আধাআধি গোষ্ঠী ইচ্ছা করিলেই সামাজিক গোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। শিক্ষক-সম্প্রদায় মিলিত হইয়া তাঁহাদের দাবি-দাওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন 'All Bengal Teachers' Association' নাম দিয়া একটা স্বীকৃত সংগঠন গড়িয়া তুলিলেন, তখন তাঁহারা সামাজিক গোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত হইলেন।

আধাআধি গোষ্ঠী

আধাআধি ও সামাজিক গোষ্ঠী

এইভাবে নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, যথা—শ্রমিক-সঙ্ঘ, ব্যবসায়ী-সংসদ, শিক্ষক-সম্মেলন ইত্যাদি। সাধারণতঃ যখন জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন তাহারা এইরূপ সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের দাবি-দাওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে, আবার জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজসেবা করিবার জন্যও নানাপ্রকার সংগঠনের সৃষ্টি হয়।

স্বার্থ ই সামাজিক গোষ্ঠীর ভিত্তি

ম্যাকাইভার আবার ব্যাপক অর্থে 'স্বার্থকে' দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (Primary and Secondary)। যে-সকল বস্তুর নিজস্ব মূল্য আছে এবং তাহার জন্যই তাহাদের কামনা করা হইয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রাথমিক স্বার্থ বলে, যেমন—স্বাস্থ্য, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ, প্রজনন, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির মধ্যে প্রাথমিক স্বার্থবোধ আছে। ইহাদের নিজস্ব মূল্য আছে বলিয়া ইহাদের কামনা করা হয়, অন্য বস্তু-লাভের উপায় হিসাবে ইহাদের কামনা করা হয় না।

প্রাথমিক স্বার্থ

আর, যে-সকল স্বার্থ অন্য স্বার্থ-লাভের জন্য কামনা করা হইয়া থাকে, তাহাদিগকে মাধ্যমিক স্বার্থ বলা হয়, যথা—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ। ইহাদেরই জন্য ইহাদের কামনা করা হয় না, অন্যান্য স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ কামনা করে।

মাধ্যমিক স্বার্থ

এই দুই প্রকারের স্বার্থ ছাড়া আর এক প্রকারের স্বার্থ আছে, তাহাকে মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী (Intermediate interest) বলা যাইতে পারে। মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী স্বার্থের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকারের স্বার্থভাবই বর্তমান, যথা—জনহিতকর সঙ্ঘ, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ ইত্যাদি। এই-সকল সঙ্ঘের মাধ্যমে লোকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকারের স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে।

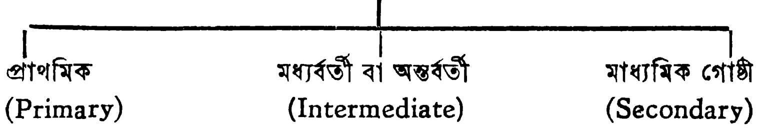
মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী স্বার্থ

গিন্সবার্গ (Ginsberg) বিভিন্ন প্রকারের মূলস্বার্থের (Root-interest) তিনটি বিভাগ করিয়াছেন, যথা—(১) জৈবিক প্রয়োজন সিদ্ধ করা, অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, পোশাক-পরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা করা; (২) মানুষের সহিত বস্তুজগতের বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্কের ফলে যে-প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা সিদ্ধ করা, যথা—যন্ত্রনির্মাণ, গৃহ-

Ginsberg-এর মতে স্বার্থের তিনটি বিভাগ

নির্মাণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, (৩) মানুষের সহিত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে যে-সমস্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, উহার পূরণ করা, যথা—যৌন-সম্পর্কের ব্যবস্থা করা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

৩। **সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগঃ** স্বার্থই যদি সামাজিক গোষ্ঠীর ভিত্তি হয়, তবে এই-সকল স্বার্থের উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক গোষ্ঠীরও বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—



প্রাথমিক গোষ্ঠী

যে-গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সভ্যদের পরস্পরের সহিত মুখোমুখি পরিচয় থাকে, তাহাকে প্রাথমিক গোষ্ঠী বলা হয়, যেমন,—ক্লাব, কলেজের ছাত্র-ইউনিয়ন ইত্যাদি। ইহাতে সভ্যদের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্পর্ক থাকে বলিয়া ইহাকে মুখোমুখি গোষ্ঠীও (Face-to-face group) বলা যাইতে পারে।

মাধ্যমিক গোষ্ঠী

আর, যে-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয়ের বন্ধন নাই, কেবল পরোক্ষ সম্পর্ক বর্তমান, তাহাকে মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Group) বলা হয়, যেমন,—রাজনৈতিক দল, বিরাট জনতা, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি।

গোষ্ঠীর প্রভাবঃ সমাজের উপর প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রভাব খুব বেশী। এই-সকল প্রাথমিক গোষ্ঠীর সভ্যরা অধিকাংশ সময় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল গল্প করিবার জন্যই মিলিত হয়। কিন্তু এই গল্প-গুজব, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাহারা অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারে। সভ্যরা পরস্পরের কাছ হইতে প্রয়োজন-মত সহানুভূতি, উৎসাহ, উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভাবটি খুব প্রবল হয়। সভ্যদের জীবনের আদর্শ-গঠনে, চরিত্রের দৃঢ়তা-অর্জনে, জীবনের উন্নতি-লাভে প্রাথমিক গোষ্ঠীর আলাপ-আলোচনা যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব এত প্রবল থাকে যে, তাহারা নিজেদের বিভিন্নতা ভুলিয়া যায়, সকলের মধ্যে একাত্মতার ভাব জাগ্রত হয়,

প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভাল প্রভাব

'আমরা' বলিয়া তাহারা নিজেদের এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করে। জীবনকে আদর্শের পথে পরিচালিত করিবার প্রাথমিক ভিত্তি হইল এই মুখোমুখি বা প্রাথমিক গোষ্ঠী।

আবার, প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে যদি সমাজবিদ্রোহী মনোভাব জাগ্রত হয় বা তাহারা যদি অসৎপথে পরিচালিত হয়, নীচস্তরের কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে। অনেক ষড়যন্ত্রের ও অসৎকার্যের সূত্রপাত মুখোমুখি গোষ্ঠীর আলাপ-আলোচনার মধ্যেই হয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর মন্দ প্রভাব

মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃত। সেইজন্য মাধ্যমিক গোষ্ঠীব সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে না, অনেক সময় তাহাদের মধ্যে চাক্ষুষ পরিচয়ও থাকে না। তাহাদের সম্পর্ক পরোক্ষ ও বাহ্য। সমাজের উপর মাধ্যমিক গোষ্ঠীর প্রভাব প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক কম। সভ্যদের জীবনের উপরেও এইরূপ গোষ্ঠী খুব বেশী প্রভাববিস্তার করিতে পারে না।

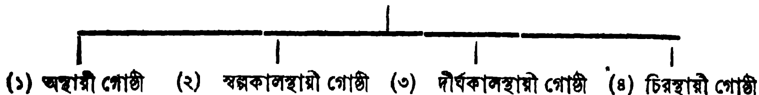
মাধ্যমিক গোষ্ঠীর প্রভাব

এই-সকল গোষ্ঠী ব্যতীত আর একপ্রকার গোষ্ঠী আছে, যাহাকে **মধ্যবর্তী** বা **অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী** (Intermediate Groups) বলা যায়। ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক মাধ্যমিক গোষ্ঠীর তুলনায় বেশী, আবার প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় কম। সেইজন্য ইহাদিগকে মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী বলা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা, পুলিশ-নাগরিক—ইহারা অন্তর্বর্তী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক না থাকিলেও ইহারা পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন।

অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী

গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তর: সংগঠনের দৃঢ়তা বা স্থায়িত্ব অনুসারে গোষ্ঠীর গঠনকে চারিটি স্তরে ভাগ করা যায়।

গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তর



স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়, তাহারা প্রথম স্তরে পড়ে, যেমন—রাস্তার জনতা। ইহারা হঠাৎ আবির্ভূত হয়, আবার হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়।

(২) স্বল্পকালস্থায়ী গোষ্ঠী

যে-সমস্ত গোষ্ঠী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গড়িয়া উঠে, তাহারা দ্বিতীয় স্তরে পড়ে, যেমন—কোন কলেজের ছাত্র-ইউনিয়ন। ইহাদের স্থায়িত্ব প্রথম স্তরের তুলনায় বেশী। সভ্যদের ইচ্ছানুসারে এই-সকল গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। আবার তাহাদের ইচ্ছানুসারে ভাঙ্গিয়া যায়।

(৩) দীর্ঘকাল-স্থায়ী গোষ্ঠী

তৃতীয় স্তরের গোষ্ঠীগুলি সভ্যদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, তাহাদের সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, যেমন—শ্রমিক-সংসদ, শিক্ষা-সমিতি, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি। ইহাদের স্থায়িত্ব দ্বিতীয় স্তরের গোষ্ঠী অপেক্ষাও বেশী।

(৪) চিরস্থায়ী গোষ্ঠী

চতুর্থ স্তরে পড়ে সেই-সকল গোষ্ঠী, যাহারা চিরকাল-স্থায়ী, কোনক্রমেই ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়, যথা—গ্রাম, শহর, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী

গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাগ : গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে বন্ধনের (bonds) অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করিয়া গোষ্ঠীগুলিকে আরও দুইভাগে ভাগ করা যায়—অন্তর্গোষ্ঠী (In-Groups) ও বহির্গোষ্ঠী (Out-Groups)। অন্তর্গোষ্ঠীর মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধতা না করিলেও 'আমরা'-ভাব প্রবল থাকে, যথা—ছাত্র-ইউনিয়ন। আর, বহির্গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যের সহিত বিরুদ্ধতা করিবার সময় 'আমরা'-ভাব প্রবল হইয়া উঠে, যথা—রাজনৈতিক দল।

৪। সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান (Social Institutions) :

"Institutions are established and recognised forms of relationship between social beings."—Maciver

প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের সংজ্ঞা

সামাজিক ব্যক্তিদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত সম্পর্কের আকারকে 'Institution' বলা হয়। যে-সকল সামাজিক সম্পর্ক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে, কেবল সেই-সকল সম্পর্ককেই Institution বলা যাইতে পারে।

Institutions বলিতে সাধারণতঃ আমরা কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইয়া থাকি, যেমন—স্কুল, কলেজ ইত্যাদি। কিন্তু ম্যাকেঞ্জি বৃহত্তর ও সঙ্কীর্ণ

অর্থে 'Institution'-এর দুইরকম রূপ দিয়াছেন। তাঁহার মতে বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্র, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদিও সামাজিক Institutions; কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রকে Institution বলা যায় না। লোকসভাকে Institution বলা যায়। শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি Institution নহে, স্কুল, গীর্জা ইত্যাদি Institution। তবে তাঁহার মতে রাষ্ট্র ও লোকসভা, শিক্ষা ও স্কুল, ধর্ম ও গীর্জার মধ্যে পার্থক্য গুণের নহে, পরিমাণের। এই-সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমাজে ঐক্য-স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু তাঁহার মতে ভাষাই সমাজের প্রধান Institution। কারণ, ভাষা ব্যতীত মানুষে-মানুষে ঐক্য-স্থাপনের কল্পনাও করা যায় না। সমাজের উপর ভাষার প্রভাব এত বেশী যে, ইহার দ্বারা সমাজে যেমন ঐক্য স্থাপন করা যায়, আবার ইহাই ঐক্য-প্রতিষ্ঠায় ভীষণ বাধা সৃষ্টি করিতে সক্ষম; সুতরাং ভাষা সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান।

Institution বৃহত্তর অর্থে অনুষ্ঠানকে বুঝায়, সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়

ভাষা সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান

গিস্‌বার্ট মনে করেন যে, Institution[১] কোন প্রতিষ্ঠান নহে। তিনি Institution-এর নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন:

"ব্যক্তির সহিত গোষ্ঠীর সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কতকগুলি স্থায়ী ও অনুমোদিত কার্যপ্রণালীকে Institution বলা হয়।" তাঁহার মতে Institutionকে সমাজের অথবা সঙ্ঘের প্রতিনিধি বলা যায়। তাহারা হইল সমাজের চাকা, সমাজের কার্যকে ঠিকমত চালাইবার যন্ত্রস্বরূপ, সামাজিক জীবনের ভিত্তি। সুতরাং Institution বলিতে তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতিকে বুঝাইয়াছেন। তবে প্রতিষ্ঠান হইতে তাহার কর্মপদ্ধতিকে পৃথক করা যায় না, তাহারা এক ও অভিন্ন।

গিসবার্ট-এর মতবাদ

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে; কর্মপদ্ধতি বা Institution হইল সেই লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়। পরিবারকে যদি প্রতিষ্ঠান বলা হয়, বিবাহ-প্রণালী তাহার প্রধান Institution।

(১) "Institutions are usually defined as "Certain and accepted forms of procedure governing the relations between individuduals and groups."
—Gisbert

সেইরূপ কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পূজাপদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিকেও Institution বলা হয়। রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা যাইতে পারে। দলের নিয়মাবলীকে তাহার Institution বলা যায়। তবে প্রতিষ্ঠান ও তাহার কার্যপ্রণালী অভিন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠানকেই Institution বলা হয়।

প্রতিষ্ঠান ও তাহার কর্মপদ্ধতি অভিন্ন

প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সম্পর্ক :

(১) প্রতিষ্ঠান সমাজজীবনকে গড়িয়া তোলে, আর অনুষ্ঠান তাহাকে জীবন ও কর্মতৎপরতা দান করে। (২) প্রতিষ্ঠান হইল বস্তু, আর অনুষ্ঠান হইল তাহার আকার ও পদ্ধতি। (৩) মানুষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও জীবনধারণ করে, কিন্তু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম করে।

যদিও প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান, তথাপি উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও আছে। প্রতিষ্ঠান স্থিতিশীল (static) এবং অনুষ্ঠান গতিশীল (dynamic) বলিয়া সমাজতত্ত্বের সহিত অনুষ্ঠানেরই গভীর সম্পর্ক।

৫। প্রথা কাহাকে বলে ? (What is Custom ?) :

ম্যাকাইভার বলেন : "প্রথা হইল সমাজের কতকগুলি স্বীকৃত রীতি-নীতি, যে রীতিনীতি অনুসারে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবা খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, খেলাধুলা করা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।"[১] কাজেই প্রথা বলিতে সমাজের অনুমোদিত নিয়মাবলীকে বুঝাইয়া থাকে এবং সমাজের ব্যক্তিদের এই-সকল নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হয়। প্রথাকে না মানিয়া ব্যক্তির উপায় নাই, সামাজিক ঐতিহ্য মনে করিয়া লোকেরা বংশপরম্পরানুক্রমে এই-সকল সামাজিক প্রথা মানিয়া চলে, ব্যক্তির নিজস্ব স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে সেইখানে বিসর্জন দিতে হয়। খাওয়া, পরা ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু-সমাজের ও মুসলমান-সমাজের প্রথার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রত্যেক সমাজের ব্যক্তিরা তাহাদের নিজস্ব প্রথাকে সম্মান ও মান্য করিয়া থাকে।

প্রথা হইল সমাজের অনুমোদিত রীতিনীতি

কিন্তু প্রথা কেবল সমাজের স্বীকৃত নিয়ম নহে, তাহাকে সমাজের

(১) Custom may be defined as "the accepted ways in accordance with which members of a group perform familiar acts, eat and drink, dress and play, and generally behave themselves." —Maciver

শাসনও (sanctions) বলা চলে। সমাজের এই শাসন আইনসম্মত না হইলেও ইহার প্রভাব আইন অপেক্ষাও বেশী। আইনে কখনও ছাগ-মাংস ভক্ষণ করা হইবে, কি গো-মাংস ভক্ষণ করা হইবে, বা কি উপায়ে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে, বা সমাজে কাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, কি উপায়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে —এই-সব ব্যাপারে কোন নির্দেশ নাই। কিন্তু এই-সকল কার্যে সামাজিক প্রথার শাসন সকলকেই মানিয়া লইতে হয়। ৺বিজয়া দশমীর পরে হিন্দুরা যদি গুরুজনদের প্রণাম না করে, বা বন্ধুদের আলিঙ্গন না করে, তবে সমাজে সে অত্যন্ত নিন্দনীয় হয়। মুসলমানেরা যদি তাহাদের নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, তবে সমাজের চক্ষে সে অত্যন্ত হেয় হইবে সন্দেহ নাই। এইজন্য সামাজিক প্রথা অনুসারে লোকেরা তাহাদের সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

প্রথা হইল সামাজিক শাসন

প্রথার মধ্যে তিনটি উপাদান বর্তমান আছে, যেমন—(১) অভ্যস্ত প্রক্রিয়া, (২) সামাজিক শাসন ও (৩) আদর্শগত মূল্য। সামাজিক প্রথা পালন করিতে করিতে ইহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার সামাজিক ও আদর্শমূলক দিক আছে বলিয়া সাধারণ অভ্যাসের (habit) সহিত ইহাকে এক করা যায় না। সাধারণ অভ্যাস ব্যক্তিগত, সামাজিক রীতি নহে, ইহাতে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। কিন্তু প্রথা হইল সামাজিক রীতি। প্রথা পালন করিতে লোকে বাধ্য হয় ("Custom is a tyrant who binds man in iron fetters."—Westermarck)। সামাজিক অনুমোদন ছাড়াও প্রথার একটা আদর্শগত মূল্য আছে। কোন একটা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন সামাজিক প্রথা গড়িয়া উঠে।

প্রথার তিনটি উপাদান

৬। অনুষ্ঠান ও প্রথা (Institution and Custom):

পার্থক্য: অনুষ্ঠান ও প্রথার মধ্যে গুণের পার্থক্য না থাকিলেও পরিমাণের পার্থক্য আছে।

(১) প্রথা হইল সমাজের একটি অভ্যস্ত ও অনুমোদিত আচরণ, যেমন—বাড়ীতে কোন অতিথি আসিলে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জানানো একটি প্রথা। সামাজিক প্রথা ভঙ্গ করিলে লোক অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

(২) অনুষ্ঠানও একপ্রকার সামাজিক রীতি। তাহার বাধ্যবাধকতা প্রথা অপেক্ষাও প্রবল।

(৩) অনুষ্ঠান প্রথা অপেক্ষা আরও নৈর্ব্যক্তিক, স্বতঃস্ফূর্ত। ইহার আদর্শগত মূল্য আরও বেশী।

(৪) সমাজে অনুষ্ঠানের বিস্তৃত স্বীকৃতি আছে, সমাজের পক্ষে প্রথা অপেক্ষা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অধিক। বিবাহরূপ অনুষ্ঠান সমাজের সকলকেই পালন করিতে হয়। ইহার সামাজিক স্বীকৃতি ও আদর্শগত মূল্যের পরিমাণ প্রথা অপেক্ষা বেশী এবং সমাজের উপর ইহার প্রভাবও অসীম।

৭। অনুষ্ঠান ও সঙ্ঘ (Institution and Association):

An association is a "group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organisation with a view to securing a specific end or ends."—Ginsberg

এক বা একাধিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতকগুলি ব্যক্তি যখন একত্র হইয়া কোন সংগঠন গড়িয়া তোলে, তখন তাহাকে সঙ্ঘ বলা হয়, যেমন—পরিবার, স্কুল, কলেজ, চার্চ ইত্যাদি। গিন্সবার্গের মতে "সামাজিক কোন গোষ্ঠী বা দল যখন এক বা একাধিক উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত একই সংগঠনের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তখন তাহাকে সঙ্ঘ বলা হয়।" কাজেই সঙ্ঘকে সম্মিলিত সংগঠনও বলা যায়।

সঙ্ঘের সংজ্ঞা

সঙ্ঘের সহিত অনুষ্ঠানের কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য আছে। সঙ্ঘ হইল একটি দল বা গোষ্ঠী (group), আর অনুষ্ঠান হইল তাহার আকার (form)। অনুষ্ঠান হইল সামাজিক ব্যক্তিদের মধ্যে অনুমোদিত ও স্বীকৃত সম্পর্কের আকার ("Institutions are established and recognised forms of relationship."), যেমন—বিবাহ একটি অনুষ্ঠান। বিবাহরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা দুইটি নরনারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করে।

সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠানের পার্থক্য

কিন্তু সঙ্ঘ ব্যতীত অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতে পারে না, যেমন—বিবাহরূপ অনুষ্ঠান সংঘটিত হইবার জন্য প্রয়োজন হয় পরিবারের ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের। শিক্ষারূপ অনুষ্ঠান সাধিত হয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, যেমন—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। কাজেই সঙ্ঘের মাধ্যমেই অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। এইজন্য সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠানকে পৃথক করা যায়। সঙ্ঘমাত্রেরই বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান আছে।

সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠানের সম্পর্ক

সমাজ কিন্তু এই-সকল সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র নহে, তাহা অপেক্ষাও অনেক ব্যাপক।

৮। বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (Various types of Social Institutions) :

সমাজে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন, কর্মপদ্ধতিও বিভিন্ন।

উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি অনুসারে ম্যাকেঞ্জি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন :

(ক) **গঠনমূলক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (Formative Institutions) :** পরিবারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই-জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যায়। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য শিশুদের শারীরিক ও মানসিক গঠনে সহায়তা করা, তাহাদিগকে বৃহত্তর পরিবেশের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা।

ইহারা জীবন গঠন করে

(খ) **অর্থনৈতিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (Economic Institutions) :** জীবন-গঠন অপেক্ষা জীবন-রক্ষাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহারা আমাদের জীবনের উদ্ভিদবৎ বা বর্ধনশীল দিকের (Vegetative needs) উপর বেশী প্রাধান্য দেয়। মানুষের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় ইত্যাদির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অবশ্য প্রয়োজন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের। শিল্প ও বাণিজ্য আমাদের আরও অনেকপ্রকার প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। কারখানা, বাজার, বন্দর, পোতাশ্রয় ইত্যাদিকে এই-জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে।

ইহারা জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করে

(গ) বর্বর অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (Barbaric Institutions) ঃ

যে-সকল প্রতিষ্ঠান আমাদের জৈবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করে, তাহাদিগকে বর্বর প্রতিষ্ঠান বলা হয়। মানুষের অধিকাংশ কাজের মধ্যে জৈবিক আবেগ তৃপ্ত হয়। ম্যাকেঞ্জি বলেন, ভালবাসা ও দ্বন্দ্ব মানুষের প্রধান জীব-বৃত্তি। খেলাধূলা, শিল্পকলা ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়া মানুষের জৈবিক বৃত্তির প্রাধান্য দেখা যায়। শিশুর খেলাধুলা হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধ পর্যন্ত সর্বত্রই ভালবাসা ও দ্বন্দ্ব—এই দুই প্রবৃত্তির খেলা চলিতে থাকে। সুতরাং ইহাদিগকে বর্বর প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে।

ইহারা জৈবিক প্রয়োজনসাধন করে

(ঘ) সরকারী অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (Government Institutions) ঃ

এপর্যন্ত যে-সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের সংযত ও সুশৃঙ্খলিত না করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। ফলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হইবে। মানুষ যেহেতু বিচার-বুদ্ধিশীল জীব, সেইহেতু কেবল জৈবিক বৃত্তির চরিতার্থতার দ্বারা বা দৈহিক প্রয়োজন মিটাইয়া মানুষ সন্তুষ্ট হইতে পারে না। মানুষ চায় উন্নত, সংহত জীবনযাপন করিতে। সেইজন্যই সকল সমাজেই রাষ্ট্র এই-সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। রাষ্ট্রের নেতা বা নির্বাচিত শাসকবৃন্দ আপন রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করেন, আইন প্রণয়ন করেন, বিবাদ-বিসংবাদের বিচার করেন। এইভাবে রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়। রাষ্ট্রের আইন সকলে মানিতে বাধ্য, না মানিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিতে পারে। এইজন্য সামরিক শক্তির প্রয়োজন রাষ্ট্রের পক্ষে খুব বেশী।

ইহারা জীবনকে শান্তি ও শৃঙ্খলাময় করে

(ঙ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (Cultural Institutions) ঃ

বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের দ্বারাই মানুষ চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য পূর্ণতা-প্রাপ্তি, সুতরাং কেবল দৈহিক ও জৈবিক

প্রয়োজন মিটাইয়াই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার প্রয়োজন এমন সব প্রতিষ্ঠানের, যাহারা তাহাকে জ্ঞানের আলো দান করিবে, তাহার বিচার-বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন করিবে, তাহার চরিত্র-গঠনে সাহায্য করিবে, যাহাতে সে তাহার জীবনের চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। খেলাধুলার প্রবৃত্তিকে বিভিন্ন কলার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিবার দিকে মোড় ঘুরাইয়া দিলে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি জাগ্রত হয়, চিন্তাশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। Scientific Society, Artistic Group ইত্যাদিকে এইজন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ইহারা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন করে। ইহাদের গভীর উদ্দেশ্য সমাজে ঐক্য স্থাপন করা, বিভেদ দূর করা এবং আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

ইহাদের উদ্দেশ্য বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন করা ও ঐক্য স্থাপন করা

সমাজের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠানঃ ইহা ছাড়াও সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া ও এই-সকল সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, যথা— (১) যৌন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে; (২) এই সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে, কারণ, বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠান পরিবার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; (৩) জনসমাজ বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান, যেমন— রাষ্ট্র সংগঠিত হইয়াছে, (৪) ধর্মীয় বিশ্বাস, যাহার প্রভাব সমাজের উপর অসীম, তাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য গীর্জা বা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব

সুতরাং সমাজের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান হইল পরিবার, রাষ্ট্র ও গীর্জা বা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান।

৯। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interaction of Institutions)ঃ

ম্যাকেঞ্জি বলিয়াছেন, আমরা যতই বলি না কেন, মানুষ এখনও বিচার-বুদ্ধিশীল জীব হইতে পারে নাই, বরং আমাদের বলা উচিত— মানুষ এমন এক জীব, যাহারা বিচার-বুদ্ধিশীল হইতে চেষ্টা করিতেছে। তাহা না হইলে মানুষে-মানুষে, প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে এত বিরোধিতা আমরা

দেখিতে পাই কেন? এই বিরোধিতার প্রধান কারণ মানুষ এখনও প্রকৃত বিচার-বুদ্ধিশীল হইতে পারে নাই বলিয়া জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে পারিতেছে না। এইজন্য ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নীতিবোধের কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। জীবনের সকল দিকের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে পারিলেই প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে বিরোধ দূরীভূত হইবে, উচ্চতর জীবনযাপন করা সম্ভব হইবে। বিচ্ছিন্ন দিকগুলির সমন্বয়-সাধনের চেষ্টার পরিণতিই হইতেছে সভ্যতা বা civilisation। এই সভ্যতার বিকাশ গ্রাম অপেক্ষা শহরেই বেশী দেখা যায়। কিন্তু শহরের জীবন নানা কারণে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে বলিয়া রুশো শহর অপেক্ষা সরলতর স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা বলিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে পারিলেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হইবে

কিন্তু রুশোকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, বর্তমান সভ্যতার ত্রুটিগুলি দূর করিতে হইলে আরও উচ্চস্তরের সভ্যতার প্রয়োজন।

পরিবার (The Family)

১। পরিবার কাহাকে বলে ? (Meaning of the Family) ঃ সমাজে যতগুলি অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান আছে, পরিবার তাহাদের অন্যতম। কারণ, সমাজের সূত্রপাত হয় পরিবারের দ্বারা। "The family may be defined as a Social Group consisting of one or more men living normally in the same habitation with one or more women or children that have resulted or appear to be connceted with the marital union".

পরিবারেব সংজ্ঞা

পরিবার হইল এমন একটি স্বীকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে এক বা একাধিক পুরুষ এক বা একাধিক স্ত্রীলোকের সহিত একই বাসস্থানে দাম্পত্য-সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া সন্তানাদির সহিত বসবাস করে—যে-সন্তানাদি দাম্পত্য-সম্পর্কের ফলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা দাম্পত্য-সম্পর্কের সহিত কোন-না-কোন প্রকারে সম্পর্কিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ যখন কোন পুরুষ ও নারী একসঙ্গে একই বাসস্থানে বিবাহিত জীবন-যাপন করে, তখনই পরিবারের সূত্রপাত হয়। কোন কোন দেশে একই পরিবারের মধ্যে স্বামীর মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতিও থাকে। আবার, কোন কোন সমাজে ভৃত্যেরাও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

ইংরাজী 'Family' শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে রোমান 'famulus' কথা হইতে, যাহার অর্থ 'গৃহের ভৃত্য' আর 'familia' কথার অর্থ 'ভৃত্যের সমষ্টি', যাহারা একই গৃহে কাজ করে। সুতরাং 'family' বলিতে তাহারা ভৃত্যের সমষ্টিকেই বুঝাইত। পরে এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়া family বলিতে

'family'র ব্যুৎপত্তিগত ও আধুনিক অর্থ

কেবল ভৃত্যদের বুঝাইত না, সেই সংসারে যাহারা বাস করিত, তাহাদের সকলকে গৃহকর্তার সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হইত। আধুনিক কালে পরিবার বলিতে ভৃত্যদের আমরা তাহার মধ্যে গণ্য করি না এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিকেও গৃহকর্তার সম্পত্তি বলিয়া মনে করি না। এইভাবে পারিবারিক গঠনের ও পরিবারের ধারণার নানারূপ পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের মূলভিত্তি যাহা, তাহা অপরিবর্তনীয়ই আছে। স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতির সকলের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক পারিবারিক জীবনের ভিত্তি।

ম্যাকাইভার পরিবার বলিতে এমন একটি দলকে বুঝাইয়াছেন, যাহারা সন্তানের জন্ম ও লালন-পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী যৌন সম্পর্কের দ্বারা সম্পর্কিত হয়।[১] সুতরাং পরিবারের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা চাই, যেমন—(১) যৌন সম্পর্ক (mating relationship), (২) বিবাহ-অনুষ্ঠান (a form of marriage), যাহা দ্বারা যৌন সম্পর্ক সমাজে স্বীকৃতি বা অনুমোদন লাভ করে, (৩) নাম-করণের ব্যবস্থা অথবা বংশগণনার পদ্ধতি (a system of nomenclature involving also a mode of reckoning descent), (৪) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (some economic provision), যাহা সন্তানাদির লালন-পালনের জন্য একান্ত প্রয়োজন, (৫) একটি বাসগৃহ (a common habitation), যেখানে পরিবারস্থ সকলেই একত্র বাস করিবে।

পরিবারের বিভিন্ন উপাদান

দেশ-কাল অনুসারে এইসকল গুণ নানা আকার ধারণ করিতে পারে যেমন, যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে কোন কোন সমাজে এক-বিবাহ, কোথাও বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নানা দেশে নানা প্রকারের। বংশ-গণনার পদ্ধতি কোন দেশে পিতৃবংশ অনুসারে হইয়া থাকে ; কোন কোন দেশে হইয়া থাকে মাতৃবংশ অনুসারে। বাসস্থান সম্পর্কে কোন দেশে নিয়ম আছে যে, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর ঘরে বাস করিবে, আবার কোন দেশের নিয়ম—স্বামী স্ত্রীর বাড়ীতে বসবাস করিবে এবং মায়ের বংশানুসারে সন্তানের বংশ গণনা করা হইবে। এইভাবে নানা দেশের নানা ব্যবস্থা হইলেও পরিবারের প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বত্রই বিদ্যমান।

দেশকাল অনুসারে পরিবারের বিভিন্নতা

২। পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (Distinctive Feature of the Family) :

পরিবারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হইতেছে :

(ক) বিশ্বজনীনত্ব (Universality) : পৃথিবীর সর্বদেশে ও সর্ব-কালে পরিবার বর্তমান ছিল এবং আছে। সুতরাং পরিবার একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান।

১। "The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children."—Maciver

(খ) **উভয়সম্পর্কবিশিষ্ট** (Bilateral): জৈবিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সকল সম্প্রদায়ের ভিত্তি হইল পরিবার—স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানাদি। পরিবার আবার দুইদিক-বিশিষ্ট হইতে বাধ্য—মাতার দিক ও পিতার দিক। মাতা ও পিতা উভয়েরই সন্তানাদির প্রতি সমান কর্তব্য রহিয়াছে, সন্তানেরাও মাতা ও পিতা উভয় দিক হইতে উত্তরাধিকার লাভ করিয়া থাকে।

(গ) **আবেগময় ভিত্তি** (Emotional Basis): দৈহিক প্রবৃত্তি ও মানসিক আবেগ—ইহারাই হইল পরিবারের ভিত্তি। যৌন আবেগ নর-নারীকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করে। তাহা হইতে প্রেম, ভালবাসা, সন্তানের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি জাগে। এই-সকল আবেগের ফলে পবিবারের উদ্ভব হয়।

(ঘ) **গঠনমূলক প্রভাব** (Formative influence): মানুষের জীবনের উপর পরিবারের প্রভাব অসীম। পরিবারের মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করি, পরিবারের মধ্যেই শৈশব ও কৈশোরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করি। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের মধ্যেই শুরু হয়। পরিবারেব প্রভাব এড়ানো সারাজীবনেও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের চারিত্রিক গঠন, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি পরিবারের উপর নির্ভর করে।

(ঙ) **সীমিত আকার** (Limited Size): সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পরিবার ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী। কারণ, মাতাপিতা, ভ্রাতাভগিনী ইত্যাদি নিকটতম আত্মীয়দের লইয়াই পরিবার গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং পরিবারের আকৃতি সীমাবদ্ধ।

(চ) **সামাজিক গঠনের মূলকেন্দ্র** (Nuclear position in the social structure): পরিবার সমাজের কেন্দ্রস্থল। কতকগুলি পরিবারের সমষ্টির দ্বারাই সমাজ গড়িয়া উঠে। এইজন্য পরিবারকে সমাজের মূলকেন্দ্র বলা যায়।

(ছ) **পরিবারের ব্যক্তিদের দায়িত্ব** (Responsibility of the members of the family): পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কর্তব্য পালন করিতে হয়। পরিবারের প্রতি সকলেরই একটা দায়িত্ব রহিয়াছে। (১) মানুষ প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য যুদ্ধ করে, বহু স্বার্থ বিসর্জন দেয়, এমন কি, মৃত্যুবরণও করে; কিন্তু পরিবারের জন্য সারাজীবন ধরিয়া তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়। (২) গৃহ-কর্তাকে পরিবারের সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন

করিতে হয়। এই দায়িত্ব হইতে তাহার অব্যাহতি নাই। নিজের সুখ-সুবিধার কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে অন্যান্য ব্যক্তির সুখ-সুবিধার কথা, ভরণ-পোষণের কথা চিন্তা করিতে হয়। (৩) গৃহকর্ত্রীকেও অবিশ্রাম অপরের কথা চিন্তা করিতে হয়, তাহাদের সেবা করিতে হয়। (৪) সন্তানাদিরও পরিবারের উপর যথেষ্ট কর্তব্য থাকে। এক কথায়, সকলকেই সকলের জন্য চিন্তা করিতে হয়। তবে তাহারা এই কাজকে কেবল কর্তব্য বলিয়া মনে করে না, অত্যন্ত আনন্দের সহিত পরস্পরের সেবা করিয়া থাকে।

(জ) সামাজিক বিধিনিয়ম (Social Regulations): পরিবার সামাজিক বিধিনিষেধের অধীন। সামাজিক বিধিগুলি সকল পরিবারকেই পালন করিতে হয়।

বিবাহ-সম্পর্কীয় ব্যাপারে পরিবারকে সামাজিক নিয়ম মানিতেই হয়, স্ত্রী-পুরুষ নিজেরা ইচ্ছামত কিছু করিতে পারে না। যদিও নানাদেশের বিবাহপ্রথা নানা প্রকারের, তবুও যে দেশের যে-পদ্ধতি, তাহা সেই দেশের লোকদের মানিতেই হয়।

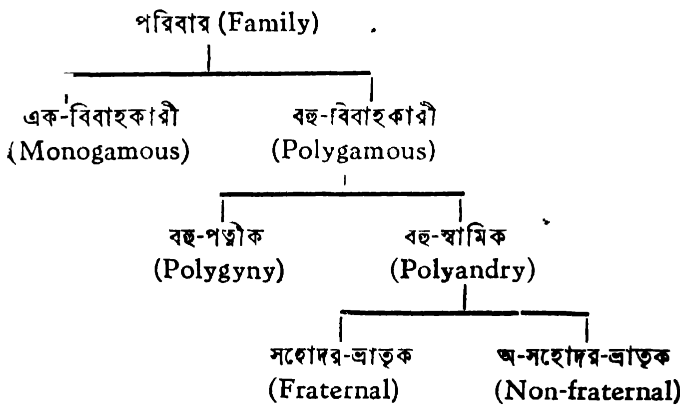
আধুনিক যুগে অবশ্য দেখা যায়, সামাজিক বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নারীরা স্বাধীনভাবে বিবাহ করে, কিন্তু সেই বিবাহও সমাজ-অনুমোদিত নূতন এক পদ্ধতির বিবাহ। সুতরাং সমাজের নিয়মকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। বিবাহ-বিচ্ছেদের বেলাযও স্বামী-স্ত্রী স্বাধীন নহে, সমাজের অধীন। তাহাদের উভয়ের সম্মতি থাকিলেও সমাজ-অনুমোদিত পদ্ধতি ব্যতীত তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইতে পারে না।

(ঝ) পরিবারের স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব (Its permanent and temporary nature): সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার স্থায়ী ও বিশ্বজনীন হইলেও অস্থায়িত্ব ইহার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তির সমস্ত জীবন ধরিয়া পরিবার এক অবস্থায় থাকে না। (১) সাধারণতঃ ব্যক্তি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, বিবাহ করে, তখনই পরিবারের শুরু হয়। (২) সন্তানাদির জন্ম ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তাও সর্বদা একরূপ থাকে না। (৩) সন্তানেরা যতদিন পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে, ততদিন পরিবার খুব সুসংবদ্ধ থাকে। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, মাতাপিতার উপর আকর্ষণ কমিয়া আসে, তাহারা

আরও বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠীর সভ্য হয়। (৪) লেখাপড়া বা চাকরির জন্য পরিবার হইতে অনেক সময় তাহাদিগকে দূরে অবস্থান করিতে হয়। (৫) আবার, তাহাদের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পরিবারের ভাঙ্গন ধরে, আবার নূতন নূতন পরিবারের উদ্ভব হয়। পারিবারিক সম্পর্ক তখন বিপরীত আকার ধারণ করে, বৃদ্ধ পিতামাতা তখন সন্তানের উপর নির্ভরশীল হন। (৬) আবার বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে পরিবারে স্থায়িত্ব অনেক শিথিল হইয়া আসে। (৭) বন্ধ্যাত্বও পরিবারের স্থায়িত্ব নষ্ট করে। বিবাহের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ না করিলে অনেক সময় পরিবারে ভাঙ্গন ধরে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ও দেখা দেয়।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, যদিও পরিবার সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, তবু সমাজের উপর ইহার প্রভাব অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশী।

৩। পরিবারের শ্রেণী-বিভাগ (Types of family)ঃ যদিও পরিবার বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ সকল সমাজে সকল কালে পরিবার বর্তমান ছিল, আছে এবং থাকিবেও, তবুও পরিবারের গঠন সর্বত্র একরূপ নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিবার দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্নপ্রকার পরিবারের একটি তালিকা দেওয়া হইল।ঃ



(ক) যৌন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া পরিবারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ যথা—এক-বিবাহকারী ও বহু-বিবাহকারী।

এক-বিবাহকারী পরিবারে একজন স্বামী ও একজন স্ত্রী সারাজীবন ধরিয়া একত্র বাস করে। বহু-বিবাহকারী পরিবার আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—বহু-পত্নীক ও বহু-স্বামিক। যখন একজন স্বামী বহু স্ত্রী লইয়া সংসার করে, তখন সেই পরিবারকে বহু-পত্নীক পরিবার বলে, আর একজন স্ত্রী যখন বহু স্বামীর সহিত ঘর করে, তখন সেই পরিবার হয় বহু-স্বামিক পরিবার।

এক-বিবাহকারী ও বহু-বিবাহকারী পরিবার

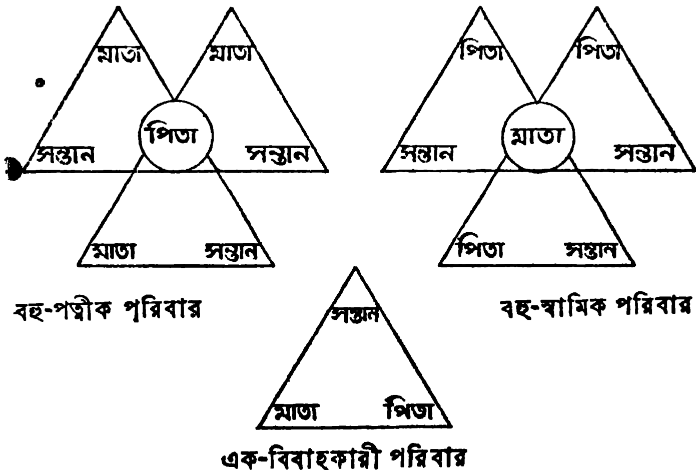
বহু-পত্নীক পরিবারে সকল পত্নী স্বামীর সঙ্গে একই বাসস্থানে বাস করিতেও পারে, আবার পৃথকভাবে অবস্থান করিতেও পারে। পত্নীরা যদি পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করে, তবে প্রত্যেক পত্নী একটি পৃথক পরিবারের সৃষ্টি করে এবং একজন পিতাই এই-সকল পরিবারের কেন্দ্রস্বরূপ হন।

বহু পত্নীক পরিবার

বহু-স্বামিক পরিবারে একজন স্ত্রী যদি তাহার সকল স্বামীর সঙ্গে একই বাসস্থানে অবস্থান করে, তবে একটি পরিবারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি স্বামীরা পৃথক পৃথক বাসস্থানে অবস্থান করে, তবে স্ত্রী তাহার নিজের বাড়ীতেই বাস করে এবং তাহার স্বামীরা পৃথক পৃথক সময়ে তাহার সহিত বসবাস করে। বহু-স্বামিক পরিবারে মাতাই বিভিন্ন পরিবারের কেন্দ্রস্বরূপ হন এবং সন্তানেরা মাতার সহিত বসবাস করে এবং মাতার বংশ অনুসারে সন্তানদের বংশ গণনা করা হইয়া থাকে।

বহু স্বামিক পরিবার

নিম্নে এক-বিবাহকারী, বহু-পত্নীক ও বহু-স্বামিক পরিবারের বিভিন্নতা একটি নকশার সাহায্যে দেখানো হইল:



এইখানে প্রত্যেকটি ত্রিকোণ এক-একটি পৃথক পরিবারকে বুঝাইতেছে। পত্নীরা যদি পৃথক বাসস্থানে অবস্থান করে, বহুপত্নীক পরিবারে পিতাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন পরিবারের সৃষ্টি হয়, আর বহু-স্বামিক পরিবারে স্বামীরা যদি পৃথকভাবে অবস্থান করে, তবে মাতাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন পরিবারের সৃষ্টি হয়।

বহু-স্বামিক পরিবার সহোদর-ভ্রাতৃক ও অ সহোদর ভ্রাতৃক

বহু-স্বামিক পরিবার আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—সহোদর-ভ্রাতৃক ও অ-সহোদর-ভ্রাতৃক। স্বামীরা যদি সকলে সহোদর ভ্রাতা হয়, তবে সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবার হয়। আর স্বামীদের মধ্যে যদি কোনরূপ রক্ত-সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে অ-সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবার হয়। মহাভারতে বর্ণিত দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহকে সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবারের একটি উদাহরণ বলা যাইতে পারে। বর্তমানে সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবার তিব্বত, সিকিম, লাদাক, হিমালয়ের পাদদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আর, দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতের 'তুদা'দের মধ্যেও এইরূপ পরিবার দেখা যায়। অ-সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবার এক সময়ে মালাবার-অঞ্চলের নায়রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

একই সমাজে বহু পত্নীক ও বহু স্বামিক পরিবার

একই সমাজ আবার একাধিক প্রকারের পরিবারকে অনুমোদন করিতে পারে। তিব্বতে দরিদ্রদের মধ্যে বহু-স্বামিক পরিবার-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকেরা এক-বিবাহ-কারী পরিবার পছন্দ করে। আর, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় বহু-পত্নীক পরিবারকে প্রাধান্য দেয়। 'তুদা' জাতিদের মধ্যে একরূপ অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত আছে। পূর্বে তাহাদের মধ্যে শৈশবে কন্যা-সন্তানকে হত্যা করিবার নিয়ম প্রচলিত থাকায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম হওয়ায় সহোদর-ভ্রাতৃক বহু-স্বামিক পরিবার-প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে শৈশবে কন্যা সন্তানকে হত্যা করিবার নিয়ম উঠিয়া যাওয়ায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য তাহাদের সমাজে বহু-স্বামিক ও বহু-পত্নীক উভয় প্রথাই একই সঙ্গে প্রচলিত আছে। সমগ্র জগতে এইরূপ নিয়ম আর কোথাও নাই।

(খ) স্বামী বা স্ত্রী-নির্বাচনের পদ্ধতি দ্বারাও পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কোন কোন সমাজে নিজস্ব সমাজ বা দল বা

গোষ্ঠী হইতে স্বামী বা স্ত্রী-নির্বাচনের প্রথাকে আন্তর গোষ্ঠী বিবাহ বা endogamy বলা হয়। আবার কোথাও নিয়ম আছে, অন্য দল বা সমাজ হইতে স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচন করিতে হয়। এই প্রথাকে বহির্গোষ্ঠী বিবাহ বা exogamy বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত থাকায় কেবল স্বজাতির মধ্যেই বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং জাতিভেদ-প্রথা endogamyকে প্রাধান্য দেয় বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু আমাদের পরিবারের নিয়ম অন্যরূপ। পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিকে বা রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কিত কোন আত্মীয়কে বা সগোত্রে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। বিবাহ করিতে হইলে ভিন্ন গোত্রে অন্য পরিবারের মধ্য হইতে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করিতে হইবে। সুতরাং, পরিবার ও গোত্র exogamyকে প্রাধান্য দেয়। তবে উভয় নিয়মের মধ্যে সমাজে কোন বিরোধ দেখা দেয় না। স্বজাতির অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(গ) বংশগণনার পদ্ধতি অনুসারে পরিবার দুই প্রকারের হইতে পারে: পিতৃবংশ অনুসারে বংশ গণনা করা হইলে তাহাকে বলা হয় 'পিতৃবংশানুক্রমিক' বা 'patrilineal' পরিবার, আর মাতৃবংশ অনুসারে বংশ গণনা করা হইলে বলা হয় 'মাতৃবংশানুক্রমিক' বা 'matrilineal' পরিবার। উভয়প্রকার নিয়মই বহু সমাজে প্রচলিত আছে। আমাদের পরিবার পিতৃবংশানুক্রমিক। কারণ, পিতার বংশ অনুসারে পুত্রের বংশ গণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসিয়াদের পরিবারে মাতার বংশ অনুসারে বংশ গণনা করা হইয়া থাকে।

(ঘ) বাসস্থানের উপর ভিত্তি করিয়া পরিবার দুই প্রকারের হইতে পারে: কোন কোন সমাজে বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে। ইহাকে 'পিতৃবাসস্থানিক' বা 'patrilocal' পরিবার বলা হয়। আবার কোথাও স্বামী বিবাহের পরে স্ত্রীর মাতার গৃহে বাস করে। এই প্রথাকে 'মাতৃবাসস্থানিক' বা 'matrilocal' বলা হয়। আমাদের সমাজে স্ত্রী বিবাহের পরে স্বামীর গৃহে বসবাস করে এবং স্বামীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু খাসিয়াদের মধ্যে স্বামী বিবাহের পরে স্ত্রীর মাতার গৃহে বাস করে ও সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ঙ) **কর্তৃত্ব অনুসারে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ** যে-পরিবারে কর্তৃত্ব পিতার হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাহাকে 'পিতৃকর্তৃক' বা 'patriarchal' অথবা father-right পরিবার বলা হয়। আর পরিবারের কর্তৃত্ব যদি মাতার হস্তে থাকে, তাহাকে 'মাতৃকর্তৃক' বা 'matriarchal' অথবা mother-right পরিবার বলা হয়। আমাদের পরিবারে কর্তৃত্ব পিতার হস্তে থাকে, আর খাসিয়াদের মধ্যে কর্তৃত্ব থাকে মাতার হস্তে। কাহারও কাহারও মতে আদিম পরিবার 'matriarchal' ছিল, 'patriarchal' পরিবারের উদ্ভব পরে হইয়াছে।*

(চ) **সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়াও পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ** যথা—একক (elementary বা single) ও যৌথ (joint) পরিবার। একক পরিবারে অবস্থান করে কেবল একজন স্বামী, একজন স্ত্রী ও তাহাদের নাবালক পুত্রকন্যারা। আর যৌথ পরিবারের পিতৃবংশ হইতে উদ্ভূত সকল পুত্র, তাহাদের পত্নীগণ ও সকল অবিবাহিত কন্যারা সকলে একই বাসস্থানে অবস্থান করে। বিবাহিত কন্যারা একক বা যৌথ কোন পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কিন্তু অন্য পরিবার হইতে বিবাহ-সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া আগত বধূরা যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। হিন্দুদের

যৌথ পরিবার

---

* 1. Monogamy—It is the marriage of one man with one woman.
2. Polygamy—A generic term inclnding polygyny and polyandry.
3. Polygyny—It is a union of one man with two or more women.
4. Polyandry—It it a union of one woman with two or more men.
5. Endogamy—"A set of rules forbidding the members of a particular group to marry anyone who is not a member of that group."
6. Exogamy—"A set of rules by which members of a particular group are forbidden to marry anyone who is a member of that group."
7. Patrilineal—Descent reckoned through the father.
8. Matrilineal—Descent reckoned through the mother.
9. Matrilocal—A marriage in which the husband lives with the group of his wife.
10. Patrilocal—A marriage in which the wife lives with the husband's group.
11. Patriarchal or matriarchal or father-right or mother-right families are very often made to correspond to Patrilineal and Matrilineal systems. But they convey misleading implications regarding the power and states of woman.

যৌথ পরিবারে কর্তা ও গৃহিণী এবং তাহাদের বংশোদ্ভূত পুত্র, পুত্রবধূ, অবিবাহিত কন্যা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূরা ও তাহাদের সন্তানগণ সকলে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বসবাস করে। হিন্দু-সমাজে পূর্বে যৌথ পরিবারের প্রচলনই বেশী ছিল। প্রকৃতপক্ষে যৌথ পরিবার একটি 'property owning corporation'।

যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য: (১) যৌথ পরিবারে সকলেরই পারিবারিক সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বামিত্ব থাকে। (২) সকলেই একই কার্যের বা ব্যবসায়ের অংশীদার হয়। (৩) একজন কর্তা বা গৃহস্বামী থাকেন, পারিবারিক সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাঁহার অনেক ক্ষমতাও থাকে যেমন—(ক) কোন জিনিস বিক্রয় করিবার, বন্ধক রাখিবার, প্রয়োজন বোধ করিলে দান করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি, (খ) পরিবারের সকলের উপর তিনি কর্তৃত্ব করিতে পারেন, (গ) ইচ্ছা করিলে পুত্রকে পরিবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন, (ঘ) পুত্রের সহিত আলোচনা না করিয়াই তিনি সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে পারেন, (ঙ) সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি সমস্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন।

যৌথ পরিবারের সুবিধা: যৌথ পরিবারের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে: (১) ইহাতে সমস্ত পরিবার সুসংবদ্ধ হয়। (২) পরিবারে নিয়ম-শৃঙ্খলা আরও সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়। (৩) গৃহস্বামী বা কর্তার প্রতি সকলের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পরিবারের সকলকে নম্র ও বিনয়ী হইতে সাহায্য করে। (৪) যৌথ পরিবার সকলের মধ্যে একতার ভাব আনে। (৫) সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকাতে পরিবার অধিকতর শক্তিশালী হয়। (৬) পরিবারের বেকার ব্যক্তিদের জন্যও যৌথ পরিবার সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে।

যৌথ পরিবারের অসুবিধা: কিন্তু এত সুবিধা বা গুণ থাকা সত্ত্বেও যৌথ পরিবারের কতকগুলি অসুবিধা বা দোষ আছে। (১) যৌথ পরিবার মানুষকে উপার্জন বাড়াইবার প্রেরণা দেয় না। কারণ, উপার্জন বৃদ্ধি পাইলেও তাহার সুবিধা কেবল সে একা ভোগ করিতে পারে না। তাহার আয় যৌথ পরিবারের সকলের জন্যই ব্যয় হয়, আর সকলেই তাহার অংশীদার হয়। (২) বেকারদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকায় তাহারা অনেক সময় উপার্জনের চেষ্টা ত্যাগ করে এবং নিশ্চিন্ত আলস্যে দিনপাত

করে। (৩) যৌথ পরিবারে গৃহস্বামীর অপরিসীম কর্তৃত্বে অন্যান্য ব্যক্তি বা শিশুদের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় না। (৪) পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে কলহ লাগিয়াই থাকে। (৫) ফলে পরিবারে ভাঙ্গন ধরে ও তাহারা বিভক্ত হইয়া যায়। (৬) সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব লইয়া মামলা-মোকদ্দমায় পরিবারের ব্যক্তিরা বিব্রত হইয়া উঠে।

যৌথ পরিবারের উচ্ছেদের কারণ: যৌথ পরিবার ধীরে ধীরে সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমাদের সমাজে, বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলে, যৌথ পরিবার এখন আর নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ: (১) পূর্বে অধিকাংশ পরিবারই কৃষিজীবী ছিল। বর্তমান শিল্প-প্রসারের যুগে অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করিয়া শহরে বসবাস করে। ফলে যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। (২) শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকুরি বা অন্য প্রকারে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় পরিবার হইতে দূরে অবস্থান করাও যৌথ পরিবারের উচ্ছেদের অপর একটি কারণ। (৩) আধুনিক যুবকদের মধ্যে স্বার্থপরতার ভাব প্রবল হওয়ায় তাহারা আর যৌথ পরিবারে বাস করিতে চায় না। (৪) প্রাচীন একতার ভাব নষ্ট হইয়া এখন স্বতন্ত্রভাবের প্রাবল্য হইয়াছে। (৫) আধুনিক কালে জীবন-যাত্রার মান উন্নত হওয়া ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়াও যৌথ পবিবারের লুপ্ত হইয়া যাইবাব অন্যতম কারণ। (৬) যাতায়াত-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা-বৃদ্ধিব ফলে লোক বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাও পারিবারিক ঐক্য নষ্ট হইতে সাহায্য করিয়াছে। (৭) স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের ফলেও পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে; কারণ, (ক) স্ত্রী পছন্দ করে না যে, তাহার স্বামীর আয় অন্যান্য ব্যক্তিব ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয়িত হইবে; (খ) প্রাচীন কালের মত আধুনিক স্ত্রীলোকদেব মধ্যে ঐক্যভাব নাই; (গ) তাহারা শাশুড়ীর কর্তৃত্বাধীন থাকিতে চাহে না; (ঘ) স্বামী ও ছেলেমেয়ের সহিত পৃথক বাসস্থানে স্বাধীনভাবে অবস্থান কবিতে পছন্দ করে।

এই-সকল কারণবশতঃ যৌথ পবিবার আমাদের দেশের সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

৪। **পরিবারের উৎপত্তি (Origin of the Family):** পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন।

(১) মর্গ্যানই সর্বপ্রথম পারিবারিক বিবর্তনের সম্পূর্ণ ধারা প্রচার করেন। তাহার মতে আদিম যুগের সমাজে পরিবার বলিয়া কিছু ছিল না। তখন স্ত্রী ও পুরুষেরা বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবন যাপন করিত না। আদিম যুগে মানবসমাজে পশুর মত অনিয়মিত যৌন সম্পর্ক বর্তমান ছিল। যে-কোন পুরুষ যে-কোন স্ত্রীলোকের সহিত যৌন আবেগ চরিতার্থ করিত, বিবাহরূপ কোন অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহারা পরস্পর মিলিত হইত না। তাহার মতে সেই অনিয়মিত যৌনসম্পর্ক হইতে বিবর্তন-প্রক্রিযার ফলে পরিবারের উদ্ভব হইযাছে ও নানা বিবর্তনের মধ্য দিযা সেই অবস্থা হইতে আধুনিক এক-বিবাহকারী পরিবারের সৃষ্টি হইযাছে। তিনি পারিবারিক বিবর্তনের তিনটি স্তর দেখাইযাছেন: (ক) সগোত্রতা (Consanguinity) বা যাহাদের সহিত রক্ত-সম্পর্ক আছে, তাহাদের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন, (খ) ভিন্নগোত্রতা (Punaluan) বা যাহাদের সহিত রক্ত-সম্পর্ক নাই, তাহাদের সহিত যৌন সম্পর্ক-স্থাপন। (গ) সর্বশেষে সামাজিক বিবর্তনের ফলে একক বিবাহ সম্পর্ক (Monogamian) বা কেবল একজনের সহিত যৌন সম্পর্ক-স্থাপনের রীতি প্রচলন। (২) মর্গ্যানের মত অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, কিছুটা উন্নত হইবার পরে মানুষ যৌন আবেগ চরিতার্থ করিবার জন্য পারিবারিক জীবনের প্রযোজনীয়তা অনুভব করিল। এইজন্য তাঁহারা মনে করেন, বিবাহ কেবল যৌন ক্ষুধা তৃপ্ত করিবার জন্য একটা কৃত্রিম সামাজিক চুক্তি। সুতরাং মানব-প্রকৃতির সহিত পরিবারের কোন গভীর সম্পর্ক নাই, পারিবারিক জীবন মানুষের পক্ষে খুব স্বাভাবিক জীবন নয়।

মর্গ্যানের মতবাদ

পারিবারিক বিবর্তনের তিনটি স্তর

বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি

মর্গ্যানের মতের সমালোচনা ও পরিবারের উৎপত্তি: আধুনিক যুগে এই মতবাদ আর গ্রহণ করা যায় না।

কারণ: (১) আদিম সমাজে পরিবার ছিল না—এই মতবাদ কোন প্রকৃত প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। এই সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও নাই। মানুষ যে পূর্বে পাশবিক জীবনযাপন করিত, পারিবারিক জীবনযাপন করিত না, তাহার কোন প্রমাণ কোন সমাজেই পাওয়া যায় না। বরং আদিম

ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব

মৌলিক জাতিদের মধ্যেও (যথা—সিংহলের ভেদ্দাদের মধ্যে) একক পরিবারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

(২) নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ী জীবদিগকে, যেমন—বানর, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদিকেও, পারিবারিক জীবনযাপন করিতে দেখা যায়। সুতবাং মানুষের আদিম সমাজে পবিবার ছিল না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

(৩) ইহা ভিন্ন স্ত্রী কিংবা পুরুষ কেবল যৌন ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিবাব জন্যই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, এই মতবাদ বিশ্বাস করা যায় না। এই মতবাদ মানুষকে পশুর স্তরে নামাইয়া আনে।

(৪) মানুষের যৌন কামনার মূলে রহিয়াছে সন্তান-কামনা। সন্তান-উৎপাদনের জন্য ও সন্তানেব লালন-পালনেব জন্য বিবাহরূপ অনুষ্ঠানেব দ্বারা নর-নারী স্থায়ী সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া পারিবারিক জীবন যাপন করে।

(৫) মানুষের শিশুরা বড অসহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পিতামাতাব সেবাযত্ন ব্যতীত শৈশবকালে তাহাদেব বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। পিতামাতাই শিশুর যত্নেব ভাব সর্বান্তঃকবণে গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষ সন্তানের মধ্য দিয়া অমর হইয়া থাকিতে চায়। এইজন্যই দেখা যায়, নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; ফলে নানাপ্রকাব পারিবারিক ও মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সুতরাং সন্তানকেই পারিবাবিক জীবনেব ভিত্তিস্বরূপ বলা যায়।

সন্তানই পবিবাবেব কেন্দ্রস্বরূপ

কাজেই পারিবারিক জীবন কৃত্রিম জীবন নয়, খুবই স্বাভাবিক জীবন। সন্তান-কামনা হইতেই পরিবারের উদ্ভব, সন্তানের জন্যই দাম্পত্য জীবন যাপন করা। ইহা হইতেই মনে হয় যে, পরিবারহীন পাশবিক জীবন মানুষ কখনও যাপন করিত না।

(৬) সন্তান-কামনা ছাডাও পারিবারিক জীবনযাপনের আরও কারণ আছে। পরিবারেব সূত্রপাত হয় সন্তান-জন্মের বহু পূর্বে দুই স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে। এই মিলনের ফলে সকল ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম হয় না, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীব ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকে। সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও সন্তান বড় হইয়া যাওয়ার অনেক পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন আবেগ নষ্ট হইয়া গেলেও পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ও

যৌন আবেগ পারিবারিক জীবনের ভিত্তি নয়

সহানুভূতি বর্তমান থাকে। সুতরাং যৌন আবেগই পরিবারের উৎপত্তির একমাত্র কারণ নয়।

(৭) ইহা ছাড়া, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা না থাকিলে যৌন প্রবৃত্তি কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। এইজন্য স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও মিলনকেই পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই মিলনের ফলে সন্তানোৎপাদনের সম্ভাবনা আছে এবং মিলনের মূলে থাকে সন্তানোৎপাদনের কামনা। এইজন্য সব দিক বিবেচনা করিলে সন্তানই পারিবারিক জীবনের ভিত্তি।

পারস্পরিক ভালবাসাই পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক ভিত্তি

(৮) তাহা ছাড়াও, পারিবারিক জীবনযাপন করিবার আরও একটি কারণ আছে। মানুষ জীবনে এমন একজন সাথীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, যাহার উপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে, যে তাহাকে দুঃখের দিনে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিবে, তাহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবে, সুখের দিন যাহার সহিত একত্র হইয়া সে সম্পূর্ণ সুখভোগ করিতে পারিবে ও বৃদ্ধ বয়সে যে তাহাকে সেবাশুশ্রূষা করিবে। এক কথায়, মানুষ একাকী বাঁচিতে চায় না, অপরের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে না পারিলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহার দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তিসাধনের জন্য তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়।

দৈহিক ও মানসিক—উভয় প্রকারের তৃপ্তি সাধনই পারিবারিক জীবনযাপনের উদ্দেশ্য

(৯) সুতরাং মানুষ যখনই একজন অন্তরঙ্গ সাথীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ও সন্তান কামনা করে, তখনই পরিবারের সূত্রপাত হয়। ম্যাকাইভার পরিবারের উৎপত্তির তিনটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—(ক) যৌন আবেগ (Sex), (খ) সন্তানোৎপাদন (Reproduction) এবং (গ) অর্থনৈতিক প্রয়োজন (Economic need) অর্থাৎ ভরণপোষণের জন্য পারস্পরিক সাহচর্য। এই-সকল প্রয়োজন পারিবারিক জীবন সৃষ্টি করে। আদিম-যুগের সমাজেও এই-সকল প্রয়োজন বর্তমান ছিল। কাজেই পরিবার কোন কৃত্রিম চুক্তির ফলে সৃষ্ট হয় নাই।

ম্যাকাইভারের মত

(১০) মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি পারিবারিক সংগঠনের অন্যতম কারণ। আত্মীয়তার দ্বারাই সামাজিক ঐক্যের সূত্রপাত হয়। পিতা, মাতা ও সন্তানের

মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও মায়া-মমতাই পারিবারিক জীবন গঠন করে।

সামাজিক প্রবৃত্তি হইতে পারিবারিক জীবনের উদ্ভব

সন্তানরা পিতা অথবা মাতার কাছ হইতে বংশমর্যাদা লাভ করে। পারিবারিক জীবনযাপন না করিলে সন্তানেরা বংশমর্যাদা হইতে বঞ্চিত হয়।

সিদ্ধান্ত: বস্তুতঃ, পিতা, মাতা ও সন্তানেরা আদিমযুগেও পারিবারিক সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। সন্তানের লালন-পালন মাতাপিতার দ্বারাই সম্ভব। এমন কোন সময়ের কথা ভাবা যায় না, যখন সন্তানেরা পিতামাতার দ্বারা প্রতিপালিত হইত না, তাহারা দল বা সমাজের সম্পত্তি হইত ও দল বা সমাজের দ্বারাই প্রতিপালিত হইত। বিবাহ চিরকালই ব্যক্তিগত ব্যাপার, বারোয়ারী ব্যাপার নহে। কাজেই যখন হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, পরিবারও তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

৫। পরিবারের কার্যাবলী (Functions of the Family): পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান হইলেও সমাজের উপর ইহার প্রভাব সর্বাধিক। এইজন্য পরিবারের বিভিন্ন কার্যের আলোচনা করা সমাজদর্শনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন সিদ্ধ করা পরিবারের অন্যতম কাজ। সন্তানের জন্ম দিয়া, বংশবিস্তার করিয়া পরিবার জাতিকে বাঁচাইয়া রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক ছাড়াও একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। দুইটি আত্মার মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা না থাকিলে পারিবারিক জীবন কেবল দৈহিক মিলনের দ্বারা আনন্দময় হইতে পারে না।

(২) আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করা

সুখী পরিবার তাহারাই, যাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসা থাকে, গভীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা থাকে, যাহাদের প্রেম দৈহিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া স্বামী-স্ত্রীকে এক পবিত্র আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করে। এইরূপ পরিবারের দ্বারা পরিবার ও সমাজ উভয়েরই প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

তৃতীয়তঃ, শিশুই পরিবারের কেন্দ্রস্থল। শিশুকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া

(৩) শিশুর লালন-পালন ও গঠন

তোলাই পরিবারের সর্বপ্রধান কর্তব্য। শিশুর শিক্ষার জন্য পিতামাতার ব্যবহার সংযত, আদর্শমূলক হওয়া উচিত। কারণ, শিশুর মন অত্যন্ত অনুকরণপ্রবণ। পিতামাতার আচরণ তাহার মনে গভীর রেখাপাত করে। পিতামাতার পবিত্র

আচরণ শিশুর মনকে পবিত্র করে, উজ্জ্বল করে, তাহার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

চতুর্থতঃ, শিশুই যখন পরিবারের ভিত্তি, তখন কিভাবে সুস্থ, সবল শিশু জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা আলোচনা করা পিতামাতার একান্ত প্রয়োজন। সুস্থ, সবল শিশুর দ্বারাই পারিবারিক জীবনের তথা সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এইজন্য সুস্থ সন্তান-প্রজননের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা সমাজে অত্যধিক ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। দুর্বলেরাও চিকিৎসার গুণে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু অনেকের ধারণা—এইভাবে দুর্বল শিশুদের রক্ষা করার ফলে জাতি স্বাস্থ্যবান হইতে পারে না। এইজন্য প্রাচীনকালে শিশুদের উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইত। সুস্থ, সবল শিশুরা এইভাবে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিত, দুবলেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে বহু লোকের মূল্যবান জীবন অকালেই শেষ হইয়া যাইত। এইজন্য সুপ্রজনন-বিজ্ঞানীরা দুর্বল, বিশেষ করিয়া রুগ্ন ব্যক্তিদের বিবাহ করিতে নিষেধ করেন। কারণ, তাহাদের দ্বারা জাতির সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। আর, যাহারা সুস্থ, সবল, তাহাদের বিজ্ঞানীরা বিশেষ করিয়া উৎসাহিত করেন বিবাহ করিবার জন্য। কারণ, তাহারা সুস্থ, সবল শিশুদের জন্ম দিতে সমর্থ হইবে। তাহারা বিবাহ না করিলেই বরং সমাজের ক্ষতি। যাহা হোক, সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের এখনও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত না হইলেও বিজ্ঞানীরা এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পারিবারিক জীবন আরও সুদৃঢ় হইবে এবং সমাজও প্রভূত উপকৃত হইবে আশা করা যায়।

(৪) সুস্থ, সবল শিশুর জন্ম দেওয়া

সুপ্রজনন বিজ্ঞানের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা

পঞ্চমতঃ, পরিবারের অন্যতম প্রধান কাজ শিশুর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিশুর শিক্ষার শুরু হয় পরিবারের মধ্যেই। তাহাকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া, তাহার চলাফেরা, কথাবার্তা সংযত করা, আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা, লোকের সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পরিবারের উপর ন্যস্ত থাকে। কেবল ভালবাসিলেই শিশুকে গঠন

(৫) শিক্ষামূলক কাজ

করা যায় না। ইহার জন্য পিতামাতারও উপযুক্ত শিক্ষা থাকার প্রয়োজন। শিক্ষিত পিতামাতার সন্তান শিক্ষিত হইবে আশা করা যায়। শিশুরা স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলেই পরিবারের দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় না। শিশুর অন্তরের সদ্‌গুণগুলির বিকাশসাধন, শিশুকে সৎ আচরণ ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া, তাহাকে সৎকাজে উৎসাহিত করা, সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব প্রধানতঃ পরিবারের। এক কথায়, শিক্ষার কেন্দ্রস্থলই হইতেছে পরিবার। সুতরাং শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে পরিবারকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

(৬) অর্থ নৈতিক কাজ

ষষ্ঠতঃ, অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ, শিশুকে লালন-পালন করিবার জন্য, তাহার উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য পিতামাতার আর্থিক সচ্ছলতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য আজকাল দেখা যায় বিবাহ-ব্যাপারে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর খব গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোন কোন দেশে মাতৃত্বের জন্য সরকার অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, শিশুদের লালন পালন ও শিক্ষার জন্য আর্থিক প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের জন্য পারিবারিক ঐক্য, পিতামাতার একত্রে অবস্থান এবং শিশুদিগকে সঙ্গদান করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচীনকালে যখন পরিবারের সকলে দৈহিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা উপাজন করিত, তখন তাহাদিগের পক্ষে একই স্থানে বাস করা সম্ভব হইত। কিন্তু আধুনিক কালে পিতাকে অনেক সময় উপার্জনের জন্য পরিবার হইতে দূরে অবস্থান করিতে হয়। মাতাকেও আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উপার্জনের জন্য অধিকাংশ সময় গৃহের বাহিরে অবস্থান করিতে হয়। এই-সকল ক্ষেত্রে শিশু পিতামাতার সঙ্গ-লাভে বঞ্চিত হয়, তাহার শিক্ষা ব্যাহত হয়। কেহ কেহ আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়া শিশুদিগকেও উপার্জনের কাজে লাগাইয়া দেয়। ইহা যে শিশুর পক্ষে, পরিবারের পক্ষে, সমাজের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর, তাহা বলিয়া বুঝাইতে হয় না। সুতরাং আর্থিক সচ্ছলতা না থাকিলে পরিবার তাহার দায়িত্ব-পালনে সমর্থ হয় না। তাহার যাহা প্রধান কার্য—শিশুর শিক্ষাদান, তাহা অবহেলিত হয়। এইজন্য পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি যাহাতে সুদৃঢ় হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর

সপ্তমতঃ, পরিবার মানুষকে নানা বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন, নৈতিক অধঃপতন ইত্যাদি হইতে রক্ষা করে। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় পরিবার তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলে। এইজন্য পরিবার মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থল।

(৭) নিরাপত্তামূলক কাজ

অষ্টমতঃ, পরিবার শিশু ও বৃদ্ধদের প্রধান আরাম ও বিশ্রামস্থল। নানা প্রকার খেলাধূলা, রেডিও, গ্রামোফোন বা অতি সামান্য আয়োজনের দ্বারাও পরিবার সকলের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে।

(৮) আনন্দদায়ক কাজ

নবমতঃ, মানুষের স্নেহ, মায়া মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি পাইবার ইচ্ছা হইতে বিবাহের বাসনা জাগ্রত হয়। কারণ, সর্বাধিক স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম ইত্যাদি পরিবারের নিকট হইতেই লাভ করা সম্ভব হয়। শিশুদের গঠন করিতেও স্নেহ ভালবাসার প্রয়োজন অপরিহার্য। পরিবার স্নেহ দিয়া, ভালবাসা দিয়া, প্রয়োজন হইলে শাসন করিয়া শিশুদের দৈহিক ও মানসিক গঠনে সাহায্য করে ও সমাজের প্রভূত উপকারসাধন করে।

(৯) স্নেহ যত্ন ভালবাসা দেওয়া পরিবারের অন্যতম কাজ

৭। **পরিবারের অসুবিধা** (Weakness of the Family) : পরিবার যদিও সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান, সমাজের ভিত্তি, তবুও পরিবারের এমন কতকগুলি দুর্বলতা আছে, যাহার ফলে পরিবারের সহিত সমাজের বিরোধ দেখা দেয়। সময়ে সময়ে পরিবারের প্রভাব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরও হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শিল্প, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে পরিবারের বিরোধ দেখা দেয়।

(ক) পারিবারিক ঐক্য বা সংহতি শিল্পের উন্নতিতে বাধা দান করে। কারণ, আধুনিক শিল্পোন্নতির যুগে শিশুদের যে-কোন শিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইতে পারে। কিন্তু পরিবারের সেইরূপ শিক্ষা শিশু পায় না। প্রাচীন সমাজে শিশুরা পিতার জীবিকাই গ্রহণ করিত, সুতরাং শৈশবকাল হইতেই শিশু এমন আবহাওয়ায় বড় হইত, যাহাতে সে ভবিষ্যতের জীবিকার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত। কারণ, শৈশবকাল হইতেই তাহার জীবিকার শিক্ষা আরম্ভ হইয়া যাইত। কিন্তু আধুনিক শিল্প-প্রসারের যুগে তাহা সম্ভবও নয় এবং লোকে বিশ্বাসও করে না যে, শিশুরা কেবল

পরিবার শিল্পের উন্নতিতে বাধা প্রদান করে

তাহাদের পিতামাতার জীবিকা গ্রহণ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং শৈশবকাল হইতেই শিশুদের যে প্রস্তুতি হইত, তাহা হইতে শিশুরা বঞ্চিত হয়। আবার, অনেক ক্ষেত্রে পরিবার সন্তানকে দূরে অবস্থান করিতে দিতে চায় না বলিয়া শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পরিবারের সহিত রাষ্ট্রের বিরোধ

(খ) পরিবারের সহিত রাষ্ট্রেরও অনেক সময় বিরোধ দেখা দেয়। নাগরিকদের শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রেরও একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পরিবারের ইচ্ছার বিরোধী হইতে পারে। অনেক রাষ্ট্রপ্রধান দেশে শিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়া থাকে। কারণ, শিশু রাষ্ট্রের সম্পত্তি, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই ব্যাপারে রাষ্ট্র কেবল পিতামাতার কাছ থেকে একটা পরামর্শমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু পরিবারের উদ্দেশ্য অন্যরূপ হইতে পারে। পরিবার শিশুকে যেভাবে মানুষ করিতে চায়, তাহা অনেক সময় রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরোধী হয়। পরিবারের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিলে রাষ্ট্রের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিতে পারে। তখন পরিবারের সহিত রাষ্ট্রের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

পরিবারের সহিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিরোধ

(গ) অনেক সময় বন্ধু, সঙ্গী, সাথী, দল ইত্যাদি পারিবারিক ঐক্য নষ্ট করে। শিশুদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, বাহিরের ক্লাব, সমিতি প্রভৃতি তাহাদিগকে আকর্ষণ করে। তাহাদের প্রতি আকর্ষণ অতিরিক্ত হইলে পরিবারের সহিত বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে পরিবারের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন বিরোধ দেখা যায় না। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে যদি বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, তাহা হইলেই পরিবার ভীষণ বিরোধী হইয়া উঠে। পরিবার তাহাদের মেলামেশার পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, তাহাদের অবাধ মেলামেশার ফলে পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

পরিবারের সহিত ধর্ম, বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদির বিরোধ

(ঘ) ধর্ম, বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদির সহিতও পরিবারের বিরোধ দেখা দেয়, যথা—ধার্মিকের জীবনের আদর্শ পারিবারিক জীবনের বিরোধী। ধার্মিকেরা পরিবারের ভালমন্দের প্রতি উদাসীন থাকে, কৌমার্য অবলম্বন করে বলিয়া সন্তান উৎপাদন না করিয়া তাহারা পরিবারকে বঞ্চিত করে, উপার্জন

না করিয়াও পরিবারের অসুবিধা সৃষ্টি করে। পরিবারের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। পরিবার আপন স্বার্থ-চিন্তায় মগ্ন থাকে বলিয়া বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এইজন্য অনেকে পারিবারিক জীবন নষ্ট করিয়া দিবার পক্ষপাতী।

৮। পরিবারের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of the Family): তবে পরিবারের এই সকল দুর্বলতা আছে বলিয়া পারিবারিক জীবন নষ্ট করিয়া দেওয়া কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

(১) পরিবার মানুষের পক্ষে শান্তির নীড়। পিতামাতার স্নেহযত্ন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সাহচর্য, অনুরাগ ও সহানুভূতি মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ।

(২) পরিবারের সাধারণ দুর্বলতা থাকিলেও সেগুলি দূরীভূত করা সম্ভব হইতে পারে, যথা—পরিবার ও রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী নহে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব। সুতরাং সামান্য দুর্বলতার জন্য মানুষের শান্তির নীড়কে নষ্ট করিয়া দেওযাকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

(৩) উপরন্তু আধুনিক যুগে রাষ্ট্র পারিবারিক জীবনকে নানাভাবে সাহায্য করে: (ক) বৃদ্ধবযসে মানুষের উপার্জন ক্ষমতা নষ্ট হইযা গেলে রাষ্ট্র তাহাদের অর্থসাহায্য করে, (খ) দুঃস্থ পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করে, (গ) শিশুদের শিক্ষাব ব্যবস্থা করে, (ঘ) স্বাস্থ্যোন্নতির ও (ঙ) বাস-গৃহের বিভিন্ন পরিকল্পনার দ্বারা পরিবারকে রক্ষা করে।

যাঁহারা পরিবারের ধ্বংসসাধনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রই নাগরিকদের সকল প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম। রাষ্ট্র আপন প্রয়োজন অনুসারে নাগরিকদিগকে কাজে লাগাইবে। কিন্তু এইভাবে পরিবারকে ধ্বংস করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কোন পিতামাতা তাহাদের সন্তানকে রাষ্ট্রের হস্তে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে সম্মত হইতে পারে না। তাহা ছাডা, পিতামাতার দ্বারা শিশুর মনে দয়া, মায়া, ভালবাসা ইত্যাদি যে সকল কোমল বৃত্তির বিকাশ-লাভ সম্ভব হয়, তাহা অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হয না। সুস্থ সমাজ গড়িয়া তুলিতে পরিবারের দান অপরিহার্য। কাজেই পারিবারিক জীবন নষ্ট করিয়া দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

এইজন্যই Mrs. Bosanquet তাঁহার 'The Family' নামক পুস্তকে সত্যই বলিয়াছেন যে, পরিবারের সাধারণ দুর্বলতার জন্য পারিবারিক জীবনের শান্তি ও সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া দেওয়া—সূর্য মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন হয় বলিয়া তাহাকে আকাশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ার মতই হাস্যকর। সুতরাং পারিবারিক সৌন্দর্য ও আরাম হইতে মানুষকে বঞ্চিত করা কখনই উচিত হইবে না।

৯। পারিবারিক জীবনের কতকগুলি সমস্যা (Some Problems of Family Life): আধুনিক যুগে নানা কারণে পরিবার বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। পরিবারের প্রধান প্রধান সমস্যা নিম্নে আলোচনা করা হইল:

(১) পরিবারের প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক। অধিকাংশ পরিবার আর্থিক দুরবস্থার জন্য জীবনের অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও সংস্থান করিতে পারে না।

(২) পরিবারের অপর একটি সমস্যা হইল আন্তর্জাতিক সমাজ গঠন করা, যাহার ফলে সমস্ত পরিবারের বহু সমস্যার সমাধান হইবে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইবে ও জীবনধারণের মান-উন্নয়নের ব্যবস্থা হইবে।

(৩) জাতীয় সম্পদের রক্ষা ও ব্যবহার করা পরিবারের অপর একটি সমস্যা। জাতীয় সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে পরিবারবর্গ তাহাদের অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ ও ভোগ করিতে পারিবে।

(৪) যুদ্ধ ও ধ্বংসমূলক কার্যাবলী বহু পরিবারকে ধ্বংস করে এবং যে-সমস্ত পরিবার রক্ষা পায়, তাহাদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠে।

(৫) বিবাহবিচ্ছেদ-প্রথা পরিবারে অপর একটি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে অনেক পরিবারে ভাঙ্গন ধরে, সন্তানাদির দুর্দশার অন্ত থাকে না, ফলে তাহাদের শিক্ষা ব্যাহত হয়।

(৬) স্বল্পবেতনভোগী বা দরিদ্র পরিবারে সন্তানাদির লালন-পালন আরও গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে।

(৭) পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অকালমৃত্যু হইলে পরিবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে আর্থিক দুরবস্থা চরম হইয়া দাঁড়ায়।

(৮) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অভাব হইলে পরিবার অসুখী জীবন-যাপন করে, ফলে জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়।

(৯) মায়েদের উপার্জন করিতে হইলে পরিবারে নানা সমস্যা দেখা দেয়, যেমন—সন্তানাদির যত্ন, লালন-পালন, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাহত হয়, তাহারা মায়ের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয়, পারিবারিক অন্যান্য কর্তব্য কর্ম অবহেলিত হয়। গৃহকার্য, অতিথি-অভ্যাগতদের সেবার কাজ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিবার কাজ মায়েদের পক্ষে করা আর সম্ভব হয় না, ফলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

(১০) সচ্ছল, অবস্থাপন্ন পরিবারে সন্তান জন্ম গ্রহণ না করিলেও পারিবারিক জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

(১১) সন্তানদের জন্য আদর্শ গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করা পরিবারের অপর একটি সমস্যা। তাহাদের নৈতিক উন্নতিসাধন, দৈহিক ও মানসিক বিকাশসাধন করিতে না পারিলে পরিবারের উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। ফলে নানা প্রকারের সমস্যার উদ্ভব হয়।

(১২) সুপাত্র বা সুপাত্রী নির্বাচন করা পরিবারের একটি অন্যতম সমস্যা, কারণ, পরিবারের ভবিষ্যৎ তাহাদের উপর নির্ভর করে।

(১৩) আধুনিক যুগে জন-সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি পরিবারে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার জন্য পরিবার-পরিকল্পনার সুপ্রচলন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই-সকল সমস্যা ছাড়াও বৃদ্ধদের যত্ন নেওয়া, আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, সকলের সেবাযত্নের, শান্তির ও আরামের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বহু সমস্যার সম্মুখীন পরিবারকে হইতে হয়।

আধুনিক যুগে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে পরিবারের প্রধান প্রধান সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

১০। পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎ (Future of the Family Life): পরিবার আদিম সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

বর্তমান পরিবার

বর্তমানেও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকারের পরিবার দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক সমাজের পরিবারকে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ফলে পারিবারিক সংহতি রক্ষা করা কঠিন

হইয়া উঠে। কিন্তু এই-সকল সমস্যা থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক জীবন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। পরিবারই মানুষের শান্তির নীড়, আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। মানুষের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, পরিপূর্ণ বিকাশসাধনের জন্য পরিবারের প্রয়োজনীয়তা মানুষ চিরকাল উপলব্ধি করিবে।

ভবিষ্যৎ পরিবার

কালের আবর্তে পরিবারের আরও বহু পরিবর্তন হইবে সন্দেহ নাই, ভবিষ্যৎ পরিবার ঠিক কি আকার ধারণ করিবে, তাহা পূর্ব হইতে বলিবার উপায় নাই। আশা করা যায় যে, বর্তমান পরিবারের অনেক দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তা হইতে ভবিষ্যৎ পরিবার মুক্ত হইবে, অনেক সমস্যার সমাধান হইবে। আবার, হয়ত নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভবও হইতে পারে, নূতন দায়িত্ব পরিবারকে বহন করিতে হইতে পারে।

পরিবার-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু এই-সকল পরিবর্তনের মধ্যেও পরিবার চিরদিন মানুষের মূল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে, মানুষের জীবন কল্যাণময় ও মধুময় করিবে। ফলে সমাজেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ভবিষ্যৎ পরিবার আরও উন্নত, সচ্ছল ও সুখী হইবে এবং সমাজে আরও গভীরতর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবে। কাজেই মানুষ নিশ্চয়ই এই আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে মানুষের সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর, সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে।

বিবাহ (Marriage)

১। বিবাহের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (**Definition and Explanation of marriage**): বিবাহ অন্যতম সামাজিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের সহিত যৌন সম্পর্কে সম্পর্কিত হইবার ও সন্তানের জন্ম দিবার সামাজিক অনুমোদন লাভ করে।

বিবাহের সংজ্ঞা

Westermarck বিবাহের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "marriage is more or less a durable connection between male and female, lasting beyond the mere act of propagation till after the birth

of the offspring". বিবাহ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে, সন্তানের জন্ম দিবার উদ্দেশ্যেই এই সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সন্তান-জন্মের পরেও সেই সম্পর্ক বর্তমান থাকে।

বিবাহ পরিবারের একটা অঙ্গবিশেষ, আবার ইহা পরিবারের প্রস্তুতিও বটে। বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরিবারের সৃষ্টি হয়, আবার পরিবার ব্যতীত বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা ভাবা যায় না। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উপরে বিবাহ এক বিরাট দায়িত্ব-ভার অর্পণ করে। সন্তানাদির জন্ম দিবার, তাহাদের লালন-পালন করিবার এবং পরিবার প্রতিপালন করিবার কর্তব্য ও দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর উপরে ন্যস্ত হয়। সন্তানাদিরও আবার পরিবারের প্রতি নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করিতে হয়।

বিবাহের দায়িত্ব

উপরন্তু, বিবাহকে একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা পরিবার সকলের ভরণ-পোষণের এবং শিক্ষা-দীক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকে। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই এই অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

বিবাহ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান

বিবাহ নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছাড়াও একটা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে। বিবাহের দ্বারা মানুষের যৌন আবেগ সংযত এবং বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর যৌন আবেগকে একটা পবিত্র আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করে।

বিবাহের আধ্যাত্মিক দিক

হিন্দু-সমাজে বিবাহ একটা অতি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান; এই সম্পর্ক চিরস্থায়ী, মৃত্যুতেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। হিন্দুরা মনে করে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। এই সম্পর্ক কখনও ছিন্ন করা যায় না। বিবাহ তাহাদের কাছে ধর্মের একটি অঙ্গবিশেষ। বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে এবং গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে।

হিন্দু-বিবাহ

২। **বিবাহ-প্রথার উৎপত্তি (Origin of Marriage)ঃ** বিবাহ-প্রথার উৎপত্তি ঠিক কবে ও কিভাবে হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন, আদিম সমাজে বিবাহ রূপ অনুষ্ঠান ছিল না। তখন মানুষের মধ্যে অনিয়মিত যৌন সম্পর্ক বর্তমান ছিল।

আদিম সমাজে বিবাহপ্রথা

যে-কোন পুরুষ যে-কোন স্ত্রীলোকের সহিত পশুর মত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিত। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ আবার বলেন, আদিম সমাজে গোষ্ঠী-বিবাহ (group marriage) প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ একদল পুরুষ একদল স্ত্রীলোককে বিবাহ করিত এবং তাহারা একত্রে পারিবারিক জীবনযাপন করিত। কিন্তু এইরূপ গোষ্ঠী-বিবাহ-প্রথারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। গোষ্ঠীর মধ্যে কোথাও অনিয়মিত যৌন সম্পর্ক ছিল বলিয়াও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে-সকল সমাজে অনেক পুরুষের অনেক স্ত্রীলোকের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রথা বা অধিকার আছে, সে-ক্ষেত্রেও বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠান ছাড়া এইরূপ অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে সমাজের এমন কোন স্তর পাওয়া যায় না, যখন বিবাহ ছিল না। বিবাহ-প্রথা সমাজের অতি প্রাচীন প্রথা, সমাজের আদিতেও এই প্রথা বর্তমান ছিল। বিবাহ-প্রথা ব্যতীত পরিবারের উদ্ভব হইতে পারিত না, আবার পরিবার না থাকিলেও বিবাহ-প্রথা চলিতে পারিত না। উভয়ই মানবজাতির সূত্রপাত হইতেই বর্তমান ছিল, এই মতবাদই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজদার্শনিকদের সমর্থন লাভ করিয়াছে। সুতরাং বিবাহ মানবজাতির মতই প্রাচীন। জৈবিক, দৈহিক, অর্থনৈতিক—নানা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিবাহের দ্বারা নরনারী পরস্পর সম্পর্কিত হইত ও পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিত।

আদিম সমাজে গোষ্ঠী-বিবাহ-প্রথা

সমাজের আদিতেও বিবাহ-প্রথা বর্তমান ছিল

৩। **বিবাহের উদ্দেশ্য (Aims of Marriage)**: আদিম সমাজে সন্তানের জন্ম ও লালন-পালন, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন, যৌন আবেগ চরিতার্থ করা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নরনারী বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত হইত। আদিম যুগে পুরুষদের অনেক কারণে স্ত্রীলোকদের উপর নির্ভর করিতে হইত। খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা, পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করা ইত্যাদি কার্য স্ত্রীলোকেরা সম্পন্ন করিত। সুতরাং স্ত্রীলোকের সাহায্য ব্যতীত পুরুষদের জীবনধারণ করা অসুবিধাজনক হইত। এই কারণে প্রত্যেকে বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবনযাপন করিত।

আদিম যুগে বিবাহের উদ্দেশ্য

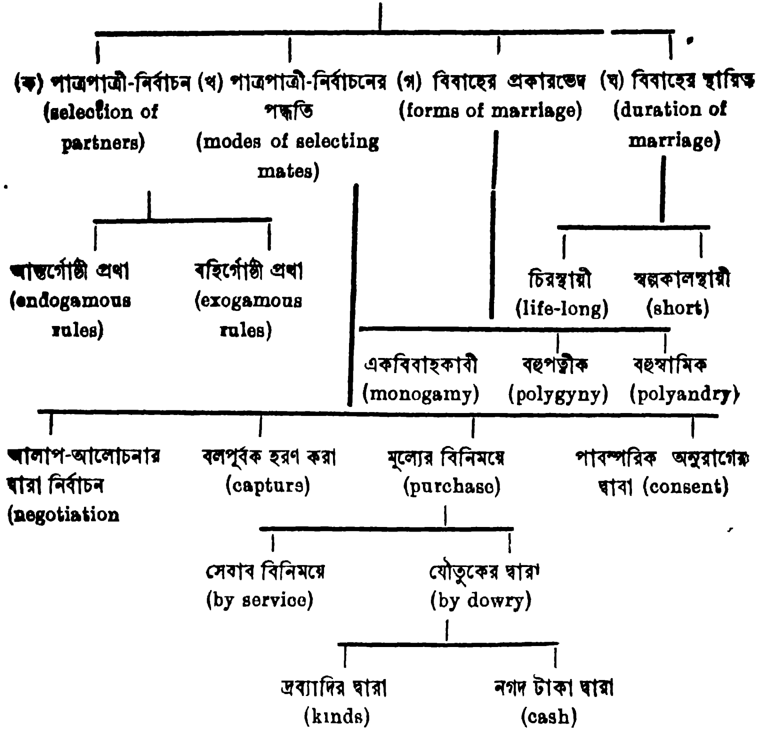
আধুনিক সমাজেও বিবাহ একটা অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। (১) মানুষের যৌন আবেগকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত করা বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য। (২) মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর। বিবাহ নরনারীর মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে। (৩) সন্তানের জন্ম দিয়া এবং তাহাদের লালন-পালন করিয়া মানুষ অশেষ আনন্দলাভ করে। বিবাহের দ্বারাই মানুষ এই অধিকার প্রাপ্ত হয়।

হিন্দু-বিবাহের উদ্দেশ্য: হিন্দুরা বিবাহকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করে। হিন্দুশাস্ত্র-মতে বিবাহের অনেক প্রকারের উদ্দেশ্য আছে: (১) বিবাহের দ্বারাই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। (২) হিন্দুদের মতে মাতা হইবার জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হইয়াছে, আর পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে পিতা হইবার জন্য। (৩) মোক্ষ-লাভের জন্য পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। (৪) পুত্রের জন্ম দিয়া পিতামাতা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। মনু বলেন, পুত্রাদির দ্বারা মানুষ স্বর্গলোক-প্রাপ্ত হয়, পৌত্রাদির দ্বারা স্বর্গলোকে স্থায়িত্বলাভ করে, প্রপৌত্রাদির দ্বারা সূর্যলোক-প্রাপ্ত হয়। পুত্র পিতাকে 'পুন্নাম' নরক হইতে উদ্ধার করে বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম 'পুত্র' দিয়াছেন। (৫) হিন্দুশাস্ত্র-মতে স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অর্ধাঙ্গমাত্র। সুতরাং বিবাহ না করিলে পুরুষ পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ-সাধনই বিবাহের উদ্দেশ্য

এক কথায়, মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। বিবাহ মানুষের সহজাত যৌন কামনাকে সংযত করে, সুন্দর ও পবিত্ররূপ দান করে। বিবাহই পরিবারের প্রাথমিক ভিত্তি। সুতরাং ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক রীতি এবং ইহার পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

৪। বিবাহের প্রকার-ভেদ (Different Kinds of Marriage): বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রীতি-অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ হইতে পারে। পরপৃষ্ঠায় বিভিন্নপ্রকার বিবাহের একটি নক্শা দেওয়া হইল।



(ক) সমাজে বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী-নির্বাচন-বিষয়ে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ বর্তমান থাকে। সাধারণতঃ সকল সমাজেই মাতার সহিত পুত্রের বিবাহ, ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাহ নিষিদ্ধ। কেবল প্রাচীন মিশর দেশে রাজপরিবারে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ অনুমোদিত ছিল। সম্ভবতঃ রাজরক্ত রাজপরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। আধুনিক কোনও সমাজেই এইরূপ নিয়ম নাই।

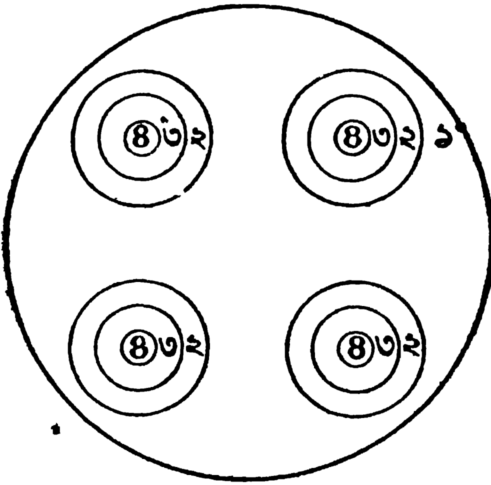
সামাজিক বিধিনিষেধ

হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন জাতির সহিত বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না, যথা—ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের বিবাহ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের, কায়স্থের সহিত কায়স্থের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে (endogamy)। কিন্তু আবার ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের বা কায়স্থের সহিত কায়স্থের বিবাহ সগোত্রে

হিন্দুসমাজের নিয়ম

হইতে পারে না, ভিন্ন গোত্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয় (exogamy)। সপিণ্ড বা সপ্রবরের মধ্যেও বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া নিষিদ্ধ। এইজন্য হিন্দুদের সমাজে endogamy ও exogamy—দুইটি নিয়মই পাশাপাশি চলে। নিম্নের নক্‌শায় একই জাতির মধ্যে গোত্র, সপিণ্ড ও সপ্রবরের পার্থক্য দেখানো হইতেছে।

প্রথম বৃত্তটি হিন্দুদের একটি জাতিকে বুঝাইতেছে, যেমন—কায়স্থ। কায়স্থের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র বর্তমান। একই গোত্রের দুই পরিবারের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া নিষিদ্ধ। গোত্রের আরও ক্ষুদ্র বিভাগ হইল সপিণ্ড। সপিণ্ড হইলে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। অপর একটি বিভাগ হইল সপ্রবর। সপ্রবরের গোষ্ঠীর মধ্যেও বিবাহ হয় না। সুতরাং হিন্দু-বিবাহ স্বজাতি বিবাহ, কিন্তু সগোত্র, সপিণ্ড ও সপ্রবর নহে।



প্রথম বৃত্ত জাতিকে বুঝাইতেছে
দ্বিতীয় ,, গোত্রকে ,,
তৃতীয় ,, সপিণ্ডকে ,,
চতুর্থ ,, সপ্রবরকে ,,

(খ) সকল সমাজেই পাত্র-পাত্রী-নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্তমান। এই-সকল পদ্ধতিকে মোট চারিভাগে ভাগ করা যায়।

(১) বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের অভিভাবকরা মিলিত হইয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমাজে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে ও বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করে। আমাদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উপায়েই বিবাহ স্থির হয়।

(২) আদিম যুগে প্রায় সকল সমাজেই বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া

বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, বর্তমানের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত প্রথা।

(৩) অনেক সমাজে আবার পাত্র-পাত্রী মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করিবার প্রথাও বর্তমান রহিয়াছে। ক্রয় আবার দুইপ্রকারে করা যাইতে পারে: (ক) কোন কোন সমাজে কোন যুবক তাহার ভাবী শ্বশুর-গৃহে বাস করিয়া কায়িক পরিশ্রম ও সেবাশুশ্রূষার দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদের কন্যাকে বিবাহ করে। (খ) যৌতুক দিয়াও বর বা কন্যাকে ক্রয় করা যায়। আধুনিক সমাজে বরকে যৌতুক দিবার প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত। যৌতুকের পরিমাণ নির্ধারিত হয় বরের চাকুরি, বিদ্যাবুদ্ধি, অর্থ-প্রতিপত্তি ইত্যাদির পরিমাপে। যৌতুক-প্রথা বর্তমান সমাজে একটা বিবাহ-সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রথা বন্ধ করিবার জন্য নূতন আইন হইয়াছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নাই। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাই ইহা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। বরপক্ষ অর্থগ্রহণ করিতে না পারিলেও অন্যান্য সামগ্রীর দাবি ছাড়ে না, সুতরাং, যৌতুক-প্রথা পুরাদমেই সমাজে চলিতেছে।

(৪) আধুনিক সমাজে আবার নরনারীর মধ্যে পারস্পারিক অনুরাগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে পিতামাতার সম্মতি গ্রহণ না করিয়াই তাহারা বিবাহ-সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আদিম সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে আটপ্রকারের বিবাহের বিবরণ আছে: **ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ**। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিপ্রকারের বিবাহ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, শেষ চারিপ্রকারের বিবাহ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ব্রাহ্ম ও দৈব বিবাহ সর্বোৎকৃষ্ট, পৈশাচ বিবাহ নিকৃষ্টতম। (১) সদাচার-সম্পন্ন বরকে কন্যার পিতা আমন্ত্রণ করিয়া, তাহাকে বিধিমত অর্চনা করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা কন্যাকে দান করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ হয়। (২) জ্যোতিষ্টমাদি যজ্ঞের কর্মকর্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃতা কন্যাকে দান করিলে দৈব বিবাহ হয়। (৩) কন্যার পিতাকে বর এক বা দুই গো-মিথুন (একটি বৃষ ও একটি গাভী) দান করার পর কন্যার পিতা তাহাকে বিধিমতে কন্যা দান করিলে আর্ষ বিবাহ হয়। (৪) বর ও কন্যাকে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিবার অনুরোধ করিয়া সালঙ্কারা কন্যাকে বিধিমতে বরকে দান করিলে তাহাকে প্রাজাপত্য

হিন্দুশাস্ত্রমতে অষ্ট প্রকারের বিবাহ

বিবাহ বলে। (৫) কন্যার পিতাকে ধন দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিয়া বিবাহ করাকে আসুর বিবাহ বলা হয়। (৬) বর ও কন্যা উভয়ের মধ্যে অনুরাগের ফলে যে-বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। এই বিবাহ কামমূলক বলিয়া নিকৃষ্টরূপে গণ্য হয়। (৭) কন্যাপক্ষ বিবাহে বাধা প্রদান করা সত্ত্বেও বলপূর্বক রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলে রাক্ষস-বিবাহ হয়। ইহা অতি গর্হিত বিবাহ। (৮) নিদ্রিতা, মদ্যপানরতা, উন্মত্তা স্ত্রীলোককে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিলে পৈশাচ বিবাহ হয়। এই বিবাহ নিকৃষ্টতম, অতীব পাপজনক।

(গ) বিবাহ একবিবাহকারী, বহু-পত্নীক ও বহু-স্বামিক—এই তিন-প্রকারের হইতে পারে। পূর্বেহ এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

আমাদের সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু-পত্নীক পরিবার-প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন কুলীন ব্রাহ্মণের দেড়শত হইতে দুইশত পর্যন্ত স্ত্রী থাকিত। সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য হইলে বহু-পত্নীক পরিবার-প্রথা প্রাধান্যলাভ করে। তাহা ছাড়া, একাধিক স্ত্রী ভোগ করিবার বাসনা, স্ত্রীলোকের যৌবনে ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়া, ধনলাভের বাসনা, কর্তৃত্বাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি হইতেও বহু-পত্নীক পরিবার-প্রথা সমাজে প্রচলিত হয়। আবার, স্ত্রীলোকের সংখ্যা লঘিষ্ঠতা, দরিদ্রতা প্রভৃতি বহু-স্বামিক পরিবার-প্রথা প্রচলিত হইবার কারণ। কিন্তু শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-প্রথারও বহু পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। আধুনিক সমাজে এক বিবাহ-প্রথাই সমধিক প্রচলিত। একাধিক বিবাহ আধুনিক হিন্দু-আইনে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।

হিন্দুসমাজে বহু পত্নীক বিবাহপ্রথা

(ঘ) **বিবাহের স্থায়িত্বকাল**: সাধারণতঃ দরিদ্রদের মধ্যে বিবাহ একটা চিরস্থায়ী সম্পর্ক। হিন্দুশাস্ত্র-মতেও এই সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। এমন কি, মৃত্যুর দ্বারাও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। এইজন্য হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। হিন্দু-বিধবারা অতি অল্প বয়সে বিধবা হইলেও সারাজীবন সেই বৈধব্য-জীবনযাপন করে, সামাজিক বিধিনিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ব্যর্থ জীবন অতিবাহিত করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথমে প্রমাণ

হিন্দুসমাজে বিবাহ চিরস্থায়ী সম্পর্ক

করিয়া দেখাইলেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত এবং তিনি বিধবা-বিবাহের পুনঃপ্রচলন করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করাইলেন।

আধুনিক সমাজে বিবাহ যে একটা চিরস্থায়ী সম্পর্ক, তাহা কেহ বিশ্বাস করে না। এইজন্য বিবাহিত জীবন সুখের না হইলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া একান্ত প্রযোজন বলিয়াই অনেকে মনে করেন। আমাদের সমাজে ইহার প্রচলন অত্যধিক না হইলেও পাশ্চাত্ত্য সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনানুমোদিত সমাজেরও অনুমোদিত। এইজন্য পাশ্চাত্ত্য সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের সমাজেও হিন্দু-আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু সংস্কারে ইহা এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদ এখনও সীমাবদ্ধ আছে। যাহা হোক, আমাদের সমাজেও ইহার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বিবাহ-বিচ্ছেদ পারিবারিক জীবনে নূতন এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

আধুনিক মতে বিবাহ চিরস্থায়ী সম্পর্ক নহে

বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ : বিবাহ বিচ্ছেদ বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে : (১) দুশ্চরিত্রতা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইবার অন্যতম কারণ। স্বামী বা স্ত্রী দুশ্চরিত্র হইলে তাহার সহিত বিবাহিত জীবনযাপন করা বা পরিবার গঠন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দুশ্চরিত্র পিতা বা মাতার সন্তানের দৈহিক ও সামাজিক গঠনও বিকৃত হইতে পারে। ইহাতে সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। (২) স্বামী বা স্ত্রী যদি অতিরিক্ত মদ্যপানাসক্ত হয়, তাহা হইলেও পারিবারিক জীবন বিষময় হইয়া উঠে, ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। (৩) স্বামী বা স্ত্রী যদি সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা-রহিত হয়, তাহা হইলেও বিবাহের উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়, জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। (৪) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেহ যদি দুরারোগ্য শারীরিক বা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া উঠে। (৫) তাহা ছাড়া, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিত্য কলহ, নির্দয়তা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে অনেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে বাধ্য হয়। উভয়ের সম্মতি ও উপযুক্ত কারণ থাকিলেই আধুনিক যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, অসুখী, বিষময় জীবনযাপন করা অপেক্ষা বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়া নূতন সুখী পরিবার গঠন করা সমাজের পক্ষে মঙ্গল-

জনক। (৬) কিন্তু এই-সকল অনিবার্য কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনানুমোদিত হওয়ার ফলে অতি সামান্য কারণেও লোকে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করে। (৭) স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের ফলে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের মত সমান অধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই পূর্বেকার মত স্বামীর সকল অত্যাচার, অবিচার নির্বিবাদে সহ্য করা আধুনিক স্ত্রীলোকদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। (৮) জন্মনিয়ন্ত্রণের নানা প্রকারের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বর্তমান পরিবার অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিতেছে। পরিবারের এই ক্ষুদ্রত্বও বিবাহ-বিচ্ছেদের একটা পরোক্ষ কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকায় যত বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৬০ হইতে ৭০টি পরিবার নিঃসন্তান, শতকরা ২০টি পরিবার এক সন্তানের পিতামাতা। (৯) দারিদ্র্য, আধুনিক স্বামী-স্ত্রীর গৃহ-কার্যে অবহেলা, পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব, ধৈর্যের অভাব, আদর্শ পরিবেশের অভাব, অসংযত মেজাজ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আধুনিক সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদেব সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

অবশ্য, ইহা সত্য যে, অসুখী জীবনযাপন করা অপেক্ষা বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অতিরিক্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা পারিবারিক জীবনে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে। এইজন্য অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী পবিবারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। (১) বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অধিক হওয়া সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, সন্তানাদিব জীবনের উপর মাতাপিতার বিচ্ছেদ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (২) তাহা ছাড়া, বিবাহ-বিচ্ছেদ পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি-রক্ষার পক্ষে অনিষ্টকর। বিশেষ করিয়া, সন্তানাদি বর্তমান থাকিলে বিবাহ-বিচ্ছেদ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (৩) সন্তানাদির কল্যাণের জন্য পিতা-মাতার উচিত নিজেদের মনোভাবকে সংযত করা, তাহাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা ও নিজেদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা। কলহ-মাত্রকেই ভালবাসার অভাব মনে করার কোন কারণ নাই। নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ সমাজের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর নহে। কিন্তু যাহাদের সন্তানাদি বর্তমান আছে, তাহাদের উচিত সন্তানের কল্যাণার্থে আপন স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া।

বিবাহ-বিচ্ছেদের অসুবিধা

সুতরাং পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি-রক্ষার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা যত কম হয় ততই মঙ্গল।

৫। আধুনিক যুগের বিবাহ ও পরিবার (Marriage and Family to-day): প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, পরিবারের স্থায়িত্ব নষ্ট হইয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতে পরিবার-প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, সন্তানাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে এবং রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিপালিত হইবে।

পরিবারের ভবিষ্যৎ

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্ত্য দেশে জন্মসংখ্যা হ্রাস ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের সমাজে অবশ্য সমস্যাটা বিপরীত। জন্মসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরিবার-পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ মোটেই ছিল না বলিলেই চলে। আধুনিক যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হওয়া সত্ত্বেও উহার সংখ্যা পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় অনেক কম। তথাপি দিন দিন বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সমাজের অবস্থা

তাহা ছাড়া, বিবাহ যে একটা চিরস্থায়ী সম্পর্ক, এই ধারণা দিন দিন লোপ পাইতেছে। আধুনিক যুগে নানা কারণে লোকে মনে করে যে, পারিবারিক জীবন নষ্ট করিয়া দিয়া রাষ্ট্রেরই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। কারণ, (১) আধুনিক শিল্পোন্নতির যুগে স্ত্রীলোকেরা শিল্পের প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। আধুনিক স্ত্রীলোকেরা আর গৃহের মধ্যে কেবল পারিবারিক দায়িত্বই পালন করিতেছে না, বাহিরের জগতে পুরুষের সহিত সমানভাবে কাজ করিতেছে। সুতরাং পারিবারিক কার্য অবহেলিত হইতেছে। (২) স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে স্ত্রীলোকেরা আর পুরুষের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে চায় না, উপার্জন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিতে চায়। (৩) আধুনিক স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করে না।

পারিবারিক জীবন নষ্ট করিয়া দিবার কারণ

এই-সকল কারণে পরিবার আর পূর্বাবস্থায় নাই। শিশুদের লালন-পালন,

শিক্ষাদীক্ষা ও সাংসারিক কাজকর্মে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতেছে। সেইজন্যই পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৪) আধুনিক পরিবার দিন দিন ক্ষুদ্রাকৃতি হইতেছে। অধিক বয়সে বিবাহ করা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক অবনতি, জীবনধারণের মান-উন্নয়ন ইত্যাদি বিবিধ কারণে পরিবার ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিতেছে। আধুনিক যুবকেরা গুরু দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে বলিয়া বিবাহ করিতে ভয় পায়। এইজন্য অনেকে মনে করেন, পরিবার ভবিষ্যতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু এই-সকল কারণ পরিবারকে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর করিতেছে না, বরং তাহাকে আরও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। Westermarck বলেন, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা-বৃদ্ধি পরিবারকে ধ্বংস করে না, বরং রক্ষা করে। কারণ, বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে অসুখী পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া নূতন সুখী পরিবারের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু পরিবার আরও শক্তিশালী হইতেছে

তবে এইজন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সমাজের পক্ষে বা পরিবারের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। Westermarckও স্বীকার করিয়াছেন যে, পারস্পরিক অনুরাগ ও সন্তানাদির প্রতি মায়া-মমতাই বিবাহ ও পরিবারের ভিত্তি। কাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ অধিক হওয়া কল্যাণ-জনক নহে।

রাশিয়ায় রাষ্ট্র পারিবারিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া এক নূতন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পারিবারিক জীবন নষ্ট করিয়া দিবার ফল শুভ হয় নাই। এইজন্য আধুনিক মতবাদ হইতেছে যে, পরিবার অন্যান্য বৃহত্তর সকল প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। মাতাপিতার যে-যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি সন্তানের দৈহিক ও মানসিক গঠনে সহায়তা করে, তাহা অন্য কোন শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। সন্তানদিগকে মাতাপিতার সযত্ন স্নেহ-ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাষ্ট্রপ্রদত্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার ফল রাশিয়াতে আশানুরূপ হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিবারকে বলি দেওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

রাশিয়ার পরীক্ষা সফল হয় নাই

ইহা সত্য যে, ভবিষ্যতে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে,

পরিবারের রূপ পরিবর্তিত হইবে, কিন্তু পরিবার কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। কারণ, পরিবারের ভিত্তি জৈবিক। অসহায় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিবার-প্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালবাসা সহজাত। সন্তানেরও পিতামাতার প্রতি সহজাত মায়া-মমতা থাকে। এই ভালবাসা ও মায়ামমতার মূল্য সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং পরিবার ও বিবাহ সমাজ হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

বিবাহ ও পরিবার চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে

সম্প্রদায় (Community)

১। সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা (Definition of Community) :

Community "is any circle in which a common life is lived, within which people more or less freely relate themselves to one another in the various aspects of life and thus exhibit common social characteristics."—Maciver

সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা

অর্থাৎ সম্প্রদায় হইল এমন একটি জনসমষ্টি, যাহারা জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত হয় এবং একই প্রকারের সামাজিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।

সম্প্রদায়ের মধ্যে একই প্রকারের মনোভাববিশিষ্ট কতকগুলি লোক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সুসংবদ্ধ হইয়া বসবাস করে। 'সম্প্রদায় বলিতে আমরা গ্রাম, শহর, জনপদ, জাতি, উপজাতি ইত্যাদিকে বুঝাইয়া থাকি। সাধারণতঃ তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী একইরূপ থাকে এবং মানুষের সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি সমগ্রভাবে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। মানুষ ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইলে তাহার মধ্যে জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। ধর্মপ্রতিষ্ঠানে মানুষ কেবল ধর্মসম্পর্কীয় আলোচনার জন্য বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যায়। স্কুলে কিংবা কলেজে লেখাপড়া শিখিবার জন্য যায়। মানুষ সমগ্রভাবে এই-সকল প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয় না। ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাহিরে মানুষ অন্য প্রকারের জীবনযাপন করে। কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষের সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়ভুক্ত। সম্প্রদায়ের বাহিরে আর তাহার কোন প্রয়োজন থাকে না। মানুষ কোন উপজাতির মধ্যে, শহরে বা গ্রামে তাহার সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাইতে পারে। ইহা ব্যতীত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ থাকে। তাহাদের মধ্যে গভীর যোগাযোগ বর্তমান।

সম্প্রদায় ও মানুষ

সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য : সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল যে, (১) সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের সর্বপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক পাওয়া যায়।

(২) সম্প্রদায়ের অপর বৈশিষ্ট্য হইল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস। সম্প্রদায় বলিতে কতকগুলি ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সুসংবদ্ধভাবে বসবাস বুঝায়।

(৩) উপরন্তু, সম্প্রদায়ের একটা সীমিত রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন থাকে, যে-শাসনতন্ত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সঙ্ঘগুলিকে (স্কুল, কলেজ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

(৪) ইহা ব্যতীত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা, সহযোগিতা, সাহচর্য ও একতা বর্তমান থাকে।

(৫) আদিম সমাজে যে-সকল সম্প্রদায় বর্তমান ছিল, তাহারা ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ। অনেক সময় এই-সকল সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা একশত জনের অধিক হইত না। তথাপি তাহারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু সকল সম্প্রদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ না-ও হইতে পারে। আধুনিক সমাজের সম্প্রদায়গুলি পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃহত্তর, কিন্তু তথাপি তাহারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। আধুনিক শিল্প-প্রসারের যুগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানাকারণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সুতরাং বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে সম্প্রদায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মনে করা উচিত নহে।

(৬) সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—উভয় প্রকারের হইতে পারে। কিন্তু তাহা সর্বদা অঞ্চল বা স্থানের উপর নির্ভর করে না। আমাদের স্বার্থ ক্ষুদ্র বা সীমাবদ্ধ হইলে বৃহৎ নগর বা রাজধানীতে বাস করিয়াও আমরা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারি। আর, আমাদের দৃষ্টির যদি প্রসার থাকে, তবে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে বাস করিয়াও আমরা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আবার বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত হইয়া অবস্থান করিতে পারে, যেমন—শহর থাকে প্রদেশের মধ্যে, প্রদেশ থাকে রাষ্ট্রের মধ্যে, আবার রাষ্ট্র থাকে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে।

২। সম্প্রদায়ের ভিত্তি (The Bases of Community): সম্প্রদায় হইল কতকগুলি লোকের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সুসংহত সামাজিক জীবন-যাপন। সুতরাং সম্প্রদায়ের ভিত্তি হইল দুইটি: (১) স্থান বা অঞ্চল (Locality) ও (২) সম্প্রদায়গত মনোভাব (Community Sentiment)।

(ক) স্থান: সম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চল অধিকৃত করিয়া বসবাস করে। এমন কি, পরিবর্তনশীল যাযাবর-সম্প্রদায়েরও একটি স্থান

থাকে। তাহারা যখন কোন নূতন স্থানে যায়, তখন তাহাদের সেই পূর্ব-অধিকৃত নির্দিষ্ট স্থানেই বসবাস করে। অন্যান্য স্থায়ী সম্প্রদায় কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এবং তাহাদের মধ্যে একটা গভীর সঙ্ঘবদ্ধতা বা সংহতি থাকে।

আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা-বৃদ্ধির ফলে এই সংহতি কিছুটা নষ্ট হইয়া গেলেও গ্রামাঞ্চলে উহা এখনও বর্তমান আছে। তবে বিস্তৃত যোগাযোগ-ব্যবস্থার ফলে আজকাল বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি সম্প্রদায়গুলির সামাজিক সংহতি তাহাদের অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। এস্কিমো বা এইরূপ বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে দেখিলে তাহা সহজেই বুঝা যায়। আধুনিক যুগেও তাহাদের স্থানবৈশিষ্ট্যই তাহাদের সুদৃঢ় সংহতির মূলকারণ। তাহাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থানই এইরূপ যে, বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ-রক্ষার সুযোগ-সুবিধা কম। সেইজন্য তাহাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

স্থানই সম্প্রদায়কে সুসংবদ্ধ করে

(খ) **সম্প্রদায়গত মনোভাব** : কিন্তু স্থান বা অঞ্চল জনসম্প্রদায়ের অন্যতম ভিত্তি হইলেও ইহা কেবল স্থান বা অঞ্চলের উপর নির্ভর করে না। আধুনিক কালে আমরা দেখিতে পাই, জনসাধারণ একই অঞ্চলে অনেককাল বসবাস করিয়াও কোন সম্প্রদায় গঠন করে না। আদিম সমাজে অবশ্য এইরূপ কখনই ঘটিত না। যাহা হোক, একই অঞ্চলে বাসস্থান ও অনেকটা একই প্রকারের জীবনযাত্রার প্রণালী হইতে সম্প্রদায়গত মনোভাবের উদ্ভব হয়। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সকলেই যেন আপনার লোক—এইরূপ মনোভাব তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হয়; 'আমরা,' 'আমাদের'—এইরূপ বোধ আসে। তাহাদের মধ্যে পরস্পরের উপর নির্ভরতা-বোধও থাকে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। এই-সকল মনোভাব হইতে সম্প্রদায়গত মনোভাব জাগ্রত হয়।

সম্প্রদায়গত মনোভাবই সম্প্রদায় গঠন করে

৩। **সম্প্রদায় ও সঙ্ঘ** (Community and Association): "An association is a group of individuals united for a specific purpose or purposes and held together by recognised or sanctioned modes of procedure and behaviour."—

কতকগুলি ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত কোন স্বীকৃত সংগঠনের মাধ্যমে একত্র হয়, তখন তাহাকে সঙ্ঘ বলে।

সম্প্রদায় ও সঙ্ঘ এক নয়, উহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে।

সঙ্ঘ হইল কতকগুলি জনসমষ্টি, যাহারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা কতকগুলি উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত সংগঠিত বা একত্র হয়, যথা—The Football Association, The Young Men's Christian Association। স্কুল, কলেজ, সৈন্যদল ইত্যাদিকেও সঙ্ঘ বলা হয়। কারণ, ইহারা বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়নও এইরূপ একটি সঙ্ঘ, যাহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ও জটিল। অপরপক্ষে সম্প্রদায় হইল একটি স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী। তাহারও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়ের কাছে বাঁধা, তাহার সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে, সম্প্রদায়ের বাহিরে তাহার আর কিছু প্রয়োজন থাকে না।

(১) সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য স্থায়ী ও ব্যাপক, সঙ্ঘের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে

(২) সম্প্রদায় বলিতে একটি গ্রাম, শহর, জেলা অথবা দেশকেও বুঝাইতে পারে। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়াই লাভ করা যাইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্প্রদায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জনসমষ্টি। আর, সঙ্ঘ হইল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছিবার একটি উপায়।

(২) সম্প্রদায় সকল উদ্দেশ্যসাধন করে, আর সঙ্ঘ হইল বিশেষ উদ্দেশ্য-লাভের উপায়

সম্প্রদায়ের কতকগুলি নিয়ম ও একটি নির্দিষ্ট আকার আছে, যাহার দ্বারা ইহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ইহারই মধ্যে সাধারণ জীবন যাপন করিতে পারে। একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান থাকে, যাহাদের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তাহাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আবার বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ভারতের যৌথ পরিবারকে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে, যাহা আবার গ্রামের অন্তর্ভুক্ত, পরিবার ও গ্রাম আবার একটি দেশ ও জাতির অন্তর্ভুক্ত।

(৩) একটি সম্প্রদাযের মধ্যে বহু সঙ্ঘ থাকিতে পারে

উপসংহারঃ আদিম সমাজের সরল ও অনুন্নত লোকেরা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সঙ্ঘ কাহাকে বলে, জানিত না। সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে সভ্যতার

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। আধুনিক যুগে মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে যোগাযোগের সুবিধা বিস্তৃত হইয়াছে, মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে, এইজন্য বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে এবং এইভাবেই মানুষ সম্প্রদায় হইতে ক্রমে সঙ্ঘের সহিত যুক্ত হয়। ইহার ফলে সম্প্রদায় ও সঙ্ঘের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হইয়া উঠিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে বিভেদ দূরীভূত হইয়াছে। আধুনিক কালে কোন পরিবারকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায় না। কারণ, পরিবারের অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ, যেমন—শিশুদের শিক্ষা, পীড়িতের সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন সঙ্ঘের মাধ্যমে (যথা—স্কুল, হাসপাতাল) হইয়া থাকে। সেইজন্য সম্প্রদায় ও সঙ্ঘের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা আজকাল কঠিন।

সঙ্ঘ ও সম্প্রদায় অভিন্ন

৩। **সভ্যতার প্রসার ও বিশ্বসম্প্রদায় (The Spread of Civilisation and the World-Community) :** আধুনিক সভ্যতার যুগে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় থাকা সম্ভব নয়। প্রাচীন সমাজে কিন্তু এইরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায়ই বর্তমান ছিল। আধুনিক সভ্যতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট করিয়া দেয়। শিল্পের প্রসার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা কারণে কোন সম্প্রদায়ই আজকাল স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং আধুনিক সভ্যতা আমাদিগকে এমন এক দিকে লইয়া যাইতেছে, যেখানে বিশ্ব-সম্প্রদায়স্বরূপ (world-community) বৃহৎ সম্প্রদায় সৃষ্টি না করিলে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় রাখা সম্ভব নয়।

আধুনিক সমাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায়ের অভাব

কিন্তু এইরূপ বৃহৎ সম্প্রদায় গঠিত হইলেও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি বিনষ্ট হইবে না, তাহারাও বর্তমান থাকিবে। কারণ, বিশ্ব-সম্প্রদায় তাহাদের বর্জন করিবে না, তবে তাহাদের পরিবর্তনসাধন করিবে, তাহাদিগকে আরও উন্নত করিবে। সুসভ্য মানব হিসাবে আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয় সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন আছে। বৃহৎ সম্প্রদায় আমাদের উন্নততর সংস্কৃতিবান্ করিবে, আমাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবে। আর, ক্ষুদ্র সম্প্রদায় তার মধ্যে থাকিয়া আমাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় মিটাইতে সক্ষম হইবে। বৃহত্তর সম্প্রদায় আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করিবে, দেশপ্রেম শিক্ষা দিবে। ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আমাদের দিবে বন্ধু ও বন্ধুত্ব, গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি। জীবনের পূর্ণ পরিণতিতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় সম্প্রদায়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয় সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্র (The State)

১। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of the State) : জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নতিবিধানের জন্য রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন।

অ্যারিস্টটল রাষ্ট্র সম্পর্কে যে-ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা বর্তমান যুগের অনুরূপ নহে। তাঁহার মতে "রাষ্ট্র কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি লইয়া গঠিত, যাহার উদ্দেশ্য হইল পূর্ণাঙ্গ জীবন।" কিন্তু বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞাই যথেষ্ট নহে। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল 'পূর্ণাঙ্গ জীবন'। 'পূর্ণাঙ্গ জীবন' বলিতে তিনি জনসাধারণের নৈতিক উন্নতিকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রের আদর্শ কেবল নৈতিক উন্নতিসাধন নয়। অ্যারিস্টটল রাষ্ট্র বলিতে তখনকার দিনের ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রকেই বুঝাইয়াছেন। আধুনিক যুগের রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—উভয় প্রকারের হইতে পারে।

অ্যারিষ্টটলের সংজ্ঞা

হেগেল ও তাঁহার অনুসরণকারীরা রাষ্ট্রকে এমন এক ঐশ্বরিক শক্তিরূপে গণ্য করিয়াছেন, যে-শক্তি সমাজের সর্বত্র বিরাজমান থাকিয়া সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র সমাজের প্রতিনিধি নয়, সমাজের অন্তর্নিহিত চৈতন্যশক্তি (immanent intelligence)। হেগেল বলিয়াছেন : "The state is the Divine Idea as it exists on earth." অর্থাৎ রাষ্ট্র হইল ঐশ্বরিক শক্তি ও ভাবধারার পার্থিব রূপ।

হেগেলের সংজ্ঞা

হেগেলের এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নহে। রাষ্ট্রের উপর অনাবশ্যক দেবত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রকে অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান-রূপে গণ্য করিবার কোন কারণ নাই। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষই আপন সুবিধার্থে রাষ্ট্র সংগঠন করিয়াছে।

অধ্যাপক লাস্কির (Laski) মতে রাষ্ট্র হইল শাসনকার্য-পরিচালনার জন্য সরকার বা শাসনতন্ত্র ("The State is for the purpose of political administration, the government.")। রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের

লাস্কির সংজ্ঞা

দিকটাই উল্লেখ করিয়াছে, রাষ্ট্রের আরও যে-অপরিহার্য উপাদান আছে, তাহার উল্লেখ ইহাতে নাই।

ব্লানৎস্লি (Bluntschli) বলিয়াছেন: "রাষ্ট্র হইল কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত জনসমষ্টি।" কিন্তু এই সংজ্ঞাও ত্রুটিহীন নহে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের যে-সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য 'সার্বভৌম ক্ষমতা', তাহার উল্লেখ এই সংজ্ঞায় নাই।

ব্লানৎস্লির সংজ্ঞা

ম্যাকাইভারের মতে "সমাজের শাসনব্যবস্থা-পরিচালনার জন্য অন্যান্য বহিঃরাষ্ট্রের সহিত সমাজের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ[১] করিবার জন্য রাষ্ট্র হইল সমাজের প্রতিনিধি।" রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞা রাষ্ট্রের উপযোগিতার উপরে বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, রাষ্ট্রের অপরাপর দিক অবজ্ঞাত হইয়াছে।

ম্যাকাইভারের সংজ্ঞা

রাষ্ট্র সম্পর্কে যতগুলি সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক গার্নারের সংজ্ঞাই সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক ধারণার দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র হইল কমবেশী বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি **জনসমষ্টি**, যাহা কোন একটি নির্দিষ্ট **ভূখণ্ড** অধিকার করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করে, যাহা স্বাধীন বা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত **শাসনযন্ত্র** আছে, যাহাকে ঐ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা **মান্য করিতে বাধ্য**।[২]

গার্নারের সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের উপাদান: ডাঃ গার্নারের সংজ্ঞা অনুসারে রাষ্ট্রের চারিটি উপাদান পাওয়া যায়: (ক) **জনসমাজ**, (খ) **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড**, (গ) **শাসনযন্ত্র বা সরকার** ও (ঘ) **সার্বভৌম ক্ষমতা**।

(ক) **রাষ্ট্রের জনসমাজ বা জনসমষ্টি (Population):** জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্র যে সম্ভব নয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। জনসমষ্টির সুখ-সুবিধা-বিধানের জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি।

(১) "The State is an agency for social control having as its object the regulation of the outstanding external relationships of men in society." —Maciver.

(২) "The State, as a concept of Political Science and Public Law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of a territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience." —Garner

রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) নাগরিক, যাহারা আইন কর্তৃক রাষ্ট্রের সভ্যরূপে গণ্য হয় ও (২) বিদেশী, যাহারা বহিঃরাষ্ট্র হইতে আগত ও অস্থায়িভাবে বাস করে। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। জনসংখ্যা স্বল্পও হইতে পারে, আবার অধিকও হইতে পারে। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল জনসংখ্যা স্বল্প হইলে রাষ্ট্রের পক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সুশাসন করার সুবিধা হয়। আধুনিক যুগে কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, জনসংখ্যার আধিক্য রাষ্ট্রের সুশাসনের পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি করে না।

রাষ্ট্রের দুই প্রকারের জনসমষ্টি

(খ) **রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** (Definite territory)ঃ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান। জনসাধারণ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বসবাস করিলে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়। কারণ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হওয়া সম্ভব নহে। আদিম যুগে মানুষের পেশা ছিল পশুচারণ ও পশুশিকার। তাহারা কোন একটা নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া অবস্থান করিত না বলিয়া তখন রাষ্ট্রীয় সংগঠনও ছিল না। পরে মানুষ যখন কৃষিকার্য করিতে শিখিল, তখন তাহাদের আর স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইত না, তাহারা একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া কৃষিকার্য করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিল। এই সূত্রেই মানুষ তাহাদের মধ্যে খাদ্য, ধনসম্পদ ইত্যাদি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল এবং তাহারই জন্য ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্ভব হইল। সুতরাং রাষ্ট্রের জন্য ভূখণ্ডের অবশ্য প্রয়োজন। যাযাবর জাতিদের কোন রাষ্ট্র হইতে পারে না।

ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে রাষ্ট্রের সীমার অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড, নদনদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, আকাশপথ এবং তিন মাইল পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল ইত্যাদিকেও বুঝায়।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির যেমন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায় না, ভূখণ্ডেরও সেইরূপ কোন সীমা নাই। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। রুশোর মতে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হইলে অধিকতর শক্তিশালী হয়। কিন্তু আধুনিক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়

ভূখণ্ড ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ উভয় প্রকারের হইতে পারে

রাষ্ট্রই অতি বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও প্রচণ্ড শক্তিশালী। জার্মান দার্শনিক ট্রিটস্কের (Treitschke) মতে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে পাপ ("It is a sin for the state to be small.")। যাহা হোক, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয়প্রকার রাষ্ট্রই পৃথিবীতে বর্তমান এবং উহাদের উভয়েরই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। সুতরাং রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের কোন সীমা নির্দেশ করিবার প্রয়োজন হয় না।

(গ) **রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার (Government)ঃ** শাসনযন্ত্র রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান। কারণ, রাষ্ট্রের প্রধান কাজ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন। ইহার জন্য প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ বা শাসকমণ্ডলীর। যখন কোন শাসকমণ্ডলী আইনের সাহায্যে দেশের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখেন, তখন তাহাদের সরকার বলা হয়। সরকার একই ব্যক্তির দ্বারা বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হইতে পারে। শাসনযন্ত্রের কাজ আইন প্রণয়ন করা, জনসাধারণকে আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য করা ও আইন-লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। এইজন্য শাসনযন্ত্রের তিনটি বিভাগ থাকে : (১) আইনসভা, (২) শাসনবিভাগ ও (৩) বিচারবিভাগ। এই-সকল কাজের দ্বারা সরকার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করে। সুতরাং শাসনযন্ত্র বা সরকারই রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান।

শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও ইহার তিনটি বিভাগ

(ঘ) **সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty)ঃ** রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উপাদান এই সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকিলে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যায় না। সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ হইল রাষ্ট্র রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তিকে এবং সকল প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে পারে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়াই সামাজিক সকল প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে। উপরন্তু, রাষ্ট্র বহিঃশক্তির অধীনতা-পাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেই রাষ্ট্রকে সার্বভৌম বলা যায়। ম্যাকেঞ্জি বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রকেই সার্বভৌম বলা যায়। সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্র যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে

সার্বভৌম ক্ষমতার দুইটি দিক :
(১) স্বাধীনতা ও
(২) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতা

পারে। রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছাচারী হয়, তবে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণেরই ক্ষমতা। কিন্তু শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতার কোন সীমানির্দেশ করা থাকে না, রাষ্ট্রের ক্ষমতা সার্বভৌম। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার দুইটি দিক আছে, যথা—(১) অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং (২) বহিঃশক্তির অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি বা স্বাধীনতা।

৩। **রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of the State)ঃ** রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোন্ সময়ে, কি উপায়ে হইয়াছিল, সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বলিয়া সঠিক কিছুই বলা যায় না। তবে রাজনৈতিক দার্শনিকেরা (political philosophers) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(ক) ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ (Theory of Divine Origin of the State)ঃ এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজা তাঁহার প্রতিনিধি। এইজন্য রাজা তাঁহার কার্যের জন্য একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই দায়ী থাকেন, আর কাহারও কাছে নহে। রাজা ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন।

রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি

খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকেরা এই মতবাদের উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সেণ্ট পল (St. Paul) বলিয়াছেন : "রাজার শক্তি ঈশ্বর-প্রদত্ত। যে রাজশক্তিকে অমান্য করে, সে ঈশ্বরকেই অমান্য করে এবং ঈশ্বর তাহার পাপের জন্য শাস্তি প্রদান করেন।" এই ঐশ্বরিক মতবাদ অনুসারে রাজা কেবল যে প্রজাপালন করিবেন তাহা নয়, রাজা পাপের শাস্তি দিবারও অধিকারী। এক কথায়, রাজাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা। কারণ, তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন রাজকার্য-পরিচালনার জন্য।

Paul-এর মতবাদ

ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্টে তিনি যে-ঘোষণা করেন, তাহাতে এই মতবাদ তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাজাদিগকে প্রকৃতই ঈশ্বর বলা যায়। কারণ, ঈশ্বরের অনুকরণেই বা ঈশ্বরের মতই তাঁহারা শাসনকার্য চালাইয়া থাকেন। তিনি বলেন, রাজাদের মধ্যে

ঈশ্বরের যাবতীয় গুণই বর্তমান। ঈশ্বর সৃষ্টিও করিতে পারেন, ধ্বংসও করিতে পারেন, তাঁহার খুশিমত তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করিলে জীবকে মারিতেও পারেন, আবার বাঁচাইতেও পারেন; তিনিই সকলের বিচারক, কাহারও কাছে তিনি তাঁহার কোন কার্যের জন্য দায়ী নহেন। তিনি ইচ্ছামাত্র ক্ষুদ্রকে বৃহৎ, বৃহৎকে ক্ষুদ্র করিতে পারেন, তাঁহার কাছেই মানুষের দেহমন বাঁধা। জেম্‌সের মতে রাজাদেরও অনুরূপ ক্ষমতা আছে। তাঁহারা খুশিমত প্রজাদের চালাইতে পারেন; কাহাকেও বড়, কাহাকেও ছোট করিতে পারেন, প্রজাদের জীবনরক্ষা বা জীবননাশ করা রাজারই ইচ্ছাধীন। সকল প্রজার তিনিই বিচারক এবং কোন ক্ষেত্রেই ঈশ্বর ব্যতীত রাজারা আর কাহারও কাছে দায়ী নহেন।

প্রথম জেমসের মতবাদ

সমালোচনা: এই মতবাদ অযৌক্তিক বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে।

(১) রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, এই মতবাদ বিশ্বাস করা যায় না। রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান, ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান নহে। মানুষই আপন প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) এই মতবাদ রাজার হস্তে অসীম, অবাধ ক্ষমতা আরোপ করে। ফলে রাজা সহজেই স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন এবং প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে পারেন।

(৩) ঈশ্বর কখনও জনসাধারণ অত্যাচারিত, নিপীড়িত হোক, তাহা চাহিতে পারেন না। তিনি মঙ্গলময়, সর্বজীবের কল্যাণকারী। কাজেই রাজার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা আরোপ করিয়া তিনি জনসাধারণের অকল্যাণ করিতে পারেন না।

উপসংহার: প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তিই মানুষকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে, উন্নত জীবনযাপন করিবার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিতে বাধ্য করিয়াছে। মানুষের এই সামাজিক প্রবৃত্তি বা মিলিয়া-মিশিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রবৃত্তিকে নিঃসন্দেহে ঐশ্বরিক ইচ্ছা বলা যায়। কারণ, এই প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিয়াছে।

(খ) বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force): এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলপ্রয়োগের দ্বারা। কোন শক্তিশালী

লোক যখন শক্তির দ্বারা বা বলপ্রয়োগের দ্বারা দুর্বল লোকদিগকে আপন কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তখন আপন শক্তি আরও বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া জয় করে ও নিজ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করে। এইভাবেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। শক্তিই রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং শক্তির দ্বারা রাজা রাজ্যশাসন করেন ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধি করেন।

বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি

সমালোচনা: রাষ্ট্রের গঠনে এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ নাই, কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি যে কেবল শারীরিক শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

কেবল শারীরিক শক্তিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ বলিলে রাষ্ট্রের গঠনে মানুষের বিচারবুদ্ধির যে-স্থান আছে, তাহাকে অবজ্ঞা করা হয়। রাষ্ট্র তাহা হইলে কেবল পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, কেবল বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রকে রক্ষা করা যায় না, বরং তাহাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নেওয়া হয়।

উপসংহার: মানুষের বিচারবুদ্ধিই রাষ্ট্রের ভিত্তি। মানুষ আপন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য যখন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছে, রাষ্ট্রসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়াছে, তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। এইজন্যই গ্রীন (Green) বলিয়াছেন: "Will, and not force is the basis of the state."

(গ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (The Social Contract Theory):

ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে এই মতবাদ খুব প্রাধান্য লাভ করে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে সামাজিক চুক্তির ফলে। মানুষেরা চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্র-সৃষ্টির পূর্বে কাহারও কাহারও মতে সমাজে অত্যন্ত কলহ, মারামারি, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি লাগিয়াই ছিল, আবার, কাহারও মতে মানুষ তখন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিত। সেই বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অথবা শান্তিপূর্ণ জীবনে কোনরূপ অসুবিধার হাত হইতে অব্যাহতি-লাভের

চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি

জন্য মানুষরা চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এই মতবাদের যাহারা প্রবর্তক, তাঁহাদের নাম হবস্, লক ও রুশো। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য ২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সমালোচনা ঃ এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নহে।

প্রথমতঃ, এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কাজেই রাষ্ট্র যে সামাজিক চুক্তির ফলে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। অতি আদিম কালেও সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। মানুষ স্বভাবতঃই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও নিয়মনিষ্ঠ। নিয়মানুবর্তিতাই জগতে মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মানুষ এক সময় বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করিত -ইহা ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, যদি মানুষের তখন রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন ধারণাই না থাকিত, তাহা হইলে চুক্তির ফলে সেই ধারণার উদ্ভব হইতে পারিত না। কাজেই রাষ্ট্র চুক্তির ফলে গঠিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদের যাঁহারা সমর্থক, তাঁহাদের মতে প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) মানুষের সকল বস্তুর উপর স্বাভাবিক অধিকার ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্র ব্যতীত অধিকারের কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, এই মতবাদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় আপত্তি হইল যে, এই মতবাদকে স্বীকার করিলে সমাজে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকিবে। যখনই শাসকের ইচ্ছার সহিত জনসাধারণের ইচ্ছার অমিল হইবে, তখনই সমাজে বিদ্রোহ দেখা দিবার সম্ভাবনা হইবে।

উপসংহার ঃ তবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রাচীন ঐশ্বরিক মতবাদকে প্রতিরোধ করিয়াছে, রাষ্ট্রগঠনে জনসাধারণের ইচ্ছা ও মতবাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

(ঘ) বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) ঃ আধুনিক যুগে সকল মনীষীই এই বিষয়ে একমত যে, রাষ্ট্র ঈশ্বরের দ্বারা, বলপ্রয়োগের দ্বারা বা কোন চুক্তির ফলে সৃষ্ট হয় নাই, রাষ্ট্র সমাজবিবর্তনের ফল। পরিবার হইতে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং পরিবারই রাষ্ট্রের বা সমাজের প্রথম স্তর।

রাষ্ট্র বিবর্তন-প্রক্রিয়ার ফল

আরও পরে অনেকগুলি পরিবার মিলিত হইয়া গোষ্ঠীর (clan[১]) সৃষ্টি করিয়াছে। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ছিল এবং তাহারা একই পূর্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিত। একই গ্রামে অথবা নগরে তাহারা বসবাস করিত। একজন নেতা বা শাসক তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতেন ও নিয়মশৃঙ্খল বজায় রাখিতেন। এইজন্য গোষ্ঠীকে সমাজ বা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় স্তর বলা যায়।

গোষ্ঠীর উৎপত্তি

গোষ্ঠীর পরে আসিল বৃহত্তর জনগোষ্ঠী (tribe[২])। অনেকগুলি গোষ্ঠী মিলিত হইয়া বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা সমাজবিবর্তনের তৃতীয় স্তর। এই স্তরে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের আবির্ভাব হইয়াছিল।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি

বৃহত্তর গোষ্ঠীর জনসংখ্যা যখন কম ছিল, ধনসম্পদের পরিমাণ এত কম ছিল যে, চুরি-ডাকাতির ভয় ছিল না, খাদ্যশস্য-বণ্টনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না, তখন রাষ্ট্রীয় সংগঠন খুব স্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই, অস্পষ্ট আকারে বর্তমান ছিল। কিন্তু ইহাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা পরিবর্তিত ও উন্নত হইতে থাকে। ফলে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাদের সুবণ্টনের এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং তখনই রাষ্ট্র স্পষ্টাকারে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল। এই জনগোষ্ঠীর একজন নেতা বা প্রধান ব্যক্তি (chieftain) জনগণের সমস্ত বিষয়ের উপরে কর্তৃত্ব এবং সকলের রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

এইভাবে পরিবার বিবর্তিত হইতে হইতে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইল।

(১) "Clan is an exogamous division of a tribe, all the members of which are held to be related to one another and bound together by a common tie, which may be a belief in common descent from the same ancestor, real or mythical; or common possession of a totem, or it may be of some other kind"

(২) "A tribe is a group of a simple kind, nomadic or settled in a more or less definite locality, speaking a common dialect, with a rude form of government and capable of uniting for common action as in war."

(৪) **রাষ্ট্রগঠনের মূল উপাদান** (Factors in the Development of the State): রাষ্ট্রের বিবর্তন-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের গঠনে কতকগুলি বিষয় যথেষ্ট সাহায্য করিযাছে, যথা—(১) রক্তসম্পর্ক, (২) অর্থনৈতিক উপাদান, (৩) রাজনৈতিক উপাদান ও (৪) ধর্মীয় উপাদান।

(১) **আত্মীয়তা বা রক্তসম্পর্ক** (Kinship): মানুষে মানুষে আত্মীয়তার সম্পর্ক বা রক্তসম্পর্ক রাষ্ট্রের গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

আত্মীযতা বা রক্ত সম্পর্ক রাষ্ট্রগঠনে সহাযতা করিযাছে

রক্তসম্পর্কে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিবার একত্র হইয়া গোষ্ঠীর (clan) সৃষ্টি হইযাছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এই-সকল গোষ্ঠীর জনসাধারণ পরস্পরের সহিত রক্তসম্পর্কে সম্পর্কিত বলিযা বিচ্ছিন্ন হয নাই, একজন নেতা বা দলপতির অধীনে সুসংবদ্ধ হইয়া জীবনযাপন করিয়াছে। গোষ্ঠীর নেতার হস্তে পরিবারের পিতার ন্যায় কর্তৃত্ব অর্পণ করিযা তাঁহার অধীনে তাহারা নিরাপদে অবস্থান করিয়াছে। অনুরূপভাবে এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী একত্র হইয়া বৃহত্তর গোষ্ঠীর (tribe) সৃষ্টি হইযাছে এবং অধিকতর শক্তিশালী একজন দলপতির (chieftain) শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। এই দলপতিরাই রাষ্ট্রের প্রথম রাজা।

(২) **অর্থনৈতিক উপাদান** (Economic Factor): রাষ্ট্রগঠনের পরবর্তী উপাদান হইল অর্থনৈতিক। মানুষ তাহাদের জৈবিক প্রযোজন-

রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম ভিত্তি—অর্থনৈতিক উপাদান

সাধনের নিমিত্ত, যথা—খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা, যৌন আবেগ ইত্যাদির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইযা রাষ্ট্রের গঠনে সহাযতা করিযাছে। অ্যারিস্টটল বলিযাছেন যে, অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বাবলম্বী হইবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই পরিবারকে সম্প্রসারিত করিয়া গোষ্ঠীর, গোষ্ঠীকে সম্প্রসারিত করিয়া বৃহত্তর গোষ্ঠীর বা জাতির এবং জাতিকে সম্প্রসারিত করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

(৩) **রাজনৈতিক উপাদান** (Political Factor): রাজনৈতিক উপাদানও রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিযাছে। বৃহত্তর গোষ্ঠীর (tribe) সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য বিপদাপদ হইতে রক্ষার জন্য, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য দলপতি (chieftain) বা রাজার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

একজনের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহার শাসনব্যবস্থা ও নির্দেশ সকলে মানিয়া চলিতে লাগিল। প্রতিবেশী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে যাহাতে জনসাধারণ যুদ্ধ করিতে পারে, তাহার জন্য কাহাকেও কাহাকেও অনুরূপ শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়। এই সকল যুদ্ধ বা খণ্ডযুদ্ধ গোষ্ঠীসমূহকে আরও সঙ্ঘবদ্ধ করে এবং জটিলতর শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে ধীরে ধীরে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, জনসাধারণও অধিকতর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন জটিলতর আকার ধারণ করিয়াছে।

গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি

(৪) **ধর্মীয় উপাদান** (Religious factor)ঃ রাষ্ট্র-উৎপত্তির ইতিহাসে ধর্ম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম মানুষকে বিনয়ী, নম্র, ও কর্তব্যপরায়ণ করে। ধর্মই মানুষকে গুরুজনদের মান্য করিবার ও শ্রদ্ধা করিবার শিক্ষা দিয়াছে। গুরুজনদের শাসন বা নির্দেশ অমান্য করা ধর্মের চক্ষে পাপ। মানুষ ধর্মের নির্দেশে মাতাপিতাকে ভক্তি করে। রাজা বা দলপতির ক্ষেত্রেও ধর্ম অনুরূপ নির্দেশ দেয়। রাজার আদেশ সকলের শিরোধার্য, রাজার আদেশ অমান্য করিলে তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হয়। রাষ্ট্রের শাসনকে কেহ মান্য না করিলে বা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন না করিলে রাষ্ট্র কখনও গঠিত হইতে পারিত না। ধর্মই মানুষের মনে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জাগাইয়া রাষ্ট্র-গঠনে সাহায্য করিয়াছে।

ধর্ম রাষ্ট্রগঠনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে

এই সকল উপাদান দ্বারাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

(৫) **রাষ্ট্রের ভিত্তি স্বাভাবিক না কৃত্রিম? (Whether the Basis of the State is Natural or Artificial)ঃ রাষ্ট্র কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান**—কাহারও কাহারও মতে রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নহে, ইহা চুক্তির দ্বারা গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্র-উৎপত্তির পূর্বে সমাজে নানা অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার ফলে মানুষেরা মিলিত হইয়া শান্তিরক্ষার জন্য একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রের গঠন করে ও রাষ্ট্রের হস্তে শান্তিশৃঙ্খলা-রক্ষার ক্ষমতা অর্পণ করে। (১) হব্‌সের মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপ্রতিহত ও অপরিবর্তনীয় ছিল—রাষ্ট্র ছিল সর্বময় কর্তা। (২) লক্ অবশ্য রাষ্ট্রের এইরূপ চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় ক্ষমতা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রকে

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। কারণ, রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণেরই ক্ষমতা, জনসাধারণই রাষ্ট্রকে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। (৩) রুশো 'সাধারণ ইচ্ছা' (General will) বা জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছাকেই চূড়ান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং 'সাধারণ ইচ্ছা'র হস্তেই সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের মতে রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম সংগঠন।

রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র কৃত্রিম সংগঠন

জোর করিয়া মানুষের উপর এই শাসনযন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং সকলেই ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্বাভাবিক নহে। জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্যই এই সংগঠনের সৃষ্টি হইয়াছে।

কার্ল মার্কসের মতবাদ

কার্ল মার্কস মনে করেন, দাসশ্রেণীদের শোষণ করিবার জন্য অভিজাত-শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রের আইন-কানুন অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণার্থে রচিত হয় এবং দাসশ্রেণীদের তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়।

রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান: কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রকে কেবলই কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়—একথা বলিলে ভুল হইবে। শাসনযন্ত্র যে স্বাভাবিক, তাহা বিভিন্ন পশুশ্রেণীকে দেখিলেই বুঝা যায়। কোন কোন পশুশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক শাসন বর্তমান আছে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করে, একটি দলপতি সমস্ত দলকে সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং নিয়মলঙ্ঘনকারীকে শাস্তিও দেয়। সুতরাং মানব-সমাজেও যে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

পশুশ্রেণীর শাসনযন্ত্র

রুশোর মতবাদ

রুশো বলিয়াছেন: "মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত।" ("Man is born free, but everywhere he is in chains.") অর্থাৎ মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও সর্বত্রই সে সামাজিক শাসনের দ্বারা আবদ্ধ। কিন্তু সামাজিক নিয়মকানুন যদি জোর করিয়া জনসাধারণের উপর চাপানো হয়, তাহা হইলেই উহা মানুষের পক্ষে শাসন বলিয়া মনে হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের ভিত্তি স্বাভাবিক

প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নিয়মকানুন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃসৃত হইয়াছে। কোন কোন সামাজিক শাসন যে স্বাভাবিক, তাহা রুশোও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং রাষ্ট্রকেও সম্পূর্ণ কৃত্রিম সংগঠন বলা যায় না। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র

মানুষের প্রয়োজনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে।

জনসাধারণের কল্যাণকারী রাষ্ট্রকেই স্বাভাবিক বলা চলে

রাষ্ট্রীয় শাসন স্বাভাবিক কিনা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, এই শাসনযন্ত্র কতখানি জনসাধারণের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং কতখানি বলপ্রয়োগের জন্য বা কর্তৃত্ব করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। যদি রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রয়োজনসিদ্ধি করে, জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে, তবে সেই রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু বলপ্রয়োগই যদি রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাকে স্বাভাবিক বলা যায় না। অতএব এখন আমাদের আলোচনা করিতে হইবে বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের ভিত্তি কিনা।

(৬) **বলপ্রয়োগ মতবাদ*** (Theory of Force)**:** এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলপ্রয়োগের দ্বারা। শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতিকে শক্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করিয়াছে। পরে সেই রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য অধিকতর শক্তির প্রয়োজন হয়। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে—সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অপ্রতিহত। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকলকে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র প্রত্যেক নাগরিক মানিয়া লইতে বাধ্য। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগ করিতে হয়। সুতরাং পশুবলই রাষ্ট্রের ভিত্তি।

বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের ভিত্তি

সমালোচনা: বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকেই রাষ্ট্রের ভিত্তি বলা যায় না।

(১) রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের দ্বারা বাধা বন্ধন দূর করিতে হয়। পিতামাতা, শিক্ষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী—সকলকেই আপন আপন কর্তব্যপালন করিবার জন্য অল্পবিস্তর শাসনকার্য করিতে হয় ও ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু সেইজন্য শাসনক্ষমতাকে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি বলা যায় না।

(২) সেইরূপ রাষ্ট্রকেও শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য সময়

* রাষ্ট্রের উৎপত্তির মধ্যে 'বলপ্রয়োগ মতবাদ' দেখ।

সময় বলপ্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্র যখন জোর করিয়া অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা কোন কার্যভার সমাজের উপর চাপাইতে চায়, তখন বিদ্রোহের সূচনা দেখা দেয়। অতএব বল-প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী হয়।

(৩) বহিঃশক্তির আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান শাসকেরা সকল রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া থাকিতে চায়। রাষ্ট্র যদি অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে, তাহারাও অনুরূপ ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হয়।

(৪) গিলবার্ট বলেন, বলপ্রয়োগ করা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়মাত্র। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য জনকল্যাণমূলক কাজ করা। মানুষ যাহাতে পরস্পরের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে এবং পরস্পরের সহায়তায় যতদূর সম্ভব তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন করিতে পারে, রাষ্ট্র তাহার ব্যবস্থা করে। লাস্কি বলেন, রাষ্ট্রের কর্তব্য আছে বলিয়াই শক্তি আছে। তাহার কর্তব্যসাধনের নিমিত্ত শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৫) আইন-কানুন প্রয়োগ করিবার জন্য, ন্যায়বিচার করিবার জন্য, অন্যান্য জনহিতকর কার্য করিবার জন্য রাষ্ট্রকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হয় ও জনসাধারণের উপর, প্রয়োজন হইলে, তাহা প্রয়োগও করিতে হয়। কিন্তু তাহার জন্য পশুবলই রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান—এই কথা বলা যায় না।

(৬) ম্যাকেঞ্জি বলিয়াছেন, বলপ্রয়োগ মতবাদের প্রাধান্যলাভ করিবার কারণ জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence) নীতিকে মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। জীবনসংগ্রাম-নীতিতে বলে যাহারা শক্তিশালী, তাহারাই জীবন-যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকে, আর যাহারা দুর্বল, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁহার মতে এই জীবনযুদ্ধ জীবের জীবনের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করিয়া মানুষের ক্ষেত্রে এই নীতি কিছুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। (ক) মানুষের জীবনে যোগ্যতমের নির্বাচন সংগ্রামের দ্বারা করা যায় না। চেতনাবোধের দ্বারা বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা যোগ্যতা নির্বাচিত হয়। (খ) সংগ্রামের ফলে অনেক যোগ্যতম লোকের মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধ বা সংগ্রাম অনেক ভাল জিনিস নষ্ট করিয়া ফেলে। (গ) মানুষের মধ্যে তাহারাই যোগ্যতম, যাহাদের বিচারবুদ্ধি উন্নত, যাহারা জনকল্যাণ-

সাধনে উদ্বুদ্ধ। কেবল শারীরিক শক্তির দ্বারা মানুষের যোগ্যতার বিচার করা যায় না।

উপসংহার: বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকিলেই রাষ্ট্রকে উন্নত বলা যায় না, যে-রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য জনকল্যাণসাধন করা, তাহাই আদর্শ রাষ্ট্র। বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা সুসংগঠিত আদর্শ রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কেন না, রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা না থাকলে সার্বভৌমত্বের কোন মূল্য থাকে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকিলে তাহাকে রাষ্ট্র বলিয়াই অভিহিত করা যায় না। কিন্তু সার্বভৌমত্বের অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্র যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। তবে জনগণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র যে-কার্য করে, তাহা মানিয়া লইতে রাষ্ট্র জনসাধারণকে বাধ্য করিতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণে সহায়তা করা। জনসাধারণের কল্যাণার্থে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু বলপ্রয়োগ করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে।

৭। **আইন-প্রণয়নের অধিকারিরূপে রাষ্ট্র (The State as Law giver)**: Laws are "the general regulations enacted and enforced by some constituted authority." অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিধিবদ্ধ বাধ্যতামূলক নিয়মাবলীকে আইন বলা হয়। আইনের মধ্যে বাধ্যতামূলক একটা দিক আছে, আইন মানিতে সকলে বাধ্য। রাষ্ট্র তাহার সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা সকলকে আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে পারে।

রাষ্ট্র হইল আইন-প্রণয়নের কর্তা। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে, জনসাধারণ সেই আইন মানিয়া চলে। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া তাহার সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা সকলকে আইন মান্য করিতে বাধ্য করে এবং আইন-অমান্যকারীদের শাস্তি দেয়।

রাষ্ট্রীয় বিধি ও সামাজিক বিধি

রাষ্ট্রীয় বিধির সহিত সামাজিক বিধির তফাৎ আছে। রাষ্ট্রীয় আইন লিখিত ও সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা বিধিবদ্ধ, কিন্তু সামাজিক নিয়ম অলিখিত ও চিরাচরিত প্রথা। সামাজিক বিধি পালন না করিলে আমরা অনুতপ্ত অথবা সমাজের লোকের চক্ষে নিন্দনীয় হইতে পারি, অথবা সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতেও পারি। আর রাষ্ট্রীয় বিধি ভাল হোক, মন্দ হোক, তাহার নৈতিক

কোন মূল্য থাকুক বা না থাকুক, তাহা সকলেই মান্য করিতে বাধ্য। কারণ, আইন-অমান্যকারীদের রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে। আইনের পশ্চাতে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং প্রত্যক্ষ শাসন।

সুপরিচালিত রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার সর্বদা প্রয়োজন হয় না। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র যাহাতে তাহাদের আইন মানিতে বাধ্য করিতে পারে, তাহার জন্য রাষ্ট্রের শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। সুসংগঠিত রাষ্ট্রের শক্তি সবদাই রাষ্ট্রের কাযের অন্তরালে থাকে। শক্তির অপপ্রয়োগ করিলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তাহাই রাষ্ট্রের দুবলতা বলিয়া পরিগণিত হয়।

অবশ্য রাষ্ট্রের আইনের পিছনে জনমতের সমর্থন যদি না থাকে, তবে তাহা কার্যকর করা রাষ্ট্রের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়ায়। শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা জোর করিয়া আইন চাপানো হইলে তাহার ফল বিষময় হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় আইন ও জনমত

আইন প্রণয়ন করিবার সময়ও রাষ্ট্রকে জনমতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়। কোন আইন সম্পূর্ণ জনমতবিরোধী হইলে তাহা প্রণয়ন করা এবং কার্য্যকর করা সম্ভব হয় না। এই-সকল ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ করিতে গেলে তাহাতে ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

সুতরাং শক্তির প্রয়োজন কোথায় এবং কি ভাবে শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা রাষ্ট্রের বিচার করিয়া দেখা দরকার। ব্যক্তির বা কোন

শক্তির প্রযোজনীযতা

প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক সিদ্ধান্তকে কার্যকর করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে না পারিলে সেই সিদ্ধান্ত-গ্রহণের কোন অর্থ হয় না।

সমাজ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত বা আইন কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্রের শক্তির প্রয়োজন। রাষ্ট্র আইন-প্রণয়নের দ্বারা জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা করে। তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও তাহাদের বিভিন্ন স্বার্থসংরক্ষণে সাহায্য করে। এইজন্যই

আইন প্রণযনের প্রযোজনীয়তা

রাষ্ট্রকে পুলিশ-বাহিনীর ব্যবস্থা করিতে হয়। পুলিশ-বাহিনী না থাকিলে জনসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণে রাষ্ট্র সমর্থ হয় না। রাষ্ট্রের শাস্তি দিবার ক্ষমতা না থাকিলে আইন কেহই মান্য করিবে না, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রের শক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে রাষ্ট্র কখনও অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করিবে না। অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করিলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। রাষ্ট্রের উচিত ন্যায়পরায়ণ হওয়া। কোন অপরাধীর বিচারের সময় কাহারও প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব না করিয়া সুবিচার করা একান্তই প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে জনগণের স্বার্থসংরক্ষণ, শক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে।

ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজনীয়তা

৮। **সমাজ ও রাষ্ট্র** (Society and State): মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজেই জীবনযাপন করিয়া থাকে। আর রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়—সমাজজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং আগে সমাজ, পরে রাষ্ট্র; রাষ্ট্র সামাজিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। বার্কের মতে রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন। গ্রীক দার্শনিকরাও রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন মনে করিতেন। তাঁহাদের নগর-রাষ্ট্র ছিল সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই।

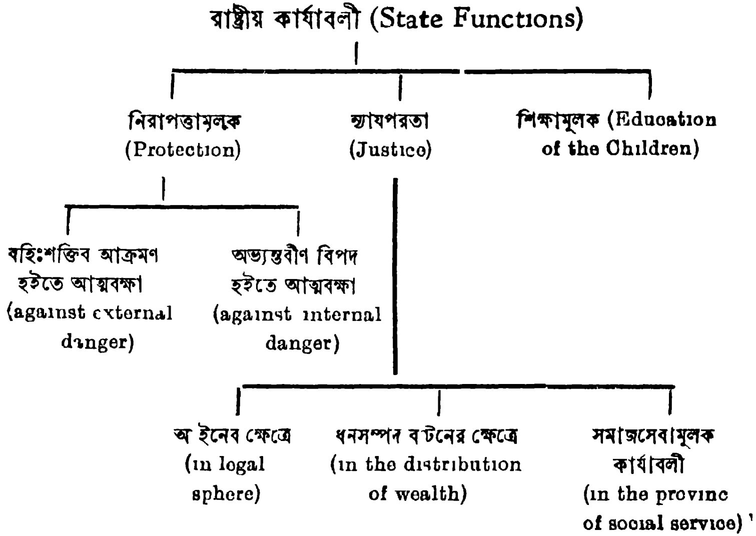
সম্পর্ক

আধুনিক যুগে আমরা রাষ্ট্রকে অন্যতম সামাজিক সংগঠন বলিয়া মনে করি। তবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য ইহা অন্যান্য সামাজিক সংগঠন অপেক্ষা বিশেষ মর্যাদালাভ করিয়াছে। তথাপি ইহা সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা। আবার সমাজ-জীবনে মানুষ এমন ব্যবহার করিতে পারে না, যাহা রাষ্ট্রের নীতির পরিপন্থী। রাষ্ট্রকেও সমাজ-জীবনের মূলনীতিগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সামাজিক নীতির মধ্যে যদি কিছু অনৈতিকতা বা অন্যায় থাকে, রাষ্ট্র তাহার পরিবর্তন-সাধনের চেষ্টা করে।

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকিলেও উহাদের কার্যাবলী ভিন্ন। সমাজে কতগুলি কার্য আছে, যাহার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হয়। আবার কতকগুলি কার্য সম্পাদন করিতে রাষ্ট্র অক্ষম। সমাজের পরিধি রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর। রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন। রাষ্ট্রকে তাহার কর্তব্যপালন করিবার জন্য সমাজের বিশেষ, কতকগুলি কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। পরপৃষ্ঠায় রাষ্ট্রের কার্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হইল।

পার্থক্য

৯। **রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of the State):** রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহু প্রকারের। আধুনিক যুগে জীবনের এমন কোন দিক নাই, যে-দিকে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না। রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতরূপে মোটামুটি ভাগ করা যায়:



সমাজের এই সকল বিভিন্ন কার্যের মধ্যে রাষ্ট্রের কতকগুলি বিশেষ কার্য আছে। কতকগুলি কার্যের জন্য রাষ্ট্রই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, কতকগুলি কার্যের পক্ষে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত এবং কতকগুলি কার্য সম্পাদন করিতে রাষ্ট্র অক্ষম। নিম্নে সেই-সব কার্যের বিশদ আলোচনা করা হইল:

(ক) **রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কাজ (Functions peculiar to the state):** সমাজে কতকগুলি কাজ আছে, যেগুলি বিশেষভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক সংসাধিত হইয়া থাকে।

(১) আইনকানুন প্রণয়ন করা, আইন মানিতে জনসাধারণকে বাধ্য করা, অপরাধীর বিচার করা, জনসাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়া, তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা, এক কথায়, জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বগ্রহণ করা রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

(২) রাষ্ট্রের এসকল কার্য ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

দেশের সকলেই যাহাতে সমান সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে, কাহারও প্রতি যেন পক্ষপাতিত্ব করা না হয়, তাহা লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৩) এতদ্ভিন্ন বস্তুর মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, ওজন, মাপ ইত্যাদি নির্ধারণ একমাত্র রাষ্ট্রই করিতে পারে।

(৪) আধুনিক রাষ্ট্রের আরও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেশকে নিরাপদে রাখা রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক কর্তব্য।

এক কথায়, রাষ্ট্রই সমাজের শৃঙ্খলার রক্ষক এবং অভিভাবক ("The state, in short, is the guarantor and the guardian of the public order."—Maciver)।

(খ) রাষ্ট্র সমাজের যে-সকল কার্য সাধন করিবার উপযোগী (Functions for which the state is well-adapted): সমাজে এমন কতকগুলি কাজ আছে, যেগুলি রাষ্ট্র ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

(১) পশুপক্ষী, মৎস্য, বন্য জীবজন্তুর অযথা সংহার বন্ধ করা রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

(২) প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ-সম্পদ, বন-সম্পদ ইত্যাদি রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রই একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান।

(৩) শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন আইনকানুন প্রণয়ন করিয়া শিল্পের প্রসার ও উন্নতিবিধান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৪) উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

(৫) জনসাধারণের নানা প্রকারের সুখ-সুবিধা, আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্রই উপযুক্ত। রাষ্ট্রের উচিত পার্ক, খেলার মাঠ ময়দান ইত্যাদি তৈয়ারি করা। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ও নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৬) এতদ্ব্যতীত শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা দর্শন ইত্যাদির উন্নতি বিধানে সহায়তা করিবার পক্ষে রাষ্ট্রই উপযুক্ত।

(গ) রাষ্ট্র যে-সকল কার্য সাধন করিবার উপযোগী নয় (Functions for which the state is ill-adapted): সমাজের কতকগুলি কার্য সম্পাদন করিবার পক্ষে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত।

(১) রাষ্ট্র সাধারণভাবে সকলের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে পারে না।

(২) সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, যথা—ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নিজেরাই তাহাদের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারে। তাহাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকা উচিত নয়।

(৩) শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষানীতি কিরূপ হইবে, তাহা নিরূপণ করা শিক্ষাবিদ্দের দায়িত্ব, রাষ্ট্রের তাহাতে হস্তক্ষেপ করার ফল বিষময় হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কেবল অর্থসাহায্য করিতে পারে, তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত হইবে না।

(৪) বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

(ঘ) **যে-সকল কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে রাষ্ট্র অসমর্থ** (**Functions which the state is incapable of performing**)**:** সমাজে কতকগুলি কাজ আছে, যাহা সম্পাদন বা নিয়ন্ত্রণ করিতে রাষ্ট্র অক্ষম।

(১) মানুষের নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রণ করা, ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বহির্ভূত।

(২) সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, মানুষের সংস্কার ইত্যাদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে না।

(৩) সমাজের যে-সকল আচার-ব্যবহার জনসাধারণের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্তনসাধন করা রাষ্ট্রের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। এই-সকল ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিলে সমাজে ভীষণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

১৪। রাষ্ট্র ও পরিবার (**The state and the family**) * **:** পরিবার ও রাষ্ট্র দুইটি স্বতন্ত্র সামাজিক সংগঠন। পরিবার রাষ্ট্রের অধীন হইলেও উহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

(১) রাষ্ট্র বিভিন্ন উপায়ে পরিবারকে সাহায্য করিয়া থাকে, পরিবারও সন্তানের জন্ম দিয়া, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাকে রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক করিয়া তোলে।

(২) পরিবারের অভ্যন্তরীণ গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রের

---

* পরিবার ৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।

কোন কর্তৃত্ব থাকে না। এই ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিবারকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকে।

(৩) কেবল পরিবারের মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, বা পরিবারের কেহ, যদি রাষ্ট্রের কাছে পারিবারিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করে বা বিচার প্রার্থনা করে, তখনই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে।

রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ না করিলেও পরোক্ষভাবে করে।

(১) পরিবার-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-প্রণয়নের দ্বারা পরিবারের গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্বে এই নিয়ম ছিল—কন্যারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না। এখন কিন্তু আইন হইয়াছে যে, পুত্র-কন্যা সকলেই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। এই ধরনের আইন-প্রণয়নের দ্বারা রাষ্ট্র পরিবারকে পরোক্ষভাবে পরিচালনা করে।

(২) প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র পরিবার ভাঙ্গিয়া দিতেও পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদ-আইন প্রণয়নের দ্বারা অনেক পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। রাষ্ট্র কিন্তু সাধারণতঃ এই-সকল আইন-প্রণয়ন-কালে সমাজের প্রচলিত নীতি ও বিশ্বাস, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে।

পরিবার ও রাষ্ট্রের বিরোধ

পরিবার ও রাষ্ট্র উভয়ই আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, সময় সময় তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। অনেক সময় পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে গিয়া রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যকে অবহেলা করিতে হয়। এইজন্য প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের পারিবারিক জীবনযাপন হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ যদি আপন পারিবারিক কাজে বেশী মগ্ন থাকে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের কার্য অবহেলিত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র ও পরিবারের মধ্যে কোন বিরোধ নাই

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিবারের সহিত রাষ্ট্রের কোন বিরোধ নাই। পরিবারের প্রধান কাজ শিশুর লালন-পালন করা, তাহাকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তোলা, তাহার আত্মবিকাশের পথ সুগম করা। রাষ্ট্রেরও এই ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। রাষ্ট্রের কাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তোলা। রাষ্ট্র এই কার্য-সম্পাদনের ভার

পরিবারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। শিশুর শিক্ষার ভার পিতামাতার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। শৈশব-কাল অতীত হইয়া গেলে তাহার শিক্ষার ভার ধীরে ধীরে রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে।

পরিবার যদি সুপরিচালিত হয়, তবে রাষ্ট্রের সহিত তাহার কোন বিরোধ দেখা দেয় না। পরিবার আপন কর্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া রাষ্ট্রকে বরং সাহায্যই করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক গড়িয়া তুলিবার জন্য পরিবারকে একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-রূপে গণ্য করা যায়।

১১। রাষ্ট্র ও শিক্ষা (The State and Education): রাষ্ট্রের প্রধান কার্য শাসন-পরিচালনা। শিশুর চিরপরিবর্তনশীল মনের সহিত যোগাযোগরক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয় না। অথচ শিক্ষানীতি সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাহাকে অবহেলা করিলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিবে। শিক্ষা দ্বারা ভবিষ্যৎ নাগরিক ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ পরিচালকবৃন্দ গড়িয়া উঠিবে, দেশ উন্নত হইবে। এইজন্য শিক্ষানীতির উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

শিক্ষার গুরুত্ব

কিন্তু শিক্ষানীতি গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নয়। শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে। শিশুমনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করিবার জন্য কিরূপ শিক্ষানীতির প্রয়োজন, তাহা তাঁহারাই ভাল বুঝিতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষানীতির গঠন ও পরিচালনার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করা এবং তাঁহাদের কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা।

শিক্ষক ও শিক্ষানীতি

(১) অর্থসাহায্য ব্যতীত শিক্ষানীতি সফল করা সম্ভব নয়। এইজন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়া তাহাদের নীতিকে কার্যকরী করিতে সহায়তা করা। (২) ইহা ছাড়া প্রয়োজনীয় পুস্তক, জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণকে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রের সাহায্য করা প্রয়োজন। (৩) উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ারি করিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। (৪) দরিদ্র ছাত্রদের অর্থসাহায্য করিয়া রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করা। (৫) মাঝে মাঝে রাষ্ট্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন

শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তব্য

করিয়া তাহাদের কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা দেখিবে ও সহানুভূতির সহিত শিক্ষাবিদদের কার্যের বিচার করিবে।

কিন্তু খুব বেশী কর্তৃত্ব করা রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত নয়। শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র কোন নির্দেশ দিলেও তাহা প্রাণহীন হয়। ম্যাকেঞ্জির মতে রাষ্ট্রের উচিত রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারি করিয়া দেওয়া, অভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা রাষ্ট্রের উচিত নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে শিক্ষাকার্যে সহায়তা করিবে, প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিবে না।

১২। রাষ্ট্র ও নীতিবোধ (The State and Morality) :

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে রাষ্ট্রের সহিত নীতিবোধের গভীর সম্পর্ক বর্তমান। বহুকাল হইতেই নৈতিক আদর্শই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ভিত্তি ছিল।

প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলি প্রথমে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও নৈতিক আদর্শের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের সহিত নীতিবোধের কোন সম্পর্ক নাই, রাষ্ট্রের আদর্শ সুবিধাবাদ। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সর্বদা নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না-ও হইতে পারে। আবার, অনেক নৈতিককার্যও বে-আইনী হইতে পারে। এইজন্য অনেকেই মনে করেন, নৈতিকতার স্থান রাষ্ট্রের বাহিরে।

ম্যাকিয়াভেলির মত

কিন্তু এই মতবাদ সমর্থন করিতে পারা যায় না। রাষ্ট্রের সহিত নীতিবোধের গভীর সম্পর্ক থাকা বিশেষ দরকার। রাষ্ট্রের সকল কার্যের পিছনে নৈতিক সমর্থন থাকা প্রয়োজন।

(১) শাসনকার্য ন্যায়পরতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে আদর্শ রাষ্ট্র বলা যায়। অনৈতিক কোন কার্যকে রাষ্ট্র সমর্থন করিতে পারে না।

(২) রাষ্ট্রের আদর্শ সুবিধাবাদ হইলেও নীতিবোধের সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই, বরং গভীর সম্পর্ক আছে। আইনপ্রণয়ন করিবার সময়, অপরাধীর বিচার করিবার সময়, অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবার সময় রাষ্ট্রকে ন্যায়পরায়ণতার সহিত গভীর সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়।

(৩) রাষ্ট্র যদি অতিরিক্ত সুবিধাবাদী হয় বা নিজ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সুবিধামত যখন যে নীতি ইচ্ছা গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে আদর্শ রাষ্ট্র বলা যায় না।

(৪) অনেক সময় রাষ্ট্র আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে,

"necessity knows no law" এবং এইভাবে শক্তি-প্রয়োগের দ্বারা নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে রাষ্ট্রের নাগরিকরাও রাষ্ট্রকে অনুসরণ করিবে এবং তাহারাও যখন যাহা প্রয়োজন মনে করিবে, তখন তাহা সাধনের জন্য কোন নীতি রক্ষা করিবে না।

(৫) রাষ্ট্র যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত অনৈতিক ব্যবহার করে, তাহা হইলে নাগরিকদিগকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রকে শক্তিশালী হইতে হইবে। কিন্তু সর্বদা শক্তিপ্রয়োগ করা অত্যন্ত অন্যায় এবং অনৈতিক। বুদ্ধিমান্ রাষ্ট্রের উচিত, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

(৬) রাষ্ট্র যদি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের নাগরিকরাও নৈতিক কার্যে উৎসাহিত হইবে। নাগরিকদিগের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করাও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। কেহ কেহ মনে করেন, নাগরিকদিগের নৈতিক উন্নতিসাধন করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। কিন্তু এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। রাষ্ট্র অবশ্য নৈতিক উন্নতিসাধনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করিতে পারে না, তবে পরোক্ষভাবে নৈতিক উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে।

(৭) অ্যারিস্টটল রাজনীতি ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। রাষ্ট্রের কাজ শিক্ষাব্যবস্থায় সহায়তা করা এবং শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষানীতির সম্পর্কে কিছু বলিতে পারে না, বলা উচিতও নয়। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির এ-বিষয়ে যথেষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য ইহাদিগকে রক্ষা করা ও সাহায্য করা, যাহাতে তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারে।

(৮) রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া বিশেষ বিশেষ দুর্নীতি দূর করিতে পারে। যেমন, অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করা প্রভৃতি দুর্নীতিগুলি রাষ্ট্র আইনের দ্বারা বন্ধ করিবে। সাধারণভাবে রাষ্ট্র নাগরিকদিগকে বিপদ ও লোভ হইতে রক্ষা করিবে। এইভাবে রাষ্ট্র জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক উন্নতি-লাভে বাধ্য করিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে নৈতিক উন্নতিসাধনে সহায়তা করিতে পারে।

(৯) রাষ্ট্রের উচিত সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাহাতে

জনসাধারণের পক্ষে নৈতিক জীবনযাপন করা সম্ভবপর হয়। অভাব-অনটনই লোককে অনৈতিক পথে ঠেলিয়া দেয়। রাষ্ট্রের উচিত জন-সাধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও অর্থের অভাব দূর করা।

(১০) তবে রাষ্ট্রকে ইহাও দেখিতে হইবে, নৈতিকতা যেন বাধ্যতামূলক না হয়। কারণ; বাধ্যতামূলক নীতিবোধকে নৈতিক উন্নতি বলা যায় না। নৈতিক বোধ মানুষের ভিতর হইতে না জাগিলে জোর করিয়া নৈতিক উন্নতি সাধন করা যায় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উচিত মানুষের মধ্যে নৈতিক বোধ জাগ্রত করা।

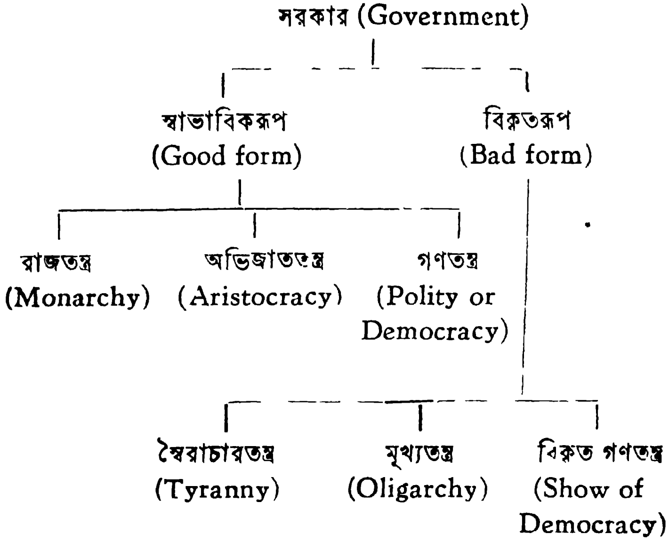
আধুনিক কালে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এইজন্য রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে বিভিন্ন আইন-প্রণয়নের দ্বারা জনগণের নৈতিক মান-উন্নয়নে সহায়তা করিয়া থাকে।

১৩। **সরকারের বিভিন্ন রূপ** (Forms of Goverment): গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনুসারে সরকারকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—(১) স্বাভাবিক ও (২) বিকৃত। যে-সরকারের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের কল্যাণ করা, তাহাকে তিনি স্বাভাবিক বলিয়াছেন, আর যে-সরকারের উদ্দেশ্য শাসকশ্রেণীর স্বার্থসাধন, তাহাকে তিনি বিকৃত আখ্যা দিয়াছেন।

আবার, শাসকবর্গের সংখ্যা অনুসারে সরকারকে তিনি তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—(১) রাজতন্ত্র (Monarchy), (২) অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) ও (৩) গণতন্ত্র (Democracy)। একজন লোকের উপর যদি ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তাহাকে বলা হয় রাজতন্ত্র ; কয়েক জনের হস্তে যদি শাসনভার ন্যস্ত থাকে, তাহাকে বলা হয় অভিজাততন্ত্র ; আর যদি বহুজনের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তাহাকে বলা হয় গণতন্ত্র। এই রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র হইল সরকারের স্বাভাবিক রূপ। তাহার মতে ইহাদের বিকৃত রূপ হইল যথাক্রমে স্বৈরাচারতন্ত্র, মূর্খতন্ত্র ও জনতাতন্ত্র। আদর্শভ্রষ্ট সরকারকেই তিনি বিকৃত সরকার বলিয়াছেন। তাঁহার মতে নৈতিক ভিত্তির উপরে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, রাষ্ট্রের আদর্শ হইল সুন্দর জীবন সম্ভব করা, সর্বসাধারণের কল্যাণ করা।

অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ

নিম্নে অ্যারিস্টটল-প্রদত্ত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের একটি নক্‌শা দেওয়া হইল :

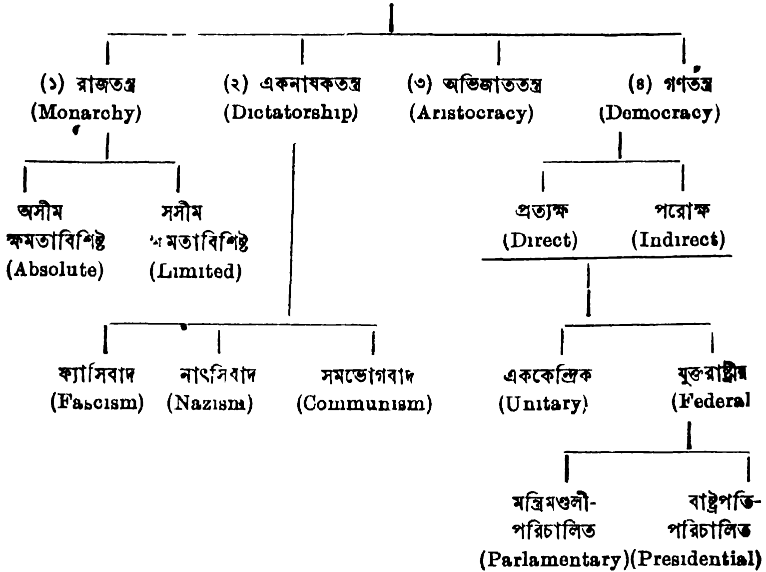


অ্যারিস্টটল-বর্ণিত সরকারের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে :

(১) অ্যারিস্টটল গণতন্ত্রকে সরকারের বিকৃত রূপ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আধুনিক যুগে গণতন্ত্রই সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া পরিগণিত হয়।

(২) আধুনিক যুগে অনেক দেশে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মিশ্র রূপ দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয়প্রকার সরকারই বর্তমান। অবশ্য, রাজা শীর্ষস্থানে অবস্থান করিলেও রাজার কোন ক্ষমতা নাই। প্রকৃতপক্ষে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এইজন্য অ্যারিস্টটল-প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগকে আদর্শ বিভাগ বলিয়া অনেকে মনে করেন না।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ : যাহা হোক, আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের সরকার প্রচলিত আছে। মোটামুটিভাবে আধুনিক সরকারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, পরপৃষ্ঠায় একটি ছকে তাহা দেখানো হইল।



সরকারকে মোটামুটি চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) রাজতন্ত্র, (২) একনায়কতন্ত্র, (৩) অভিজাততন্ত্র ও (৪) গণতন্ত্র।

(১) প্রাচীনকাল হইতেই **রাজতন্ত্র** প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। রাজতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতা রাজার হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজার পরবর্তী বংশধরেরাই রাজত্ব বা শাসনভার লাভ করিয়া থাকে।

রাজতন্ত্রের প্রকারভেদ

রাজতন্ত্র আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট (absolute) ও সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট (limited)। অসীমক্ষমতাবিশিষ্ট রাজতন্ত্রে রাজাই সর্বময় কর্তা। রাজার হস্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। আধুনিক যুগে এইরূপ সরকার খুব কমই দেখা যায়। বর্তমানে যে-সকল রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা সসীমক্ষমতাবিশিষ্ট রাজতন্ত্র। কারণ, রাজার হস্তে কোন ক্ষমতা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা থাকে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদের উপর। ইংল্যাণ্ডে আমরা এইরূপ সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজতন্ত্র দেখিতে পাই।

রাজতন্ত্রের দোষ—কিন্তু এইরূপ সরকারের অসুবিধার কথা সর্বজনবিদিত। এক সময়ে হয়ত ইহার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে ইহা

নিকৃষ্টতম সরকার বলিয়া পরিগণিত। তাহার কারণ—প্রথমতঃ, রাজা সর্বদা শ্রেষ্ঠ গুণবান্ ব্যক্তি না-ও হইতে পারেন। রাজা যদি স্বেচ্ছাচারী হন, তাহা হইলে প্রজাদের উপর নানা অত্যাচার, অবিচার চলিতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনকার্য-পরিচালনার ব্যাপারে জনসাধারণ কোন• সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, রাজতন্ত্র জনসাধারণের ইচ্ছার কোন মূল্য দেয় না। রাজার খেয়াল-খুশিমত রাজকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। এইরূপ সরকার খুব বেশীদিন চলিতে পারে না।

একনায়কতন্ত্র ও তাহার প্রকারভেদ

(২) **একনায়কতন্ত্র** বলিতে সেই শাসনব্যবস্থাকেই বুঝায়, যেখানে একজন দলীয় নায়ক সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়। দলগত নীতিই এইরূপ শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। একনায়কতন্ত্রের মতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে সকলেই অবনত মস্তকে মানিয়া লইবে। রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু থাকিবে না। একনায়কতন্ত্রে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর কোন স্থান নাই। এমন কি, শাসনব্যবস্থায় নায়কের নিজস্ব দল ব্যতীত অন্য কোন দল থাকিতে পারিবে না। এইভাবে একনায়কতন্ত্র হইতে সামগ্রিক (totalitarian) রাষ্ট্র রূপ পরিগ্রহ করে। একনায়কতন্ত্র আবার বিভিন্ন দেশে তিন প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে: (১) **ফ্যাসিবাদ** (Fascism), (২) **নাৎসিবাদ** (Nazism) ও **সমভোগবাদ** (Communism)।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা চরম আকার ধারণ করে। গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে এই-সকল সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যুদ্ধোত্তরকালীন সমস্যার সমাধান করিবার জন্য ইটালীতে ফ্যাসিবাদ, জার্মানীতে নাৎসিবাদ ও রাশিয়াতে সমভোগবাদের উদ্ভব হয়। এই-সকল একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ করা হয়। যুদ্ধ বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এইরূপ সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও শান্তিকালে একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করা যায় না।

অভিজাততন্ত্র ও তাহার অসুবিধা

(৩) **অভিজাততন্ত্র** বলিতে পূর্বে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন বুঝাইত। অ্যারিস্টটলের মতে অভিজাততন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। কিন্তু আধুনিক কালে কেবলমাত্র কয়েকজনের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করা কেহ পছন্দ করে না। প্রথমতঃ, শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের নির্বাচন করা সহজ নহে। দ্বিতীয়তঃ, মুষ্টিমেয়

কয়েকজনের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত থাকিলে সরকার অ্যারিস্টটল-বর্ণিত বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া মুখ্যতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। কারণ, যোগ্য ব্যক্তিও ক্ষমতার অধিকারী হইলে তাহার অপব্যবহার করে ও স্বৈরাচারী হইয়া উঠে। জনকল্যাণসাধন অপেক্ষা আপন স্বার্থসিদ্ধি করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠে।

তৃতীয়তঃ, অভিজাততন্ত্রেও জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

চতুর্থতঃ, সাধারণ লোকেরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে না পারার ফলে সুযোগ্য শাসক গড়িয়া উঠিতে পারে না। জনসাধারণ শাসনকার্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। এই অবস্থায় ভবিষ্যৎ শাসকবৃন্দ শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে উৎসাহ বা শিক্ষা কিছুই লাভ করে না।

এই-সকল দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, গণতন্ত্রই একমাত্র শাসন-ব্যবস্থা যেখানে জনসাধারণের ইচ্ছার মূল্য দেওয়া হয় এবং জনসাধারণ শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) **গণতান্ত্রিক** শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের উপর শাসনভার ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসনকার্য চালাইয়া থাকে। গণতন্ত্র সম্পর্কে আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন, এই সরকার জন-সাধারণের সারকার, জনসাধারণের জন্য এবং জনসাধারণের দ্বারা গঠিত সরকার ("A government of the people, for the people and by the people.")। গণতন্ত্রের আদর্শ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আদর্শকে কার্যকর করাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। ইহাই একমাত্র শাসনব্যবস্থা, যাহা জনগণের প্রকৃত কল্যাণকামী।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

গণতন্ত্র আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—**প্রত্যক্ষ** ও **পরোক্ষ**। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। অ্যারিস্টটলও এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে স্বাভাবিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রে এইরূপ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণের বিশেষ কতকগুলি অধিকার থাকে, যেমন—(১) গণনির্দেশাধিকার (referendum), অর্থাৎ আইন-প্রণয়ন

করিতে হইলে আইনের খসড়া জনসাধারণের কাছে তাহাদের মতামতের জন্য প্রেরিত হয় এবং জনসাধারণের অধিকাংশ কর্তৃক খসড়াটি অনুমোদিত হইলে, তাহা আইনে পরিণত হয়। (২) জনসাধারণের আইন-প্রস্তাবের অধিকার (initiative); অর্থাৎ জনসাধারণ যদি কোন আইন-প্রণযন করা প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া আইনসভার কাছে প্রেরণ করে। আইনসভা আইনের খসড়াটি বিবেচনা করিয়া আইনে পরিণত করে। (৩) জনসাধারণের মন্ত্রিসভা-প্রত্যাহারের অধিকার (Recall), অর্থাৎ যদি মন্ত্রিমণ্ডলী জনসাধারণেব ইচ্ছানুরূপ কার্য পরিচালনা না করে, তাহা হইলে জনসাধারণেব এই মন্ত্রিসভাকে প্রত্যাহার কবিবার এবং পুনর্নির্বাচনেব ব্যবস্থা করিবাব অধিকাব বর্তমান থাকে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

এখানে জনসাধারণ বলিতে যাহাদের ভোটাধিকার আছে, সেইরূপ নির্বাচকমণ্ডলীকেই বুঝায়। সুইজারল্যাণ্ডে এইরূপ প্রত্যক্ষ-গণতন্ত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু এইরূপ গণতন্ত্র ক্ষুদ্র-রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব, বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়।

এইজন্য বর্তমান যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রচলন হইয়াছে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, সেই দল নির্দিষ্ট কালের জন্য শাসনভার গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইলে আবার নূতন নির্বাচন হয়। আমাদের দেশে এইরূপ গণতন্ত্র প্রচলিত আছে।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের দোষ

কিন্তু এইরূপ গণতন্ত্রও ত্রুটিহীন নহে। কারণ, প্রথমতঃ, অজ্ঞ জনসাধারণ সুযোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হইবার পরে সর্বদা জমসাধারণের ইচ্ছার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না। তৃতীয়তঃ, নির্বাচিতদের পক্ষেও সদাপরিবর্তনশীল জনমতের সহিত তাল রাখিয়া চলা সবসময় সম্ভবপর হয় না। এই-সকল কারণে অনেক রাষ্ট্র জনগণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া অর্থাৎ গণ-নির্দেশাধিকার, গণ-প্রস্তাব-অধিকার ও মন্ত্রিসভা-প্রত্যাহারের অধিকার বজায় রাখিয়া পরোক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনা করিয়া থাকে।

যাহা হোক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় প্রকারের গণতান্ত্রিক সরকারেরই সর্বাপেক্ষা বড় **গুণ** হইল ইহার আদর্শ।

প্রথমতঃ, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী-ই গণতান্ত্রিক সরকারের মূল নীতি।

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণ রাজকার্য-পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের মতামতই গণতান্ত্রিক সরকারে সর্বাগ্রে গ্রাহ্য হয়। জনকল্যাণ করা এই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

চতুর্থতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়া থাকে, জনসাধারণের দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের কতকগুলি **দোষ** আছে, যেমন—(১) গণতন্ত্র অজ্ঞ জনসাধারণের সরকার। অজ্ঞ, অশিক্ষিত দেশে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। (২) গণতন্ত্রে যোগ্য ও গুণী ব্যক্তিরা অবহেলিত হয়। প্রকৃত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে না। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরাই নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়। (৩) গণতান্ত্রিক সরকার রাজনৈতিক দলের সরকার। যে-দল শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে, তাহাদের প্রধান দৃষ্টি থাকে আপন দলের স্বার্থসিদ্ধি। জনকল্যাণ-সাধন গৌণ হইয়া দাঁড়ায়। (৪) গণতান্ত্রিক সরকার-পরিচালিত রাষ্ট্রে সঙ্গীত, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদির উন্নতিতে সরকার উৎসাহ প্রদান করে না, সুতরাং তাহাদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

উপসংহারঃ তথাপি গণতান্ত্রিক সরকারই আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সরকার। ইহাই প্রকৃত জনকল্যাণকারী আদর্শ সরকার। শিক্ষিত দেশে গণতন্ত্র সফলই হইয়া থাকে। এইরূপ রাষ্ট্রে জনসাধারণ তাহাদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করিয়া গণতন্ত্র সাম্যভাবের প্রবর্তন করে। গণতন্ত্রের সামান্য দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহাকেই শ্রেষ্ঠ সরকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকার আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়।

একেন্দ্রীয় সরকার

এককেন্দ্রিক—শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই সমস্ত দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। প্রাদেশিক সরকার থাকিলেও তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকে না। ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে এইরূপ

এককেন্দ্রিক সরকার বলা যায়। এইরূপ সরকারকে খুব সুদক্ষ হইতে হয়। তাহা না হইলে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য অবহেলিত হইবার আশঙ্কা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে না। প্রদেশের শাসনকার্যের ভার প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। প্রাদেশিক কার্যাবলীর কতকগুলি ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারই সর্বেসর্বা। অবশ্য, প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে এবং কতকগুলি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়। যাহা হোক, একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বহু প্রাদেশিক সরকার বর্তমান থাকে। আমেরিকার শাসনব্যবস্থাকে এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও এই ধরনের যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকার বিদ্যমান। একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

বৃহৎ দেশের শাসনকার্য-পরিচালনার ব্যাপারে এইরূপ সরকারই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকার ফলে সমস্ত দেশের মধ্যে ঐক্যভাব বজায় রাখা সম্ভবপর হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আবার দুই প্রকারের হইতে পারে: **মন্ত্রিমণ্ডলী-পরিচালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার।** মন্ত্রিমণ্ডলী-পরিচালিত সরকারে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ হইতে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় এবং সেই মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে শাসনকার্যের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। এই-সকল মন্ত্রিমণ্ডলী লোকসভা (Parliament) বা আইনসভার (Legislature) কাছে তাহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকে। এইজন্য এইরূপ সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার (responsible government) বলা হয়। ভারতের সরকার এইরূপ মন্ত্রিমণ্ডলী-পরিচালিত সরকার। ভারতেও একজন রাষ্ট্রপতি থাকেন বটে, শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারাই পরিচালিত হয়।

মন্ত্রিমণ্ডলী-পরিচালিত সরকার

আর, রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকারে রাষ্ট্রপতিই সর্বেসর্বা। রাষ্ট্রপতি জন-সাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচিত হন এবং তিনি আইনসভার কাছে তাঁহার কার্যের জন্য দায়ী থাকেন না। শাসনকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একদল মন্ত্রী থাকেন, কিন্তু তাঁহারাও

রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার

আইনসভার কাছে দায়ী নহেন। আমেরিকায় এইরূপ রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রচলিত আছে।

এইভাবে সরকারেব বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন দেশে বর্তমান। তবে যে-সরকার সুষ্ঠুভাবে সকলকার্য সম্পাদন করিতে পারে, যে-সরকারের আদর্শ—জনসাধারণেব কল্যাণ করা, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যাহার আদর্শ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী, সেই সরকারই আদর্শ সরকার। কারণ, শাসন যিনিই বা যাঁহারাই করুন, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকা চাই, জনসাধাণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হওয়া চাই। যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তি হইবেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন দাযিত্বপূর্ণ কার্যে সুদক্ষ হইবেন। দেশের ও দশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন তাঁহাদের একমাত্র আদর্শ হইবে। রাষ্ট্র জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, ইহাই রাষ্ট্রের প্রকৃত, স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

প্রকৃত আদর্শ সরকাব

১৪। **রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ** (**Theories of the nature of the State**):

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রধান মতবাদগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) **জৈব মতবাদ বা ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট রাষ্ট্র** (**Organismic Theory of the State or the state as personal**): এই মতবাদে বলা হয়, রাষ্ট্রের প্রকৃতি জীবদেহের প্রকৃতিরই অনুরূপ। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত জীবেব যেরূপ সম্পর্ক, রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিব সহিত বাষ্ট্রের অনুরূপ সম্পর্ক বর্তমান। জীবদেহ যেরূপ জীবকোষের দ্বাবা গঠিত, রাষ্ট্রও সেইরূপ ব্যক্তির দ্বাবা গঠিত। হব্‌স্ ও রুশো এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। হব্‌স্ রাষ্ট্রকে লিভিয়াথান্ নামে এক অতিকায় সামুদ্রিক জীবের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বাষ্ট্রের সহিত জীব দেহেব তুলনা

জার্মান দার্শনিক ব্লান্‌ৎস্লি জৈব মতবাদের চরম সমর্থক। ব্লান্‌ৎস্লি রাষ্ট্রকে পুরুষ ও গীর্জাকে নারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্‌সার রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। রাষ্ট্রকে তিনি একটি জীবন্ত প্রাণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

ব্লান্‌ৎস্লি ও স্পেনসারের মতবাদ

সমালোচনা ঃ নানাকারণে জৈব মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে ঃ (১) রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও সেই সাদৃশ্য বাহ্য। বাহ্য সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া উভয়ের অভিন্নতা কল্পনা করা যায় না। (২) ব্যক্তি ও জীবকোষের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। জীবদেহ ব্যতীত জীবকোষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে। (৩) এতদ্ভিন্ন ব্যক্তির জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যুর সঙ্গে রাষ্ট্রের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর তুলনা করা যায় না। হব্‌হাউস তাই বলিয়াছেন, রাষ্ট্রকে প্রাণিরূপে কল্পনা করা অনুচিত। (৪) ম্যাকেঞ্জি মনে করেন, রাষ্ট্রের সহিত পুরুষের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিতে পারে, যেমন ব্যক্তির মত রাষ্ট্রও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিয়া থাকে। ব্যক্তিকে যেমন তাহার কাজের জন্য দায়ী করিতে পারা যায়, রাষ্ট্রেরও শাসন-কার্য-পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এই সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা সঙ্গত নহে। (৫) উপরন্তু রাষ্ট্রের কাজের জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। কোন কোন রাষ্ট্রে রাজা দায়ী হন, কোন কোন রাষ্ট্রে সকল কার্যের দায়িত্ব থাকে প্রধানমন্ত্রীর উপর। আবার যেখানে একাধিক ব্যক্তির উপর শাসনভার অর্পিত থাকে, সেই রাষ্ট্রের কার্যের জন্য একাধিক ব্যক্তি দায়ী থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকবর্গের কার্যাবলী জনমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। এইজন্য রাষ্ট্রকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা কোনমতেই সঙ্গত নহে।

(খ) আদর্শবাদ (Idealistic theory of the State or the State as Superpersonal) ঃ জার্মান দার্শনিক হেগেল এই আদর্শবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু হেগেলের পূর্বে কাণ্টও রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের দান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আদর্শবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করে হেগেলের হস্তে।

হেগেলের মতবাদ

হেগেলের মতে রাষ্ট্র হইল পৃথিবীতে স্বর্গীয় আদর্শ ও ভাবধারার প্রতিরূপ-বিশেষ। তাঁহার মতে ব্যক্তির সর্ব-প্রধান কর্তব্য রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। রাষ্ট্রকে তিনি ঐশ্বরিক অবদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই মতবাদে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় না। ম্যাথিউ আর্নল্ডও এই মতের সমর্থক ছিলেন। তাঁহার মতে ব্যক্তির আদর্শসত্তার সমষ্টিই হইল রাষ্ট্র। ইংরেজ দার্শনিক ডাঃ বোসাঙ্কে মনে করিতেন, রাষ্ট্র

জাতির সমষ্টিগত প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের বিরোধী ব্যক্তিরা তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় না, অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়। বোসাঙ্কের এই মত সকল রাষ্ট্রে প্রযোজ্য নহে, কেবল আদর্শ রাষ্ট্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। তবে বোসাঙ্কে ইহাও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বাধাবিঘ্ন দূর করিবে। যদিও তিনি রাষ্ট্রকে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন, রাষ্ট্রের আদর্শের জন্য ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রয়োজন হইলে বিসর্জন দেওয়ার কথা বলিয়াছেন, তথাপি সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লোপসাধন করাকেও তিনি সমর্থন করেন নাই।

আর্নল্ড ও বোসাঙ্কের মতবাদ

ইংরেজ দার্শনিক গ্রীনও হেগেলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারেন নাই। হেগেলের আদর্শবাদ হইতে ট্রিটস্‌কের (Treitschke) যুদ্ধবাদের উদ্ভব হয়। ট্রিটস্‌কের মতে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হওয়া রাষ্ট্রের পাপের চিহ্ন। সুতরাং রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য রাষ্ট্রকে যুদ্ধ করিয়া অপর রাষ্ট্র নিজ অধীনে আনিতে হইবে। যুদ্ধ করা রাষ্ট্রের পক্ষে পাপ নহে।

গ্রীন ও ট্রিটস্‌কের মতবাদ

সমালোচনাঃ (১) আদর্শবাদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় সমালোচনা হইল আদর্শবাদ রাষ্ট্রকে সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মত রাষ্ট্রও একটি সামাজিক সংগঠন। সুতরাং রাষ্ট্র সমাজ অপেক্ষা বড় নহে। (২) তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের সম্পূর্ণ বিনাশ-সাধন কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। রাষ্ট্র-বিরোধী ইচ্ছা-মাত্রকেই অপ্রকৃত ইচ্ছা বলা সমীচীন নহে। (৩) আর, আদর্শবাদে যেরূপ আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করা কোন আদর্শ সমাজের পক্ষেও সম্ভব নহে। কারণ, দেশের সকল কার্য সম্পাদন করার পক্ষে রাষ্ট্র উপযুক্ত নহে। যথা—দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ইত্যাদির আলোচনা ও উন্নতি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, ইহাতে রাষ্ট্রের বিশেষ কোন কর্তৃত্ব নাই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, গবেষণা, পরীক্ষণ ইত্যাদি কাজ ব্যক্তিগত উৎসাহেই সাধিত হইয়া থাকে এবং রাষ্ট্রেরও উচিত এই-সকল কাজের ভার ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা। বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির আলোচনায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। রাষ্ট্রের কর্তব্য এই-সকল কার্যে ব্যক্তিকে উৎসাহ

দেওয়া এবং বাধা-বিঘ্ন অপসারণ করা। (৪) আদর্শবাদীদের মতবাদ গ্রহণ করিতে হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছুই থাকে না, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন দিকের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কারণ, রাষ্ট্র কবি, ধর্মপ্রচারক বা দার্শনিক ইত্যাদি সৃষ্টি করিতে পারে না। রাষ্ট্রের কার্য আইনপ্রণয়ন করা, তাহা কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করা, অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সকল আদর্শ রাষ্ট্রের পক্ষে এই-সকল কর্তব্যই যথেষ্ট।

রাষ্ট্র ব্যক্তিকে রক্ষা করিবে, ব্যক্তির সৎকার্যে উৎসাহ দিবে, সর্বতোভাবে তাহাকে সাহায্য করিবে। তাহা হইলেই আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(গ) রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ * (Marxian Theory of the State) :—কার্ল মার্কসের মতে উৎপাদনের উন্নতি ও শ্রম-বিভাগের ফলে সমাজে ধনবৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্য দেখা দিলে তাহাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীনকালে মানুষ অভিজাতশ্রেণী ও দাসশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অভিজাত-শ্রেণী দাসশ্রেণীদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকাংশ নিজেরা ভোগ করিতে লাগিল, আর দাসশ্রেণী অভিজাতশ্রেণীর দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হইতে লাগিল। অভিজাতশ্রেণী এইভাবে আর্থিক বলে বলীয়ান হইতে থাকে। তাহারা রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করে এবং আপন স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োগ করে। আধুনিককালে উৎপাদন-ব্যবস্থা ও শিল্পের আরও উন্নতি হইয়াছে। এই অবস্থায় সমাজের জনসাধারণ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—মালিক-শ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণী।

আদিমযুগে শ্রেণী-বৈষম্য হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি

বর্তমানেও সেই প্রাচীন অবস্থার পুনরাবর্তন চলিতেছে। মালিকশ্রেণী সমাজের শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই মালিক। তাহারা নিজেদের স্বার্থের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া উৎপাদিত সম্পদের অধিকাংশ নিজেরা আত্মসাৎ করে। ইহার ফলে মালিকশ্রেণীদের গৃহে ধন সঞ্চিত হইতেছে আর শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশঃই দরিদ্র হইতেছে। ইহারই জন্য মালিক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণীতে চিরসংঘর্ষ চলিতে থাকে। সমাজে রাষ্ট্রেরও উদ্দেশ্য এই শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখা। মার্কস বলেন, এই শোষণনীতি অব্যাহত রাখিবার জন্য

শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখা বর্তমান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

* মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ দেখ: পৃষ্ঠা ৪৬

মালিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সংগঠন সৃষ্ট হইয়াছে। রাষ্ট্রের আইন-কানুন মালিকশ্রেণীর স্বার্থে রচিত হয়। এইজন্য মার্কস মনে করেন যে, রাষ্ট্র পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার কার্যের কোন নৈতিক সমর্থন নাই। তাঁহার মতে এই শ্রেণীবৈষম্যের অনিবার্য পরিণতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

শ্রেণীবৈষম্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

যখন এই শোষণনীতি চরম অবস্থায় পৌছিবে, তখন শ্রমিকশ্রেণী জাগ্রত হইবে এবং এমন বিপ্লব দেখা দিবে, যাহার ফলে মালিকশ্রেণী সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, মালিকশ্রেণীর কবায়ত্ত রাষ্ট্র শ্রমিকদিগের হস্তগত হইবে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রমিকশ্রেণী তখন মালিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি-সাধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োগ করিবে। পরে যখন সমাজ হইতে শ্রেণীবৈষম্য সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইবে, রাষ্ট্রীয় শক্তি-নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আর থাকিবে না, তখন রাষ্ট্র ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

এই শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থারই নাম সমভোগবাদ (Communism)। মার্কসের মতে সমভোগবাদের প্রতিষ্ঠাই সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

সমালোচনা ঃ—মার্কসের মতানুসারে রাষ্ট্র কেবল বলপ্রয়োগের যন্ত্র। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে ধনবৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হইল শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখা। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও কার্যাবলী সম্পর্কে মার্কস যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অনেকে ভুল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন।

(১) সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য সমাজের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। (২) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য জনকল্যাণসাধন করা। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, তবে বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে। (৩) মার্কসীয় মতবাদ মালিকশ্রেণীর শোষণনীতি কিছুটা প্রতিরোধ করিয়াছে সন্দেহ নাই, তবে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিসাধন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সোভিয়েট রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিলেও সেখানে রাষ্ট্রের বিলুপ্তিসাধন হয় নাই।

(ঘ) রাষ্ট্র সম্পর্কে যান্ত্রিক মতবাদ * (The Mechanical view of the State) ঃ রাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতবাদকে

* ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দেখ, পৃষ্ঠা ৩৩ ও ৪৭

যান্ত্রিক মতবাদ বলা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে সমাজে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নাই। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-লাভের উপায়স্বরূপ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।

রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-লাভের উপায় স্বরূপ

রাষ্ট্র যেন একটি যন্ত্রবিশেষ, যাহার একমাত্র কাজ ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করা, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা। এই মতবাদানুসারে রাষ্ট্র জনকল্যাণ-মূলক কোন কাজে আসে না এবং সমাজেব অকল্যাণকর কোন কাজে বাধা দিবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের নাই।

রাষ্ট্র একটি যন্ত্র-বিশেষ

সমালোচনা: কিন্তু এই মতবাদ চরমপন্থী মতবাদ। (১) রাষ্ট্রের ভালমন্দ কোন কাজ করিবার দায়িত্ব নাই, ইহা মনে করা ভুল এবং অনিষ্টকর। (২) রাষ্ট্র যদি অন্যায় বা ক্ষতিকর কার্যে বাধা না দেয়, তাহা হইলে সমাজে Laissez-faire বা অবাধ নীতি প্রসারলাভ করিবে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে। (৩) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী মতবাদ হইতেছে সমাজতন্ত্রবাদ। তাহাদের মতে সমাজে রাষ্ট্রের প্রভাব বেশী, ব্যক্তির প্রভাব কম। রাষ্ট্র ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতে পারে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদও চরমপন্থী মতবাদ। কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

উপসংহার: ম্যাকেঞ্জি মনে করেন যে, ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কোন একটির উপর প্রাধান্য দিয়া রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়েরই সমাজে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। সকলের সহযোগিতার দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় স্বার্থই রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহার জন্য রাষ্ট্রের যথেষ্ট শক্তি থাকা প্রয়োজন। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেও যদি ঐক্য ও শান্তি-প্রতিষ্ঠা হয়, তবুও তাহার রক্ষার জন্য শক্তিশালী পুলিশবাহিনীর প্রয়োজন। আর, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে-বিরোধ চলিতেছে, তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের শক্তিশালী হওয়া উচিত। সমাজতন্ত্রবাদীরাও আজকাল রাষ্ট্রের শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন।

(১) ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থরক্ষার্থে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তি বা রাষ্ট্র—কোন একটির উপর প্রাধান্য দিলে রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির

উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে, কল্যাণের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। রাষ্ট্রকে যদি সামাজিক ঐক্যের একটা বিশেষ রূপ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই-সকল বিরোধিতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রকে জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানরূপে মনে করিতে হইবে, ইহাই রাষ্ট্রের প্রকৃত ও স্বাভাবিক রূপ।

(২) রাষ্ট্র সামাজিক ঐক্যের রূপ-বিশেষ

গ্রীনের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তখনই সফল হয়, যখন জনকল্যাণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্র কাজ করে। বোসাঙ্কেও অনুরূপ মতবাদ পোষণ করেন। কিন্তু তিনি হেগেলীয় মতবাদের উপর বেশী প্রাধান্য দিয়াছেন। হেগেলের মতে রাষ্ট্র মর্ত্যে স্বর্গীয় ভাবের প্রতিরূপ, পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদার্পণ। গ্রীন হেগেলের মতবাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব অনুমোদন করেন নাই।

রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ

মানবসমাজ বড় জটিল, ইহাকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিতে হইবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ কাহারও উপর প্রাধান্য না দিয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া রাষ্ট্রকে জনকল্যাণকারী প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলা উচিত।

১৫। **রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ (Future of the state):** লাস্কি বলিয়াছেন, বর্তমানে সকল রাষ্ট্রের প্রধান কার্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। ("It may be taken as a general rule that the character of any particular state will be, broadly speaking, a function of the economic system which obtains in the society it controls."—Laski)

এই নীতি বর্তমানে স্বীকৃত হওয়ার ফলে সকল রাষ্ট্রই সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন রাষ্ট্রমাত্রই অন্য রাষ্ট্রের প্রতি বিরোধী ভাব পোষণ করে এবং প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রই জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে চায়। এই পারস্পরিক বিরোধিতার ফলে প্রায়ই জনসাধারণ যুদ্ধের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠে।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ

আধুনিক যুগে যুদ্ধ এত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ

ঘটিলে পৃথিবীতে কেহ বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যায় না। যুদ্ধের এই ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া মানুষের সুখ-শান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়া যাইতেছে।

যুদ্ধের পরিণাম

ইহার হাত হইতে জগৎকে রক্ষা করিতে হইলে এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা প্রয়োজন, যে-প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করিয়া সমগ্র জগৎকে শাসন করিতে পারিবে এবং জগতের সকল স্বাধীন রাষ্ট্রই তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে U. N. O. (United Nations Organisation) বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। U. N. O.-র সম্মুখে যে-বিরাট সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, তাহার সম্পূর্ণ সমাধান করা U. N. O.-র দ্বারা সম্ভব হয় নাই। কোন প্রকারে সাময়িক মুখ চাপা দেওয়া অপেক্ষা U. N. O. খুব বেশী কার্যকর কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই।

U. N. O.

কারণ, এইরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা ও পুলিশবাহিনী বা সৈন্যবাহিনী না থাকিলে তাহার পক্ষে সকল রাষ্ট্রকে তাহার আইন ও নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এইরূপ নীতি অনুসরণ করিবারও বিপদ আছে। U. N. O.-র সিদ্ধান্তকে যদি কোন রাষ্ট্র না মানে, তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রের সহিত U. N. O.-র বিরোধ বাধিবে এবং তাহারও ফল একই হইবে—যুদ্ধ। সুতরাং সমস্যাটি গুরুতর।

যাহা হোক, এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সকল রাষ্ট্রকেই কিছু-না-কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে তাহাদের ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব খানিকটা ক্ষুণ্ণ না করিলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর কিছু করা সম্ভব নয়।

সমাধান

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থাকা একান্তই প্রয়োজন, যাহা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান অন্যান্য রাষ্ট্রকে তাহার নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে পারিবে।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন প্রণয়ন করিতে হইবে এবং সকল রাষ্ট্রের উপর এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্থতঃ, বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গঠন করিয়া মানুষের ঐক্যবোধকে আরও জাগ্রত করিতে হইবে। সকলেই যেন নিজেকে কোন বিশেষ একটি রাষ্ট্রের নাগরিক মনে না করিয়া বৃহত্তর সমাজের বা বিশ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, মানুষের বিচারবুদ্ধিকে আরও উন্নত করিতে হইবে। জগতের সকলের কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা যে একান্ত প্রয়োজন, ইহা যেন সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে।

উপসংহার ঃ আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধের অবসান হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ থাকিলেও সেই বিরোধের মাধ্যমে বৃহত্তর ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্র যখন উপলব্ধি করিবে যে, তাহার শীর্ষস্থান অধিকার করিবার বাসনা বিশ্ব-সম্প্রদায়ের কাছে তাহাকে হেয় করিয়া তুলিতেছে, তখনই রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ ভুলিয়া গিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবে। রাষ্ট্র কেবল পশুবল নয়, রাষ্ট্র জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এক কথায়, সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হইবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে।

গীর্জা (The Church)

১। **গীর্জা কাহাকে বলে (What is a Church)**ঃ গীর্জা হইতেছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ সমবেত হইয়া ঈশ্বরের পূজা, উপাসনা ইত্যাদি করে। গীর্জা বলিতে এখানে কেবল খৃষ্টানদের ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে বুঝাইতেছে না, ব্যাপক অর্থে গীর্জা শব্দটি ব্যবহার করা হইতেছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর সকল ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে গীর্জা বলা হইতেছে। সকল ধর্মই ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়িয়া উঠে।

গীর্জার পরিচয়

গিস্‌বার্টের মতে যে-প্রতিষ্ঠান মানুষেব ধর্ম-সম্বন্ধীয় বাহ্য অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাকে গীর্জা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠান বলা হয়। ধর্ম মানুষের অন্তরের জিনিস। এই বিশ্বের চরম ও পরমতত্ত্ব জানিবার একটা বাসনা মানুষের মধ্যে কোন-না-কোন আকারে থাকে। কাহারও মধ্যে এই বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। ধ্যান, ধারণা ইত্যাদির দ্বারা চরমতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা পরম আনন্দ লাভ করে। ধর্মপ্রতিষ্ঠান তাহাদিগকে এই পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। আর, যাহাদের মধ্যে এই বাসনা তেমন প্রবল থাকে না, ধর্মপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে সহায়তা করে। সুতরাং গীর্জা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠান কেবল যে ধর্মসম্পর্কীয় বাহ্য অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা নয়, আত্মার উন্নতি-লাভেও সাহায্য করিয়া থাকে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ পরমাত্মার সাহিত যোগাযোগ স্থাপন করে।

ধর্মপ্রতিষ্ঠান আধ্যাত্মিক উন্নতির পথপ্রদর্শক

তবে এমন অনেক ধর্ম আছে, যে-সব ধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে না। আমাদের দেশে বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন রূপদান করে নাই। কিন্তু তাহাদেরও মঠ, সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে তাহারা মিলিত হইয়া অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আলোচনা করে।

২। **গীর্জার কাজ (Functions of the Church)**ঃ গীর্জা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কাজ দুই প্রকারের : (ক) মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব

জাগাইয়া তোলা বা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক স্থাপন করা, আর (খ) মানুষে মানুষে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করিয়া তোলা।

(ক) আদিমযুগে মানুষ যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিপর্যস্ত হইয়া উঠিত, নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে করিত, তখন তাহার অন্তরাত্মা এমন একটা আশ্রয় কামনা করিত, যাহার উপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে। তাহার মনে হইত, প্রকৃতি কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই-সকল বিপর্যয় ঘটায়। তখন মানুষ সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে আপনাকে সমর্পণ করিত, পূজা-উপাসনার দ্বারা সেই শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিত। ইহা হইতেই মানুষের ধর্মভাবের উৎপত্তি। এই ধর্মভাবকে স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার জন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের এই ধারণা পরবর্তী যুগে আরও উন্নত আকার ধারণ করে। মানুষ মনে করে যে, এই বিশ্বের পশ্চাতে এমন এক অনাদি, অনন্ত সত্তা আছে, যাহার শক্তিতে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। সেই সত্তা এক, অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, বিভু। ধর্মপ্রতিষ্ঠান মানুষের এই ভাবকে দৃঢ়তর হইতে সাহায্য করিয়াছে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানই মানুষের সহিত সেই অনন্ত সত্তার যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে, তাহার মনে অমরত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে। ধর্মপ্রতিষ্ঠান মানুষকে পাপ হইতে, দুর্বলতা হইতে, দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় দেখাইয়া দিয়াছে, পরলোক, কর্মফল ইত্যাদিতে মানুষের বিশ্বাস জন্মাইয়াছে।

ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশ

(খ) আধ্যাত্মিক পথের নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অপর একটি কাজ আছে, তাহা হইল সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা।

ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পূজা, উপাসনা, আধ্যাত্মিক আলোচনা ইত্যাদির জন্য বহুলোক সমবেত হয়। সেইজন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণের মেলামেশার একটি কেন্দ্রও বলা যায়। ধর্মপ্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের অনেক সামাজিক সমস্যারও সমাধান করিয়া থাকে এবং নানা বিধি-নিয়ম প্রবর্তন করিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ধর্মপ্রতিষ্ঠান দুইটি কাজই পাশাপাশি করিয়া থাকে। একদিকে সামাজিক বিধিনিয়মের দ্বারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, অপরদিকে মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করিয়া তোলে।

৩। **গীর্জা ও সমাজ (The Church and the Society)ঃ** সমাজের উপর গীর্জার প্রভাব খুব বেশী। ধর্মপ্রতিষ্ঠান সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের সহিত ঈশ্বরের বা লোকাতীত কোন সত্তার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। ইহাকেই আমরা ধর্মভাব বলি। এই ধর্মভাব মানুষের নৈতিক উন্নতিসাধন করে, চরিত্রবল দৃঢ় করে, অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করে, মানুষের মনে পরোপকার-প্রবৃত্তি, সহানুভূতির ভাব জাগাইয়া তোলে এইভাবে ধর্মভাব জাগ্রত করিয়া ধর্মপ্রতিষ্ঠান মানুষের বাহ্য আচরণকে সংযত করে।

ধর্মপ্রতিষ্ঠান বাহ্য আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে

ঈশ্বরের সহিত যোগাযোগ-রক্ষার ব্যাপারে গীর্জা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানই একমাত্র কর্তা। কারণ, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয় নহে, সকলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। এইজন্য ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য মানুষকে ঈশ্বরের বাণী বা ধর্মশাস্ত্রের উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রীয় অনুশাসনের তাৎপর্য সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এইজন্য ধর্মযাজকেরা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যাহা ব্যাখ্যা করেন, জনসাধারণ অন্ধবিশ্বাসে তাহাই মানিয়া লয়।

ধর্মপ্রতিষ্ঠান ঈশ্বরের সহিত মানুষের যোগসাধন করে

অনেক সময় দেখা যায়, ধর্মযাজকেরা ধর্মশাস্ত্রের তাৎপর্যের নিজেদের সুবিধামত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। তদুপরি মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাহারা জনসাধারণের উপর আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে; তাহাতে ধর্মের মধ্যে সংকীর্ণতা দেখা দেয়। জনসাধারণের কাছে ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশিত হয় না। ধর্মযাজকদের মনোভাব সাধারণতঃ রক্ষণশীল হইয়া থাকে এবং তাহারা মনে করে, তাহারাই মানুষের ধর্মভাবকে নিয়ন্ত্রণ করিবার একমাত্র কর্তা।

ধর্মযাজক বা পুরোহিতদের দোষ

ধর্মপ্রতিষ্ঠানের এই প্রচণ্ড কর্তৃত্বের ফলে জনসাধারণের ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীন চিন্তার ভাব নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা ধর্মপ্রতিষ্ঠান-প্রবর্তিত বাঁধা-ধরা আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে, যাহার ফলে আচার-অনুষ্ঠানই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, ঈশ্বর গৌণ হইয়া পড়েন। মানুষ আপন বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মন্দ প্রভাব

ইউরোপে একসময় গীর্জার প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে, গীর্জার ক্ষমতা রাজার ক্ষমতা অপেক্ষাও অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। রাজতন্ত্র পরিচালিত হইত ধর্মযাজকদের দ্বারা। কিন্তু আধুনিক যুগে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই মানুষ ধর্মকে উদার মনোভাব নিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে। ঈশ্বর যে এই-সকল কৃত্রিমতা, আচার-অনুষ্ঠানের বাঁধা-ধরা নিয়মকানুনের অনেক ঊর্ধ্বে, তাহা মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি সমাজের উপর গীর্জার কর্তৃত্ব কিছুটা কমিলেও, প্রভাব কিছুমাত্র কমে নাই।

আধুনিক সমাজ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান

সমাজের উপর ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব এত অধিক যে, অনেক সামাজিক ব্যবস্থা ধর্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমাদের জাতিভেদ-প্রথা, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান ধর্ম-প্রবর্তিত নিয়মাবলীর দ্বারাই পরিচালিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই-সকল অনুষ্ঠান যে-নিয়মে পরিচালিত হইয়াছে, আজও সেই নিয়মেই চলিতেছে। কারণ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পুরোহিতরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহারা নিয়মকানুনের পরিবর্তনসাধনের বিরোধী। সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারাও যে পরিবর্তিত হইতেছে এবং সেই অনুসারে ধর্মীয় অনুশাসনেরও যে যুগোপযোগী সংস্কার হওয়া উচিত, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। সমাজের উপর আপন কর্তৃত্ব হারাইবার ভয়ে তাঁহারা সকলপ্রকার সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে। তাহাদের যুক্তিতে ধর্মের সত্য চিরন্তন, তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পারে না।

ধর্মপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক সামাজিক প্রথার নিয়ন্ত্রণ

কিন্তু আধুনিক কালে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার লাঘব হইয়াছে। মানুষের বিচারবুদ্ধি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ আর নিজেকে সংকীর্ণতার মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে চাহে না। ধীরে ধীরে মানুষ অন্ধ সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া লোকের দান-ধ্যানের ফলে কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রচুর অর্থসমাগম হইতে থাকে, যাহার ফলে কর্তৃপক্ষের

মধ্যে ক্ষমতালোভ আসিয়া পড়ে। ধর্মপ্রতিষ্ঠান তখন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা ছাড়িয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা ব্যাহত হয়। যাহা হোক, উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব অপরিসীম।

ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি

৪। **গীর্জা ও রাষ্ট্র (The Church and the State)ঃ** গীর্জা, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির প্রধান কাজ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করা, আর রাষ্ট্র এমন একটি ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক সংগঠন, যাহার প্রধান কর্তব্য দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বহিঃশক্তির আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা।

আদিমযুগে অলৌকিক সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান দিবার জন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও পুরোহিতদের আবির্ভাব হয়। সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাই পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং জনসাধারণ তাঁহাদের নির্দেশ নির্বিচারে মানিয়া লইত। তখনকার দিনে পুরোহিতরা কেবল ঈশ্বর সম্পর্কেই নির্দেশ দিতেন না, সমাজের অন্যান্য বিধিব্যবস্থা নিয়মকানুনও তাঁহারাই করিতেন। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ব্যাপারেই তাঁহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল।

ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও পুরোহিত

কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্র ও গীর্জা পৃথক হইয়া যায়। তখন রাষ্ট্রের কার্য ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কার্য পৃথক পৃথক ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে উভয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। (১) রাষ্ট্র চাহিল গীর্জার বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করিতে আর গীর্জা দাবি করিল রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে। (২) রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইনের সহিত ধর্ম-প্রবর্তিত অনুশাসনের সংঘর্ষ হইতে লাগিল, (৩) শাসক ও পুরোহিতদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। পুরোহিতরা আপন কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমতালোভী হইয়া পড়িল।

রাষ্ট্র ও গীর্জার মধ্যে বিরোধ

এই সংঘর্ষের অবসান করিবার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের কার্যের সীমা নির্দিষ্ট করা হইল। (১) রাষ্ট্রের ক্ষমতা গীর্জার ক্ষমতা অপেক্ষা ব্যাপকতর হইল, গীর্জার ক্ষমতা কমিয়া গেল। (২) অনেক কার্য, যাহা পূর্বে গীর্জা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত,

রাষ্ট্র ও গীর্জার কার্যের সীমানির্দেশ

এখন তাহা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল। শিক্ষাকার্য ও বিবাহ ইত্যাদি পূর্বে গীর্জা নিয়ন্ত্রণ করিত, এখন শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণরূপে গীর্জার ক্ষমতা-বহির্ভূত, শিক্ষাকার্যের ভার এখন রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। বিবাহের দায়িত্বও ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া যাইতেছে। (৩) রাষ্ট্রের ক্ষমতা এমন সর্বব্যাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, রাষ্ট্র গীর্জার কার্যেরও বিচার করিতে পারে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে গীর্জার কর্তৃপক্ষও শাস্তির হাত হইতে রক্ষা পায় না।

উপসংহার ঃ তবে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই কার্যে গীর্জাও তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকে। মানুষের মধ্যে সদ্‌গুণের বিকাশ যত অধিক হইবে, ততই মানুষ জনকল্যাণকর কার্যে অধিক অগ্রসর হইবে। ইহাতে রাষ্ট্রের কাজ অনেক সহজ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে নৈতিক ভাব ও আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিবার ব্যাপারে গীর্জা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। নতুবা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। ধর্মের ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা উচিত। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। আবার, দেশের শান্তি বজায় রাখা ও বহিঃশক্তির আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার ব্যাপারেও রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। এই ব্যাপারে গীর্জার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

যাহা হোক গীর্জা ও রাষ্ট্র একই সমাজের দুইটি প্রতিষ্ঠান। উভয়েই তাহাদের নিজস্ব কার্যসম্পাদন করিবে, কেহ অন্যের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। তাহা হইলেই ঐক্য ও শান্তি বজায় থাকিবে, সমাজেরও প্রকৃত কল্যাণ হইবে এবং আদর্শ সমাজ গড়িয়া ওঠা সম্ভবপর হইবে।

৫। আধুনিক ধর্মপ্রতিষ্ঠান (Church To-day) ঃ আধুনিক ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নানা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। ধর্মের গোড়ামির ফলে এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হওয়ায় ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের আস্থা কমিয়া আসিতেছে।

আধুনিক ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা

আধুনিক যুগে ধর্মকে কেহ আর অন্ধবিশ্বাসে মানিয়া লইতে চাহে না, বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি ব্যতীত ধর্মকে কেহ গ্রহণ করিতে চায় না। সুতরাং পূর্বের মত ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের উপর আর কর্তৃত্ব করিতে পারিতেছে না।

অথচ মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের দায়িত্বভার ধর্মপ্রতিষ্ঠানকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, এখনও সাধারণ লোকদের ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উপর অগাধ বিশ্বাস রহিয়াছে। অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যে-কার্য করা সম্ভব নয়, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা খুব সহজেই সম্ভব হয়। কারণ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের নির্দেশ সাধারণ লোকে সহজ বিশ্বাসে মানিয়া লয়। এইজন্য জনসাধারণের নৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি অজ্ঞ, শিক্ষিত—সকল শ্রেণীর লোকের আস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পুরাতন নীতির কালোপযোগী পরিবর্তন সাধন কবিতে হইবে ও কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের সচেতন হইতে হইবে।

আধুনিক ধর্মপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

প্রথমতঃ, ধর্মভাবের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি কোন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। কারণ, তাহাতে তাহাদেরও নৈতিক অবনতি ঘটিবে এবং জনসাধারণের বিশ্বাসও তাহারা হারাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি কোন গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাহারা যথাসম্ভব উদারতার পরিচয় দিবে। গোঁড়ামি ধর্মকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলে ও অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগ্রত করে। সকল ধর্মের মূলনীতি যে একই এবং সকল ধর্মমত যে একই ঈশ্বরের দিকে সকলকে পরিচালিত করে—এই বিশ্বাসের প্রচার ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে করিতে হইবে। কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া সর্বধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি সমাজসেবামূলক কার্যে অগ্রণী হইবে। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—এই নীতি গ্রহণ করিয়া জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিবে। এইরূপ সেবামূলক কার্যে ধর্মপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবে।

চতুর্থতঃ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের অনুসরণকারীদের এমনভাবে পরিচালনা করিবে না, যাহাতে তাহারা কেবল ঈশ্বরোপাসনাকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করে। গার্হস্থ্যধর্ম পালন করা, সমাজের সেবা করাও যে ধর্মের

অঙ্গীভূত, এই বিশ্বাস জাগ্রত করিবে। নৈতিক উপায়ে সামাজিক জীবন-যাপনে ধর্মপ্রতিষ্ঠান জনসাধারণকে উৎসাহিত করিবে। এক কথায় ধর্ম-প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে পথপ্রদর্শক হইবে।

পঞ্চমতঃ, ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে সমাজেব অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ বক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের সকল কার্যে সহযোগিতা করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বই ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মূলনীতি হইবে। জন-সাধাবণের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা কবিতে, সমগ্র বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতা-বোধ জাগ্রত কবিতে ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

তাহা হইলেই ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রকৃত জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হইতে পাবিবে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions)

১। **শিক্ষার সংজ্ঞা** (**Definition of Education**): শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। এই-সকল সংজ্ঞা হইতে শিক্ষাব মূলতাৎপর্য কি, তাহা উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হইল—সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করা। কারণ, 'Education' শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে ল্যাটিন 'Educere' কথা হইতে, যাহার অর্থ to draw out বা বাহির করা।

শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

সক্রেটিস বলিয়াছেন, শিক্ষার অর্থ বাহির হইতে অন্তরে কিছু প্রবেশ করাইয়া দেওয়া নয়, শিক্ষা হইল অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ—'a growth from within'। শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানুষের মধ্যে পূর্ব হইতে যে পূর্ণতা বর্তমান থাকে, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশই হইল শিক্ষা ("Education is the manifestation of the perfection already in man."—Vivekananda); সুতরাং যাহা অব্যক্ত বা আবৃত আছে, তাহাকে ব্যক্ত বা প্রকাশিত করাই হইল শিক্ষা। দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যে-শক্তি মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে, তাহাব উন্নতিসাধন, এক কথায়, সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বা বিকাশসাধনকেই মহাত্মা গান্ধী শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ("By education I mean an alround drawing out of the best in child and man—body, mind and soul."—Mahatma Gandhi)। শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষা সম্পর্কে বলিয়াছেন, প্রকৃত শিক্ষার প্রথম নীতিই হইল যে, কিছুই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। শিশুর বিকাশসাধনে শিক্ষক একজন সাহায্যকারী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। "The first principle of true teaching is that nothing can be taught. The teacher is not an instructor or task-master, he is a helper and a guide."—Sri Aurobindo)।

শিক্ষাব বিভিন্ন সংজ্ঞা

এই-সকল বিভিন্ন সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে, শিশু বা মানুষ যে-সকল শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই শিক্ষা।

কিন্তু সাধারণ অর্থে অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণকে শিক্ষা বলা হয় না।

পরিবার, রাষ্ট্র বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে যে-শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাকেই শিক্ষা বলা হয়। তবে এই-সকল পদ্ধতিতে যে-শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধন করে।

২। **শিক্ষার উদ্দেশ্য (Aim of Education):** পূর্বোক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা হইতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রথমতঃ, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য—যে-সমস্ত সুপ্ত শক্তি লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেগুলিকে বিকশিত করিয়া তোলা। দ্বিতীয়তঃ, সকলকে জীবিকা-উপার্জনের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিচারবুদ্ধিশীল ও চরিত্রবান করাও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। চতুর্থতঃ, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া, তাহাকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক করিয়া তোলাও শিক্ষার দায়িত্ব। পঞ্চমতঃ, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়।

রাসেলের মতবাদ

রাসেলের মতে শিক্ষা দুই প্রকারের হইতে পারে: (১) ব্যবহারিক শিক্ষা (Useful Education) ও (২) আলংকারিক শিক্ষা (Ornamental Education)। ব্যবহারিক শিক্ষা দ্বারা মানুষ জীবিকা-উপার্জনের উপযুক্ত হয় আর আলংকারিক শিক্ষার দ্বারা ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, কবিতা, শিল্পকলা ইত্যাদির চর্চা করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং ব্যবহারিক ও আলংকারিক উভয় প্রকারের শিক্ষাই প্রয়োজন।

শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

যাহা হোক, শিক্ষা মানুষকে আদর্শের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং শিক্ষাই আদর্শ সমাজের প্রাথমিক ভিত্তি এবং শিক্ষাই সমাজের মূল প্রয়োজন সিদ্ধ করে। যে-সকল প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তাহারাই সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করে এবং এইজন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আলোচনা সমাজদর্শনের অন্যতম বিষয়বস্তু। শিক্ষা হইল দর্শনের বাস্তব রূপ। এই দিক হইতে বিচার করিলে শিক্ষাকে দর্শনের প্রাণবন্ত বা গতিময় দিক (dynamic aspect) বলা যায়।

৩। **শিক্ষার মূলনীতি ও বিভিন্ন বিদ্যালয় (The Basic Principles of Education and Educational Institutions.):**

আধুনিক বিদ্যালয়সমূহে যে-পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তিনটি

মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে তিন প্রকারের বিদ্যালয় দেখা যায়: (১) প্রাথমিক বিদ্যালয়, (২) মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং (৩) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদের মানসিক স্তরের উপর ভিত্তি করিয়া এই শ্রেণীবিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

তিন প্রকারের বিদ্যালয়

শৈশবে শিশুর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা (perception) অতিশয় প্রবল থাকে। এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। কিন্তু শিশু প্রথমে বিভিন্ন বস্তুকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে। বস্তুতে বস্তুতে যে-সম্পর্ক বিদ্যমান, তাহা আবিষ্কার করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে যে, ৮।৯ বৎসর পর্যন্ত শিশু প্রত্যক্ষের (perception) স্তরে থাকে। সে তখন জড়বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে এবং তাহার কল্পনাও জড়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এইজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যক্ষের উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিশুর অতিপরিচিত খেলনা বা বস্তুর সাহায্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহাদের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ছোট ছোট গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে তাহাদের কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করা উচিত। আমাদের দেশে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক (primary) বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত।

শিশুর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়

এই স্তর অতিক্রম করিবার পর ধীরে ধীরে শিশুর বুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং তখন শিশু বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়। বুদ্ধি যতই উন্নত হয়, ততই প্রকৃতিকে জানিবার শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। তাহার কৌতুহল-প্রবৃত্তি এত প্রবল হয় যে, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা তাহার পক্ষে সহজতর হয়। এইজন্য মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক (Secondary or Higher Secondary) বিদ্যালয়গুলিতে নানা বিষয়ের তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে।

বুদ্ধির উন্নতি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়

এই-সকল তথ্যমূলক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া ধীরে ধীরে ছাত্রদের বিচার-শক্তি (Reason) জাগ্রত হয়। তাহারা ভাল-মন্দের, সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয়ে সমর্থ হয়। এই স্তরে উহাদের নৈতিক বোধ, সৌন্দর্যবোধ, ধর্মবোধ জাগ্রত হয়, তাহারা দার্শনিকের স্তরে উন্নীত হয় ও দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্ত কিছুর বিচার করিতে সমর্থ হয়। এইজন্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে ছাত্রদের সকল বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ গড়িয়া উঠে এবং বিচার করিয়া সমস্ত কিছু গ্রহণ করিতে শিক্ষালাভ করে।

বিচারশক্তি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয

৪। **উচ্চ শিক্ষা** (**Higher Education**) : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইলে ছাত্ররা কলেজ ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিবার উপযুক্ত হয়। উচ্চশিক্ষা বলিতে এইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বুঝানো হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক-একটা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, যাহাতে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়। এইজন্য কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

উচ্চশিক্ষা কাহাকে বলে

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাত্রদের এক-একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করিয়া তোলে। এইখানেই স্কুল বা কলেজের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষার পার্থক্য। এইজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এত মর্যাদাপূর্ণ। এই শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মন উন্নত ও সংস্কারমুক্ত হয়, বিচারবুদ্ধি স্পষ্ট হয়, বুদ্ধি উন্নত হয়, মন উচ্চতর ধারণা ও চিন্তার উপযোগী হয়। আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা জন্মে। এই শিক্ষা মানুষকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইরূপ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজ সুন্দর হইয়া উঠে। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদেব দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকে আদর্শ সমাজ করিয়া তোলে। নাগরিকদিগকে শিক্ষিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের প্রতি কর্তব্যপালন করে, সমাজও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

উচ্চশিক্ষার উপকারিতা

কিন্তু সমাজের সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-লাভের উপযোগী

হইতে পারে না। এইজন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সকলের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হইতে পারে। সমাজে কেহ যাহাতে অবহেলিত না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র সম্ভাবনাকে সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে উন্নত করিতে হইবে।

উচ্চশিক্ষার অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা

অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষাপ্রণালী এমন হয় যাহাতে, ছাত্রদের পাঠের প্রতি আগ্রহ কমিয়া যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য পাঠের প্রতি আগ্রহ জন্মানো ও বাড়ানো। যে-বিষয়ে কোন ছাত্র বিশেষজ্ঞ হইল, সে-বিষয়ে আরও জানিবার আকাঙ্ক্ষা যাহাতে প্রবল হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। উৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে, আর অপকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি পাঠের প্রতি আগ্রহ সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দেয়।

শিক্ষাপ্রণালীর গুরুত্ব

৫। **বিদ্যালয়ের কর্তব্য** (**Duties of the Educational Institutions**)ঃ শিশুদের শিক্ষার সূত্রপাত হয় পরিবারের মধ্যে। কিন্তু একটু বড় হইলেই তাহাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। তাহাদের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার বিরাট দায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত থাকে। এইজন্য শিশুদের গঠনকার্যে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সর্বাধিক।

(১) শিশুদের মধ্যে যে-সকল অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাদিগকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিয়া যাহার যে-দিকে ঝোঁক বা আগ্রহ, বিদ্যালয় তাহাকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে। (২) তাহাদের পশু-প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইবে, যাহাতে সেই-সকল প্রবৃত্তি তাহাদের উন্নতির পথে বাধাসৃষ্টি না করিয়া বরং তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। অনেক সময় শিশুদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী হইবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের এই প্রবৃত্তিকে সুপরিচালিত করিতে পারিলে ইহার দ্বারাই তাহারা উপযুক্ত নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে। (৩) তাহাদের সংযত ও সহনশীল হইবার শিক্ষা দিতে হইবে। (৪) অনেক সময় আবার দেখা যায়, সংযম ও সহনশীলতার শিক্ষা শিশুকে দাসত্বের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু ইহা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের দায়িত্ব বিদ্যালয়ের বা সমাজের। তাহাকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে সে পারিবারিক বা সামাজিক যে-

দাবি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারে ও তাহার অধিকার রক্ষা করিতে পারে। রাজার সন্তানকে রাজোচিত গুণসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে, সাধারণ নাগরিকের সন্তানকে তাহার পারিবারিক দাবি বা অধিকার রক্ষা করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। (৫) ইহার জন্য প্রয়োজন দেশের ভাষা শিক্ষা দেওয়া, যাহার মাধ্যমে শিশু দেশের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে এবং আপন চিন্তাশক্তিকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে।

শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিদ্যালয়ের দায়িত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এখন বিদ্যালয় কিরূপে শিশুকে শিক্ষা দিবে, আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শিক্ষাদান পদ্ধতি: (৬) শিশুকে প্রথমে তাহার দেশের ও জাতির প্রচলিত রীতিনীতির সহিত পরিচিত করানো উচিত। (৭) প্লেটো সংগীত ও কবিতাকেই প্রথম শিক্ষাদানের বিষয় হিসাবে গণ্য করিয়াছিলেন। সুন্দর সুন্দর গল্প, ছড়াছবি, খেলনা ইত্যাদি যে-সকল বস্তু শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে তাহারই মাধ্যমে শিশুর প্রথম শিক্ষা শুরু হইবে।

(৮) ধীরে ধীরে শিশুকে তাহার পরিবেশের সহিত পরিচিত করাইতে হইবে। প্রকৃতির সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাকে আধুনিক যুগে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলা হয়। কারণ, ইহার দ্বারা শিশুর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক জ্ঞান চিন্তাশক্তিকে উন্নত করে, মানব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছাকে জাগ্রত করে, ফলে বিভিন্ন দেশের মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহল উদ্দীপিত করে। ইতিহাসে আগ্রহ জন্মিলে বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষা করিবারও আগ্রহ জন্মে।

(৯) জ্ঞানলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন, শিশু যাহা শিক্ষা করিতেছে, তাহা যেন সে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে। প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান জন্মিবার পরে, সে নিজেই এই সম্পর্কে গল্প তৈয়ারি করিতে পারে ও অভিনয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারে। (১০) শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শারীরিক উন্নতি ও মানসিক আনন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাকে আমোদ-প্রমোদে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। (১১) এইভাবে শিশুর চিন্তাধারা যতই উন্নত হইবে, ততই সে ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার উপযুক্ত হইবে। (১২) ছাত্রাবস্থায় তাহারা যাহাতে

কোন ধর্মের বা রাজনীতির উপর পক্ষপাতিত্ব না করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে সব কিছু সম্বন্ধে তাহারা যাহাতে একটা সুনির্দিষ্ট মতবাদ গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুতি প্রয়োজন।

(১৩) প্রথম যৌবনের অসুবিধা বা বিপদের সময় অভিভাবকদের ও শিক্ষকদের উচিত, বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের সমস্যাগুলির সমাধান করা ও শিক্ষা দেওয়া। ইতিহাস ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জ্ঞান এই বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে।

উপসংহার: সাধারণতঃ যাহারা শিক্ষিত, ধনী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভালই হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা এ-বিষয়ে যথেষ্ট ভাগ্যবান নয়, তাহাদেরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সভ্য সমাজের প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা পায়, তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। শিক্ষকরাই জাতি গঠন করিয়া থাকেন, সুতরাং শিক্ষকরা উন্নত, আদর্শচরিত্র ব্যক্তি হইবেন এবং তাঁহাদের নিজস্ব বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট দখল থাকিতে হইবে। শিশুমনস্তত্ত্ব-বিষয়ে শিক্ষকরা অভিজ্ঞ হইবেন—ইহাই সমাজ আশা করে। সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষক গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৬। **কারিগরি-শিক্ষা** (Technical Education): সাধারণ শিক্ষাই মানুষের সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়। কারণ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ বিষয়ে প্রবণতা দেখা যায়। কাহারও ঝোঁক থাকে সাহিত্যের উপর, কাহারও বিজ্ঞানের উপর, কাহারও অঙ্কশাস্ত্রের উপর, কাহারও সংগীতের উপর, কাহারও হাতের কাজের উপর। শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের উচিত, যেদিকে যাহার প্রবণতা বেশী, তাহাকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু কাহার কোন্ দিকে প্রবণতা বেশী, তাহা ঠিক করা সহজ নহে এবং খুব অল্প বয়সে তাহা নিরূপণ করাও যায় না। এইজন্য প্রথমে সকলের জন্য একটা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। পরে মানুষের প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা

সাধারণ শিক্ষার পরে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে ভবিষ্যতে মানুষ উপার্জনক্ষম হইতে পারে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, যন্ত্র-নির্মাণ, যন্ত্রচালনা, সংগীত, অঙ্কন, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি সকলই বৃত্তিমূলক শিক্ষার

মধ্যে পরিগণিত হয়। যাহাদের মানসিক প্রবণতা উচ্চশিক্ষার প্রতি, তাহাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। আর যাহাদের কারিগরি-শিক্ষার দিকে ঝোঁক, তাহাদের জন্য সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকে ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক হইতে পারে।

কারিগরি-শিক্ষাব্যবস্থা

কারিগরি-শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। কারণ, সাধারণ শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা যথার্থ হয়। মানুষের প্রথম শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা। ইহার পরবর্তী শিক্ষা তাহার মানসিক প্রবণতা অনুসারে নির্ধারিত হওয়া উচিত। কারিগরি অথবা উচ্চশিক্ষা—কোন্ দিকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়োজিত করিতে হইবে, তাহা তাহাদের মানসিক প্রবণতা বা ঝোঁক দেখিয়া বিচার করিতে হইবে এবং সেই অনুসারে এমন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির সুবিকাশ হয়।

কারিগরি-শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা

৭। **সম্পূরক শিক্ষা** (Supplementary Education): যে-শিক্ষার দ্বারা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, তাহাকে সম্পূরক শিক্ষা বলা যায়। কিন্তু শিক্ষার কোন অন্ত নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষার ধারা অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে, ইহার কোথাও শেষ নাই। কোন একটি বিষয়েও শিক্ষালাভ করিয়া তাহা শেষ করা সম্ভব নহে। জ্ঞানসমুদ্র অনন্ত ও অসীম। নিউটন এইজন্য এত জ্ঞানী হইয়াও বলিয়াছিলেন যে, আমি কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়াইতেছি মাত্র, অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র আমার সম্মুখে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

সম্পূরক শিক্ষা কাহাকে বলে

কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে, একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাকার্য সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কারণ, একটি বিষয়ই যেখানে পড়িয়া শেষ করা যায় না, সেখানে অনেক বিষয় পড়িবার চেষ্টা করা বৃথা। এজন্য গ্যেটে (Goethe) বলিয়াছেন: "He who would accomplish anything must learn to limit himself." অর্থাৎ ভালভাবে কোন কাজ করিতে গেলে কেবলমাত্র সেই কাজেই নিজেকে আবদ্ধ রাখা উচিত। অনেক কাজ একসঙ্গে করিতে গেলে কোন কাজই ভালভাবে হয় না। শিক্ষা সম্পর্কেও একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা সঙ্কোচ

কিন্তু ম্যাকেঞ্জি মনে করেন যে, মনীষীদের সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য হইলেও সাধারণ লোকের উপর ইহা প্রয়োজ্য নয়। সাধারণ লোক শিক্ষার প্রসার না করিয়া শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করিলে ভুল করিবে। মনীষীরা কোন বিশেষ বিষয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখিযা সেই বিষয়ে পরিপূর্ণতালাভ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। সুতরাং তাহারা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে। যে-ছাত্র দর্শন পড়িবে, তাহার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। বিজ্ঞানের ছাত্রকেও সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি পাঠ করিতে হইবে। শিল্পী ও ব্যবসাযীদেরও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। সাধাবণ লোকের নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির কাছ হইতে দূরে অবস্থান করা সম্ভব নহে।

শিক্ষার প্রসাব

সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যাহাতে প্রত্যেক বিষয়ের সহিত অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃত সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন বিষয়ের সহিত পরিচিত হওয়াকে বা জ্ঞান আহরণ করাকে সম্পূরক শিক্ষা বা Supplementary Education বলা হয়। এইরূপ শিক্ষার দ্বারাই সাধাবণ মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

৮। শিক্ষা ও অবসর-সময় (Education and Leisure): শিক্ষার উদ্দেশ্য দুই প্রকারের—অর্থ উপার্জন ও আত্মার উন্নতিসাধন। ছাত্রাবস্থায় যে-শিক্ষা মানুষ লাভ করে, তাহা তাহাকে উভয়প্রকার উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রস্তুত করে। কর্মজীবনে মানুষ অর্থ-উপার্জনে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলেরই জীবনে অল্পবিস্তর অবসর-সময় আছে, যে-সময়ে সে কবিতাপাঠ করিয়া, সংগীতচর্চা করিয়া, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদির আলোচনা করিয়া জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারে। ম্যাকেঞ্জি শিক্ষাকে ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি আখ্যা দিয়াছেন। সাহিত্য, দর্শন, কলা, সংগীত ইত্যাদির চর্চা করা সংস্কৃতির লক্ষণ। সমাজে সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সমাদর শ্রমিক অপেক্ষা অনেক বেশী।

সংস্কৃতির চর্চা ও আত্মাব উন্নতি

কিন্তু সংস্কৃতির চর্চা করিতে গেলে অবসর-সময়ের একান্তই প্রয়োজন। শ্রমিক, কেরানী ও শিক্ষকগণের জীবনের অবসর-সময় এত কম যে, তাহারা জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারে না। আমাদের সমাজে

কেবল যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারাই সংস্কৃতিচর্চা করিতে পারে। কিন্তু ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। সেইজন্যই, সকলের জীবনে এমন অবসর-সময় থাকা উচিত, যখন সে তাহার মনকে সৌন্দর্যগ্রাহী করিয়া তুলিতে পারে, জীবনকে আনন্দময় করিতে পারে।

সংস্কৃতির চর্চা ও অবসর-সময়

অনেকে আবার মনে করেন, সংস্কৃতি সমাজের কোন প্রয়োজনে আসে না। কাব্য, সাহিত্য-চর্চা ইত্যাদি মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার সহায়ক নহে। সংগীত, কবিতা, সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি সমাজের কোন কল্যাণে আসে না। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া অন্য কোন জনকল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিলে সমাজের বেশী উপকার হইয়া থাকে।

বিরুদ্ধ মতবাদ

কিন্তু এই মতবাদ সমর্থন করিতে পারা যায় না। সংস্কৃতি সৌন্দর্যের স্রষ্টা। সমাজের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকিবার জন্য মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই। এই বিশ্বের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার শিক্ষাও মানুষের লাভ করিতে হইবে। সত্য, শিব ও সুন্দরের মূল্যকে বিভিন্ন উপায়ে উপলব্ধি করিতে হইবে। সকলকে এমন অবসর-সময় দিতে হইবে, যাহাতে এই সময়ে সংগীত, সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদির চর্চা করিয়া সে নিজের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন কবিতে পারে। অনেকে অবার অবসর-সময় বৃথা বা অনৈতিক কাজে ব্যয় করে। এইজন্য অবসরসময়-যাপনের শিক্ষাও শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। ছাত্রাবস্থাতেই যাহাতে মানুষের সাহিত্য, কাব্য, সংগীত ইত্যাদিতে আগ্রহ জন্মে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মানুষ কিভাবে অবসর-সময় যাপন করে, তাহা দিয়াই মানুষের স্বরূপ বিচার করা যায়।

অবসর-সময়ে সংস্কৃতি-চর্চার প্রয়োজনীয়তা

কাজেই শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে মানুষ অর্থ-উপার্জনেরও উপযুক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসর-সময়েরও সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা লাভ করে।

৯। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of State's active participation in education) :

যদিও অনেক মনীষী শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করিয়া থাকেন, তথাপি রাষ্ট্র শিক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন

থাকিলে শিক্ষার প্রগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। রাষ্ট্র শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করিলে শিক্ষার প্রসার অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। যেমন, আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী সাধারণতঃ তাহাদের সন্তানদের শিক্ষিত করিতে চায় না। তাহাদের ধারণা, শিক্ষা সন্তানদিগকে শ্রমবিমুখ করিবে। এইজন্য তাহারা সন্তানদের শিক্ষাকার্যে বাধাপ্রদান করে, ফলে অশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার ব্যয় সংকুলান করা দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমাদের মত দরিদ্র দেশে অনেক প্রতিভা অর্থাভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখা যায়। ইহার ফলও সমাজেব পক্ষে খুব কল্যাণজনক নয়।

তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এত কম যে, সকলের স্থান-সংকুলান হয় না। যে-কয়টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সন্তানেরাই স্থান পায়, প্রকৃত মেধাবী দরিদ্র ছাত্রেরা ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে।

চতুর্থতঃ, শিক্ষা-সমাপনের পরেও উপযুক্ত চাকুরি না পাওয়ার ফলে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও অনেক যুবকের বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন কুঁড়িতেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই-সকল সমস্যাব সমাধান করিতে হইলে রাষ্ট্রকে অবশ্যই শিক্ষাকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। সমাজের প্রকৃত কল্যাণ কবিতে হইলে রাষ্ট্রকে প্রথমতঃ শিক্ষার ভার বহন করিতে হইবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার ব্যয়ভারও বাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। কোন ছাত্র যাহাতে অর্থাভাবে শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তৃতীয়তঃ, ছাত্রদের সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে যাহার যেদিকে ঝোঁক বা আগ্রহ, তাহাকে সেই শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। এই বিষয়ে রাষ্ট্র শিক্ষকদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া তাঁহাদের মতামত ও নির্দেশ অনুসারে কার্য করিবে। কারণ, শিক্ষকদের ছাত্রদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে; তাঁহারা এই বিষয়ে ছাত্রদেরও নির্দেশ দিবেন।

চতুর্থতঃ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় ছাত্রেরা প্রয়োজনমত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্র সকলের উপযুক্ত চাকুরির ব্যবস্থা করিবে। তাহা হইলেই সকলের শিক্ষা সার্থক হইবে ও জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে।

এক কথায়, শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থনৈতিক সমস্যা যাহাতে শিক্ষার গতিকে রুদ্ধ করিতে না পারে, রাষ্ট্র তাহার ব্যবস্থা করিবে। শিক্ষানীতির বিষয় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাবিদ্‌দের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র শিক্ষার উন্নতিতে অর্থসাহায্য করিয়া পরোক্ষভাবে শিক্ষানীতি পরিচালনা করিবে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করিবে না।

সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ (Cultural Associations)

১। সংস্কৃতিক অর্থ (The Meaning of Culture) ঃ

সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ লোক একটা অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই অধুনা সংস্কৃতিবান আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ও সংস্কৃতি এক নয়। সংস্কৃতিকে আধুনিক স্কুল-কলেজের শিক্ষার সহিত এক করিয়া ফেলিলে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা হয়।

সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা

অনেকে আবার কেবল নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদিকেই সংস্কৃতি আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃতি কেবল নৃত্য, গীত, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির আলোচনা নয়; সংস্কৃতি আরও ব্যাপক। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতি হইল মানবজাতির জীবনের ধারা (mode of life)। সংস্কৃতি কেবল শিষ্টাচার নয়, সংস্কৃতি হইল সামাজিক ঐতিহ্য। এই দিক হইতে বিচার করিলে সংস্কৃতি হইল মানুষের সকল আচরণের সমষ্টি (totality of behaviour)। টাইলর (Tylor) বলিয়াছেন, সামাজিক মানুষের সকল ক্ষমতা ও অভ্যাস সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত (Culture includes "capabilities and habits acquired by a man as a member of society."—Tylor)। সুতরাং মানবজীবনের সমস্ত স্বীকৃত আচরণকেই সংস্কৃতি বলা হয়। এক কথায়, মানুষের জৈবিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আন্তরিক ও বাহ্য সমস্ত কার্যের সমষ্টি হইল সংস্কৃতি। ইহাই সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক রূপ। ("Culture is the sum-total of the intellectual and material attainments of man to meet his biological and social needs. It is totality of the behaviour of a group of people or community.")

সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক রূপ

বিভিন্ন দার্শনিকও সংস্কৃতির বিভিন্ন সংজ্ঞানির্দেশ করিয়াছেন। ম্যাথিউ আর্নল্ড (Matthew Arnold) সংস্কৃতিকে 'sweetness and light'

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডিউই (Dewey) সংস্কৃতিকে বিপরীত দিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃতি কি, তাহা না বলিয়া সংস্কৃতি কি নয়, তাহাই তিনি বলিয়াছেন। যাহা কিছু অমার্জিত ও অশিষ্ট, সংস্কৃতি হইল তাহার বিপরীত ("It is opposed to raw and crude."—Dewey)। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে, তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।" অর্থাৎ আলো ও আলোর দীপ্তিকে তিনি সংস্কৃতি আখ্যা দিয়াছেন।

সংস্কৃতির দার্শনিক রূপ

এই-সকল সংজ্ঞা সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা নূতন দিকের নির্দেশ দিতেছে। মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন বা বিকাশের পথে অগ্রসর হওয়াকেই সংস্কৃতি বলা যাইতে পারে। পবিপূর্ণ বিকাশ বলিতে কেবল আত্মিক উন্নতি নয়, দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকারের উন্নতিসাধনই সংস্কৃতির লক্ষণ। মানুষ যত উন্নত হইবে, ততই সংস্কৃতিবান্ হইবে। সংস্কৃতিবান্ ব্যক্তিব দ্বারাই সমাজেব প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। মানুষের বিচাববুদ্ধি বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে বিরোধিতা ঘুচিয়া যাইবে। জীবন পূর্ণ ও আনন্দময় হইবে, সমাজে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরমের উপলব্ধিই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি সৌন্দর্যের স্রষ্টা, সংস্কৃতি সত্যকে উদ্ঘাটন করে, কল্যাণকে বহিয়া আনে।

সংস্কৃতি মানুষকে পরিপূর্ণতাব পথে অগ্রসব বরে

সংস্কৃতিবান্ হইতে গেলে সামাজিক শিক্ষা বা অর্থকরী শিক্ষা বর্জন করিলে চলিবে না। ব্যক্তিকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হইতে হইবে, পরিবাব ও সমাজের প্রতি তাহার কর্তব্যপালন করিয়া বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদির চর্চার দ্বারা মনকে সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরমের দিকে পারিচালিত করিতে হইবে।

সংস্কৃতিবান্ ব্যক্তিব কর্তব্য

২। সংস্কৃতি ও সভ্যতা (**Culture and Civilisation**)**ঃ**

"Civilisation is that kind of culture which includes the use of writing, the presence of cities and of wide

political organisation and the development of occupational specialisation." সভ্যতা এক প্রকারের সংস্কৃতি। লিখনক্ষমতা, শহর ও বিস্তৃত রাজনৈতিক সংগঠন এবং পেশাসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞতার উন্নতি ইত্যাদি সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতা মানুষের উন্নতির পরিচায়ক। মানুষের বুদ্ধি যতই উন্নত হয়, ততই মানুষ আপন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিতে পারে। বুদ্ধিবলে মানুষ আধুনিক যুগে প্রকৃতিকে আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই-সকল উন্নতি মানুষের সভ্যতার পরিচয় দেয়।

সংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে সভ্যতা সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে কোন কোন দার্শনিক সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সংস্কৃতি হইল কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর প্রকাশ ও উন্নতি।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই। তবে বর্তমান যুগে আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পৃথক বলিয়া মনে করি। গিসবার্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য সম্পর্কে বলিয়াছেন, সভ্যতা বাহ্য, যান্ত্রিক ও হিতজনক এবং উপায় লইয়া আলোচনা করে, আর সংস্কৃতি আলোচনা করে লক্ষ্য লইয়া, সংস্কৃতি আভ্যন্তরিক, অঙ্গীভূত ও চরম বিষয়। ("Thus civilisation is external and mechanical, utilitarian and concerned only with means, while culture as dealing exclusively with ends, is internal, organic and final."—Gisbert.) অর্থাৎ সভ্যতা বলিতে বাহ্য উন্নতি বুঝায়, আর সংস্কৃতি বলিতে আত্মার উন্নতি বুঝায়। বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা লোক সংস্কৃতিবান্ হয়, সংস্কৃতির প্রকাশ হয় মানুষের উচ্চস্তরের চিন্তা, ধর্ম, দর্শন, নীতিবোধ, কবিতা, সাহিত্য ইত্যাদির চর্চার মধ্য দিয়া। আর, মানুষের যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জীবন পরিচালনা করিবার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সভ্যতার পরিপ্রকাশ। এইজন্য গিসবার্ট বলেন: 'Civilisation is what we have; culture what we are."। অর্থাৎ আমাদের যাহা আছে, তাহাই হইল সভ্যতা, আর আমরা যাহা, তাহাই হইল সংস্কৃতি। তাঁহার মতে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত পার্থক্যগুলি বর্তমান:

গিসবার্টের মতবাদ

(ক) **সভ্যতা বলিতে বাহ্য উন্নতি বুঝায়, আর সংস্কৃতি বলিতে অভ্যন্তরীণ উন্নতি বুঝায়।** মানুষের কার্যকলাপ, যেমন—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ইত্যাদি দেখিয়া আমরা সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারি। কিন্তু সংস্কৃতির বিচার করিতে হইলে মানসিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। শিল্প, কলা, সাহিত্য ইত্যাদি মানুষের অন্তর্লোকের পরিচয় দেয়। কিন্তু সংস্কৃতির বিচার আবার সকলের কাছে একরূপ হয় না। একই বস্তু কাহারও কাছে সুশ্রী, কাহারও কাছে কুৎসিত, আবার কাহারও কাছে কোনটিই নয়। রুচিভেদে, সংস্কৃতিভেদে মানুষের বিচার বিভিন্ন হয়।

(খ) **সভ্যতার যাহা দান, তাহার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সহজ, কিন্তু সংস্কৃতির প্রকাশ উপলব্ধি করিতে হইলে সে-বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন।** যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও ব্যবস্থা করিবার জন্য খুব বেশী শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংগীতকলার মাধুর্য বা কারুকার্য উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। আবার সংগীত বুঝিবার মত শিক্ষা থাকিলেই সংগীতে দক্ষতা অর্জন করা যায় না।

(গ) **সভ্যতার উন্নতি হওয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সংস্কৃতির উন্নতি তত তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভব নয়।** সংস্কৃতির উন্নতিসাধন অনেক সময়সাপেক্ষ। সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের ফলে সংস্কৃতির গতি সময় সময় রুদ্ধ হইয়া যায়, আবার অনুকূল সময়ে ইহার উন্নতি হয়।

(ঘ) **সংস্কৃতির কাছে কর্মটাই মূল উদ্দেশ্য, আর সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য হইল কর্মের ফলাফল।** দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, কলা ইত্যাদির চর্চা করাটাই বড় কথা, ফলাফলটা বড় কথা নহে, কিন্তু সভ্যতার কাছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলাফলটাই বড়।

এইসকল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, সভ্যতা ও সাংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। উহারা একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার যখন উন্নতি হয়, সংস্কৃতিরও তখন উন্নতি হয়। আর, সংস্কৃতির উন্নতি হইলে সভ্যতারও উন্নতি হইতেছে বুঝা যায়। সংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে সভ্যতা সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং উহারা অভিন্ন।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক

৩। **সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য (Distinctive Aspects of Cultural Association) :** একই সমাজে বহু প্রকারের সঙ্ঘ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—রাজনৈতিক সঙ্ঘ, অর্থনৈতিক সঙ্ঘ, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ ইত্যাদি। বিভিন্ন সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। রাজনৈতিক স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। আর, আর্থিক স্বার্থলাভের জন্য অর্থনৈতিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। কিন্তু সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের সহিত এই-সকল সঙ্ঘের পার্থক্য আছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগীত-প্রতিষ্ঠান, শিল্পকলা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ বলা যাইতে পারে। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের নিজস্ব কতকগুলি **বৈশিষ্ট্য** বর্তমান।

সমাজের বিভিন্ন সঙ্ঘ

প্রথমতঃ, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের একটা উচ্চতর আদর্শ থাকে, যাহা ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার অনেক ঊর্ধ্বে। এই আদর্শলাভ করিতে হইলে মানুষকে অন্তরের যাবতীয় ক্ষুদ্রতা, নীচতা বিসর্জন দিতে হয়। সংস্কৃতির চর্চা মানুষকে অপার্থিব আনন্দলোকের দিকে লইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পরিচয় গভীর থাকে। একটি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সকলের মধ্যে এইরূপ পরিচয় থাকে না। কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির মধ্যে পরিচয় থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু পারস্পরিক যোগাযোগই সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য। এই যোগাযোগের মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের পরিধি বৃহৎ হইলেও তাহাদের মধ্যে পরিচয় ক্ষুণ্ণ হয় না, নানাপ্রকার সভাসমিতি ও লিখিত আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচয় বজায় রাখা হয়।

তৃতীয়তঃ, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের সভ্যেরা সকলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনে বা সংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহী ও অগ্রণী হইয়া থাকেন। সংস্কৃতির চর্চার দ্বারা তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন, সমাজের প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্ঘের দ্বারা সমাজে নানাপ্রকার বিরোধের সৃষ্টি হয়, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; কিন্তু সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ শান্তির প্রতীক। সংস্কৃতিবান্ ব্যক্তিরা ঐক্য ও শান্তি-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়া থাকেন। মানুষের বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষসাধন করিয়া সমাজের পরম কল্যাণ করেন।

চতুর্থতঃ, সমাজে একাধিক সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ পাশাপাশি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ সাধারণতঃ দেখা দেয় না। কিন্তু অন্যান্য সঙ্ঘ, যথা—রাজনৈতিক সঙ্ঘ একসঙ্গে একাধিক থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

পঞ্চমতঃ, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃজনশীল। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের স্বাধীনতায় বাধা প্রদান করিলে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, সৃজনীশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা একান্তই দরকার। রাষ্ট্র বা অন্য কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সঙ্ঘের পক্ষে তাহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। তাহাতে তাহাদের সহজ, সাবলীল গতি রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলিকে সহাযতা কবিলেও প্রত্যক্ষভাবে তাহাদেব নিয়ন্ত্রণ করা উচিত হইবে না।

৪। **সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্য (The Social Significance of Culture):** সংস্কৃতি মানুষের মনকে উন্নত কবে, জীবনকে আনন্দময় করে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হইতে সাহায্য করে। এইজন্য সমাজে সংস্কৃতির চর্চা হওয়া একান্তই প্রয়োজন। মানুষ যতই সংস্কৃতিবান্ হইবে, ততই সমাজে পারস্পরিক বিরোধ দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

সংস্কৃতিব প্রয়োজনীযতা

কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, সংস্কৃতিবান্ লোকেব সংখ্যা সমাজে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যাহারা ধনী, শিক্ষিত ও যাহাদের প্রচুর অবসর-সময় আছে, তাহাবাই সংস্কৃতির চর্চা করিতে পারে। সাধারণ লোকের সংস্কৃতিচচা করিবার মত অবসরও থাকে না, সেই শিক্ষাও অনেকের নাই। এইজন্যই সংস্কৃতি সমাজে ব্যক্তিগত বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজে সংস্কৃতিব সংকীর্ণতা

কাহারও কাহারও মতে সংস্কৃতির চর্চা অভিজাতবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কাবণ, উচ্চস্তরেব সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, দর্শন ইত্যাদি সাধারণ লোকের জন্য নহে, সাধারণ লোকের তাহাদের মাধুর্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার মত উন্নত শিক্ষা নাই। কাজেই যাহারা সংস্কৃতিবান্, সংস্কৃতিচর্চা করিবার মত প্রচুর অবকাশ যাহাদের আছে, তাহাদের মধ্যেই সংস্কৃতির চর্চা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

সংস্কৃতিব সীমানির্দেশ

কিন্তু এই মতবাদ সমর্থন করিতে পারা যায় না। সংস্কৃতিকে অন্যান্য ধন-সম্পদের মত কাহারও ব্যক্তিগত বস্তু মনে করা উচিত হইবে না। সংস্কৃতিতে সকলেরই সমান অধিকার বর্তমান। ম্যাকেঞ্জির মতে সংস্কৃতি সমগ্র মানব-জাতির। ইহা এমন কোন পার্থিব সম্পদ নহে, যাহার জন্য সমাজে বিরোধ বা সংঘর্ষ বাধিতে পারে। সংস্কৃতি মানুষকে পরস্পর-বিরোধী করে না। বরং সংস্কৃতির চর্চা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। কাজেই সংস্কৃতিকে কেবল অভিজাতবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে। মানব-প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ ফল হইতে কেহ যাহাতে বঞ্চিত না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্বসাধারণ সংস্কৃতিতে অংশ-গ্রহণ করিতে না পারিলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হওয়া সম্ভব নহে। জটিল দর্শন ও সাহিত্যের চর্চায় সকলের অধিকার স্থাপিত হইলে সমাজের সকলেরই তাহাতে কল্যাণ হয়। এইজন্য আদর্শ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে সংস্কৃতিচর্চা করিবার মত প্রচুর অবকাশ ও সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ম্যাকেঞ্জি বলিয়াছেন, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে সংস্কৃতিকে আভিজাত্যের স্তর হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

সংস্কৃতির ব্যাপকতার প্রয়োজনীয়তা

সংস্কৃতিই হইল মানব-জীবনের লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে যে-সকল সুপ্ত শক্তি আছে, তাহার পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বা আদর্শ। এই আদর্শলাভ করিতে পারিলে মানুষের পরম কল্যাণ সাধিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের সংস্কৃতির চর্চার দ্বারা এই পরম কল্যাণলাভ করা যাইতে পারে। প্রকৃত সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে মানব-প্রবৃত্তির চরম বিকাশসাধন হইয়া থাকে। মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত শক্তির বিকাশসাধনের দ্বারা সংস্কৃতিবান্ হইতে হয়। কোন বিশেষ এক দিকের উন্নতিকে সংস্কৃতি বলা যায় না। মানবের সুপ্ত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধনের দ্বারা সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরমের দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায়।

সংস্কৃতিই জীবনাদর্শ

সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে সকলকেই ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিয়া আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইতে হইবে। তাহা হইলে সকলেই আনন্দময় রাজ্যে বিরাজ করিতে পারিবে। এইরূপ আদর্শকে লাভ করা সহজ নহে, তবুও চেষ্টা করা দরকার। আদর্শলাভের চেষ্টার দ্বারাই প্রকৃত কল্যাণ হয়। সমাজের সকলেই সংস্কৃতিবান্ হইতে পারিলে সমাজে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এইজন্য সংস্কৃতির চর্চা হওয়া সমাজে একান্তই প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক উন্নতি (Social Development)

১। **সামাজিক উন্নতির তাৎপর্য** (Significance of Social Development): সমাজের উন্নতির প্রকৃত তাৎপর্য কি, অর্থাৎ কোন্ সমাজকে উন্নত সমাজ বলা যায়, এই সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

(১) কেহ কেহ বলেন, সামাজিক উন্নতির অর্থ ব্যক্তির উন্নতি, জনসাধারণের উন্নতি। সমাজে ব্যক্তি যদি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলেই সমাজের উন্নতি হয়। যে-সমাজের সকল ব্যক্তি উন্নত, শিক্ষিত, মার্জিতরুচিসম্পন্ন, সেই সমাজকেই আদর্শ বা উন্নত সমাজ বলা যায়।

(২) আবার কেহ কেহ বলেন, সমাজের উন্নতির সঙ্গে সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির উন্নতির কোন সম্পর্ক নাই। সমাজের সকল ব্যক্তি উন্নত, শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন হইতে পারে না। সমাজে কিছু ব্যক্তি উন্নত থাকিলেই তাহাকে উন্নত সমাজ বলা যায়। সমাজে দুই-একজন মনীষী জন্মগ্রহণ করিলেই যথেষ্ট, তাঁহারাই সমাজের সংস্কৃতির পরিচায়ক।

কিন্তু এই মতবাদ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, সকল ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ গঠিত। সকল ব্যক্তির উন্নতি না হইলে সমাজের কয়েকজন ব্যক্তির উন্নতির দ্বারা সমাজ কখনও আদর্শ সমাজে পরিণত হইতে পারে না। সমাজের সহিত প্রত্যেক ব্যক্তির আঙ্গিক সম্পর্ক বর্তমান। সুতরাং সমাজের কোন একটি ব্যক্তি যদি অনুন্নত, অমার্জিতরুচিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমস্ত সমাজের মধ্যে তাহার প্রভাব পড়ে। ব্যক্তির উন্নতির দ্বারা সমাজের উন্নতি হয়, আবার সমাজ উন্নত হইলে ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। সমাজ ও ব্যক্তির উন্নতি পরস্পর-নির্ভরশীল।

জনসাধারণের উন্নতি ও সামাজিক উন্নতি

হব্‌হাউসের মতে সমাজের উন্নতির বিশেষ চারিটি লক্ষণ হইতেছে: (ক) **মাত্রা** (Scale), (খ) **নিপুণতা বা দক্ষতা** (Efficiency), (গ) **স্বাধীনতা** (Freedom) এবং (ঘ) **সহযোগিতা** (Mutuality)।

সমাজের উন্নতির চারিটি লক্ষণ

(১) **মাত্রা** বলিতে হব্‌হাউস সমাজের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির কথাই বলিয়াছেন। সমাজে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বৃদ্ধি সমাজের উন্নতির পরিচায়ক।

(২) সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সকল কার্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করাকে তিনি **নিপুণতা** আখ্যা দিয়াছেন। আদর্শ সমাজের উদ্দেশ্য জনকল্যাণসাধন করা। এই উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত সমাজের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা অসংগতি থাকিবে না। সামাজিক কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সামাজিক উন্নতির একটি বিশেষ লক্ষণ।

(৩) সমাজের উন্নতির অপর একটি লক্ষণ ব্যক্তির **স্বাধীনতা**। সমাজস্থ ব্যক্তির কর্মে, চিন্তায় ও বাক্যে স্বাধীনতা থাকিবে। কারণ, জোর করিয়া কোন কাজে বাধ্য করিলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে সামাজিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৪) সমাজের উন্নতির চতুর্থ লক্ষণ **সহযোগিতা**, অর্থাৎ পরস্পরের কল্যাণের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করিতে হইবে। সকলের সহযোগিতা ভিন্ন সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।

হব্‌হাউসের মতে এই চারিটি উপাদান বর্তমান থাকিলে সমাজকে উন্নত সমাজ বলা যায়। ইহার কোন একটির অভাব হইলে সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হইবে।

হব্‌হাউস বলিয়াছেন, সামাজিক উন্নতির স্বরূপ তিনটি: (ক) **শক্তি** (Energy), (খ) **সংগঠন** (Organisation) ও (গ) **অপরিহার্য সামঞ্জস্য** (Vital harmony)। সমাজকে উন্নত করিতে হইলে সমাজের শক্তি, সুদৃঢ় সংগঠন ও কার্যাবলীর মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে।

সামাজিক উন্নতির স্বরূপ

সামাজিক উন্নতি বলিতে হব্‌হাউস বুঝিয়াছেন—'advancing fulfilment', অর্থাৎ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া। পরিপূর্ণতালাভই সমাজের আদর্শ, এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়াকেই সমাজের উন্নতি বলা হয়। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দ্বারা পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পরিপূর্ণতালাভ তখনই সম্ভব, যখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, নৈতিক বোধ জাগ্রত হয়, সকলে বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত ও মার্জিতরুচিসম্পন্ন

হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। এই বোধ সকলের মধ্যে এইরূপভাবে সঞ্চারিত করিতে হইবে যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন কোন জনকল্যাণকর কাজ সম্ভবপর হয় না। সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা মানুষের অন্তর হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসা উচিত। তাহাতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ হয়।

এইজন্য সমাজের সকলেরই বিচারবুদ্ধি বিকশিত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরের সহযোগিতা করিবে, জনকল্যাণকর কার্যে উদ্বুদ্ধ হইবে, সমাজ উন্নত হইবে। এইখানেই নৈতিক উন্নতির সহিত সামাজিক উন্নতির মিল দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, ব্যক্তির নৈতিক উন্নতির উপর নির্ভর করে সমাজের উন্নতি। সামাজিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতি এক ও অভিন্ন, উভয়েরই লক্ষ্য এক।

২৬। **সামাজিক উন্নতির শর্তাবলী** (The Conditions of Social Development): হব্‌হাউস মনে করেন যে, সামাজিক উন্নতি চারিটি শর্তের উপর নির্ভরশীল, যথা— (ক) **পরিবেশ-সম্পর্কীয় শর্ত** (Environmental), (খ) **জৈবিক-সম্পর্কীয় শর্ত** (Biological), (গ) **মনস্তত্ত্ব-মূলক শর্ত** (Psychological) ও (ঘ) **সমাজতত্ত্ব-সম্পর্কীয় শর্ত** (Sociological)।

(ক) পরিবেশ-সম্পর্কীয় শর্ত: এই ক্ষেত্রে পরিবেশ বলিতে কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশকে বুঝায় না। প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ভৌগোলিক—সমস্ত লইয়াই পরিবেশ। ইহাদের সকলের উপরেই সামাজিক উন্নতি নির্ভরশীল।

অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশ ও সমাজের উন্নতি

অনুকূল পরিবেশে সামাজিক উন্নতি দ্রুত হয়, আর পরিবেশ প্রতিকূল হইলে সামাজিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সামাজিক সংগঠনও পরিবেশের প্রভাবে গঠিত হয়। কারণ, মানুষের প্রয়োজন, শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে সামাজিক সংগঠন গঠিত হইয়া থাকে, এবং প্রয়োজন ও শক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকিলে অনেক সময় লোক আরামপ্রিয় হয়। আর যে-দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল, সে-দেশের লোক খুব শ্রমশীল হইয়া উঠে। কাজেই অনুকূল পরিবেশও অনেক সময় সমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, আর প্রতিকূল

পরিবেশ সমাজের উন্নতির সহায়ক হয়। প্রতিকূল পরিবেশ মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে। সুতরাং অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থাই সামাজিক উন্নতির সহায়ক হয়।

মানুষের প্রকৃতিও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পরিবেশ সামাজিক উন্নতির অন্যতম শর্ত।

(খ) **জৈবিক শর্তাবলী**: সামাজিক উন্নতির জৈবিক শর্ত হইল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম (Struggle for existence)। বিবর্তনবাদী ডারউইন জীবের অভিব্যক্তি সম্পর্কে যে-মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাকেই সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সমাজের উন্নতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডারউইনের মতে জীবদের মধ্যে খাদ্যলাভের ও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একটা প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ইহাকে তিনি জীবনযুদ্ধ বা Struggle for existence বলিয়াছেন। এই জীবনযুদ্ধে যাহারা শক্তিশালী, তাহারা জয়ী হয়, আর যাহারা দুর্বল, তাহারা ধীরে ধীরে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। বিবর্তনবাদীরা সামাজিক উন্নতিকে 'জীবনযুদ্ধ' ও 'যোগ্যতমের বাঁচিবার অধিকার' ('Survival of the fittest')—এই নীতিতে ব্যাখ্যা করেন। সমাজে যাহারা যোগ্যতম, তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, আর যাহারা দুর্বল তাহাদের বাঁচিবার কোন অধিকার নাই। সুতরাং যোগ্যতম ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজের ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

জীবন-যুদ্ধ ও সমাজের উন্নতি

কিন্তু বিবর্তনবাদীদের এই মতবাদ মানব-সমাজে প্রযোজ্য নহে। (১) মানব-সমাজের যোগ্যতা কেবল শারীরিক শক্তির দ্বারা বিচার করা যায় না। সমাজে যে কেবল শক্তিশালী ব্যক্তিরাই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী তাহা নহে, সমাজ কখনও দুর্বল ব্যক্তিদের বর্জন করে না। বরং তাহাদের চিকিৎসার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। (২) মানুষ নীতিবাদী ও আদর্শবাদী। কেবল শারীরিক শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া মানুষ যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার করে না। (৩) শুধু শক্তিশালী ব্যক্তিরাই বাঁচিবার অধিকারী হইলে সমাজের ক্রমোন্নতি রুদ্ধ হইয়া যাইত।

জৈবিক শর্তাবলীর সমালোচনা

সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন-সংগ্রামের মাত্রা হ্রাস

পাইতে থাকে। সুতরাং বিবর্তনবাদীদের নীতি মানব-সমাজে প্রযোজ্য নহে।

এইরূপ সমালোচনার ফলে বিবর্তনবাদীদের মতবাদ বর্তমানে পরিবর্তিত আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা বলেন, এইখানে প্রতিযোগিতা বলিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিযোগিতাকে বুঝাইতেছে না, এক সমাজগোষ্ঠীর সহিত অন্য সমাজগোষ্ঠীর প্রতিযোগিতা বুঝাইতেছে। এই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে প্রতিযোগিতায় যে-গোষ্ঠী শক্তিশালী, সেই গোষ্ঠীই বাঁচিয়া থাকিবে।

সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিযোগিতা ও সমাজের উন্নতি

সমালোচনাঃ কিন্তু এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, (১) এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। (২) বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ আছে সত্য, কিন্তু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম বলা যায় না। (৩) এই সংগ্রামের কারণ মানুষের নীতিবোধের, ঐক্যবোধের ও সুসংবদ্ধ শাসন-ব্যবস্থার অভাব।

আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক সামাজিক সংগঠনের দ্বারা বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধমূলক ভাবের অবসান ঘটাইবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল বিরোধের অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

বিবর্তনবাদীরা আরও বলেন যে, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য যাহারা সুস্থ, সবল ও বিচারবুদ্ধিশীল, তাহাদের বিবাহ করিতে বাধ্য করা উচিত। সুস্থ, সবল, বিচারবুদ্ধিশীল পিতামাতার সন্তান সুস্থ ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। কারণ, সন্তানেরা পিতামাতার অনেক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে। এইজন্য যোগ্যতম পিতামাতা নির্বাচন করিতে পারিলে সামাজিক উন্নতি দ্রুত হইবে। সুতরাং বিবর্তনবাদীদের মতে সমাজের উচিত উপযুক্ত নরনারীকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা এবং যাহারা অনুপযুক্ত বা দুর্বল, তাহাদের বিবাহ করিতে বাধা দেওয়া।

সুস্থ সবল পিতামাতা ও সমাজের উন্নতি

এই মতবাদ যুক্তিপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু (১) কেবলমাত্র উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর দ্বারাই যে সামাজিক উন্নতি সম্ভব হইবে, তাহা আশা করা যায় না। একজন সংগীতজ্ঞের সন্তান যে সংগীতজ্ঞ হইবে, বা শিক্ষিত লোকের সন্তান যে শিক্ষিত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। (২) ভাইসম্যানের

মতবাদ অনুসারে পিতামাতার অর্জিত গুণ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না।

সমালোচনা

সংগীতজ্ঞের সন্তান যদি সংগীতজ্ঞ হয়, তাহার কারণ কেবলমাত্র উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলী নহে, যে-পরিবেশে সন্তান বড় হইয়াছে, সেই পরিবেশের প্রভাবেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে।

সুতরাং একমাত্র উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর দ্বারা যে সামাজিক ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়, এই মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে। ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না।

উপসংহার: মানুষ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে না, মানুষ সংগ্রাম করে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনের জন্য। সামাজিক উন্নতির প্রধান কারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন সমাজের দ্বারাই সম্ভব। সমাজই ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আবার ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও উন্নত হয়।

(গ) **মনস্তত্ত্বমূলক শর্ত:** মানুষের জীবনকে প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত করিতেছে তাহার মন। ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্মপ্রবৃত্তি লইয়াই মন। মনই মানুষকে চালিত করে। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক শর্তকে সামাজিক উন্নতির

উন্নত মন ও সামাজিক উন্নতি

অন্যতম শর্ত বলা যায়। উন্নত, বিচারবুদ্ধিশীল মনের দ্বারাই সামাজিক ক্রমোন্নতি সম্ভব। তবে মানুষ প্রথমেই বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য করে না। হব্‌হাউসের মতে সমাজে মানুষ প্রধানতঃ আবেগের বশে কাজ করিয়া থাকে। তখন কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষ সচেতন থাকে না। সুখ-দুঃখের অনুভূতি ও সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে আবেগের বশে কার্যসম্পাদন করে; বিচার করিয়া কার্য করে না।

কিন্তু সমাজের উন্নতি করিতে হইলে এই আবেগকে দমন করিতে হইবে,

হব্‌হাউসের মতবাদ

সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে হইবে। হব্‌হাউস বলেন, মানুষ যখন মূলস্বার্থের (Root-interest) দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করে, তখন কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে সচেতন হয়। তখন সে কেবল আবেগের বশে কাজ করে না, বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হয়। বিচারবুদ্ধিশীল মনই সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে পারে।

হব্‌হাউসের মতে মূলস্বার্থ* চারিপ্রকারের হইতে পারে: আত্মস্বার্থ, সামাজিক স্বার্থ, জ্ঞানমূলক স্বার্থ ও গঠনমূলক স্বার্থ।

বিভিন্ন প্রকারের মূলস্বার্থ

এইসকল স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে পারিলেই মনের প্রকৃত উন্নতি হয় এবং এইরূপ মনই সামাজিক ক্রমোন্নতির সহায়ক হয়। কোন একটি স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে সমাজে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। বিচারবুদ্ধিশীল মন এই-সকল বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে ও সামাজিক ক্রমোন্নতির সহায়ক হইতে পারে।

(ঘ) **সমাজতত্ত্ব-সম্পর্কীয় শর্ত**ঃ সামাজিক চেতনাবোধই সামাজিক ক্রমোন্নতির চতুর্থ শর্ত। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ থাকা একান্তই প্রয়োজন। ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সামাজিক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সামাজিক স্বার্থই প্রাধান্যলাভ করিবে। কারণ, সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকের সহযোগিতার উপর সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে। সমাজে ব্যক্তি কেবল নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে না, অপরের কথাও তাহাকে ভাবিতে হয়, অপরের কার্যে সাহায্য করিতে হয়। সে যে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল—এই জ্ঞান থাকাকেই সামাজিক চেতনাবোধ বলা হইতেছে।

সামাজিক চেতনাবোধ ও সমাজের উন্নতি

সামাজিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি কেবল আবেগের বশে কোন কার্য করে না, বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য করে। ফলে সে সামাজিক কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, সামাজিক কল্যাণকে বাদ দিয়া তাহার একার কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

সমাজকে এমন একটি সাধারণ ইচ্ছায় (General will) পরিণত করিতে হইবে, যাহার একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে সামাজিক কল্যাণসাধন করা। সামাজিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারাই সমাজকে এইরূপ সাধারণ ইচ্ছায় পরিণত করা সম্ভব হইতে পারে। সকলের মনে সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিতে পারিলে সামাজিক

সাধারণ ইচ্ছা ও সামাজিক উন্নতি

* মূলস্বার্থ ৬০ পৃঃ দেখ।

উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হইবে। এইজন্য সামাজিক উন্নতির অন্যান্য শর্ত অপেক্ষা সমাজতত্ত্ব-সম্পর্কীয় শর্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

৩। সামাজিক আদর্শ (Social Ideals) :

(১) সামাজিক আদর্শের সাধারণ তাৎপর্য (The general significance of Social Ideals) : সমাজ বিবর্তনশীল। বিবর্তন-প্রক্রিয়ার ফলে সমাজ নিযত পরিবর্তিত হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। আদিম-কাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমাজ বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এই-সকল পরিবর্তনকে আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক বলিযা মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা আকস্মিক নহে। কারণ, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারেব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন সময়ে সমাজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, আবার কোন সময়ে সমাজের চরম অবনতি ঘটিযাছে। সমাজের এইরূপ বিবর্তনের জন্য মানুষেরাও কিছুটা দায়ী। কারণ, উন্নত মানুষের দ্বারা সমাজ উন্নত হইযাছে, আবার মানুষের অবনতিতে সমাজেরও অবনতি ঘটিয়াছে। যাহা হোক, সমাজের মধ্যে নিরন্তর একটা পরিবর্তন ও বিবর্তন সংঘটিত হইতেছে।

সমাজ বিবর্তনশীল

যে-বস্তু জন্মে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার মধ্যে একটা পরিবর্তন আছে। সেই পরিবর্তনের মাধ্যমে তাহার সুপ্ত শক্তি একদিন বিকশিত হয়। বীজের মধ্যে ভবিষ্যতের বৃক্ষ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজের পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সেই বৃক্ষকে বিকশিত করা। জীবের মধ্যেও দেখা যায, অনুরূপ পরিবতনের মাধ্যমে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হয়।

পরিবর্তনের মাধ্যমে সুপ্ত শক্তিব বিকাশ

নিম্নস্তরের জীবের বেলায় এই-সকল শক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। একটি বীজ হইতে একটি নির্দিষ্ট গাছ জন্মিতে পারে, বা একটি জীবকোষ হইতে একটি বিশেষ জীব জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এই পরিবর্তন তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি বিকাশের দ্বারা সম্ভবপর হয়। বাহির হইতে শক্তির প্রয়োগ করিলে খুব সামান্য পরিবর্তনই সাধিত হইতে পারে। মানুষের দৈহিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। মানুষের শারীরিক পরিবর্তন করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং যদিও কিছু সম্ভব হয়, তাহা খুবই সামান্য।

জীবের অন্তর্নিহিত শক্তিব সীমা

কিন্তু মানবজাতির উন্নতি সম্পর্কে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানিতে পারা যায় না। আমাদের সম্পর্কে ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সীমাহীন উন্নতি হওয়া সম্ভব। আমাদের মধ্যে যে-অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, উপযুক্ত সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করা যায়। ব্যক্তি আদর্শের দিকে অগ্রসর হইলে, সমাজও আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবে। সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ব হইতে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তবে সমাজের বর্তমান পরিবর্তন ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। সমাজের মধ্যেই তাহার ভবিষ্যৎ আদর্শ নিহিত থাকে। একদিন হয়ত এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইবে।

মানবের শক্তি অসীম

(২) **সামাজিক আদর্শের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা:** ম্যাকেঞ্জির মতে সামাজিক আদর্শ দুই প্রকারের হইতে পারে: **অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ** (Aristocratic Ideal) ও **গণতান্ত্রিক আদর্শ** (Democratic Ideal)।

*(ক) **অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ** (**The Aristocratic Ideal**): অভিজাততান্ত্রিক সমাজ বলিতে অভিজাত বা জ্ঞানী, গুণী বক্তিদের শাসন বুঝায়। প্লেটো তাঁহার Republic গ্রন্থে এই অভিজাততান্ত্রিক শাসনকে সমাজের আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, সমাজ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত। কারণ, প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে। শ্রেষ্ঠ দেবতুল্য ব্যক্তিরা আপন স্বার্থবিসর্জন দিয়া জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করিবে, শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবে এবং তাহারা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে। কারলাইলও (Carlyle) অভিজাততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন: "It is the everlasting privilege of the foolish to be governed by the wise." অর্থাৎ "বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হওয়া অজ্ঞ ব্যক্তিদের একটা চিরন্তন সুবিধা।" এই মতবাদ অনুসারে সমাজের শাসকবৃন্দ সৎ, মহৎ, বীর, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ হইবেন। শাসকবর্গ কেবল ক্ষমতালিপ্সু হইলে চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সকলের সেবক হইতে হইবে। প্লেটো এইজন্য শাসকবর্গের জন্য যে-নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাহাদিগের কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। শাসকবর্গ ভোগী

অভিজাত সম্প্রদায় ও সামাজিক আদর্শ

* ১৪১ পৃঃ দেখ।

হইবে না—কর্মী হইবে, সমাজের স্বার্থের জন্য তাহাদিগকে আপন সুবিধা বিসর্জন দিতে হইবে। প্রকৃত সৎ ও মহৎ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ শাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না।

সমালোচনা : কিন্তু এই মতবাদের অনেকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, কি উপায়ে সমাজ হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বাছাই করা সম্ভব হইবে? প্লেটো বলিয়াছেন, যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে, যথা—সংগীত, ব্যায়ামচর্চা, ব্যবসা, সমাজশাসন, দর্শন ইত্যাদির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই সমাজের শাসক হইবার মত যোগ্যতা অর্জন করিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায়ও নানা অসুবিধা আছে। প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া বা বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টকর। দ্বিতীয়তঃ, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উপরে শাসনভার ন্যস্ত থাকিলে সমাজের উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। তাঁহারা যদি শাসকের আসনে বসিয়া ক্ষমতালিপ্সু হইয়া উঠেন, জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা আপন স্বার্থ-সিদ্ধিতেই ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক।

*(খ) **গণতান্ত্রিক আদর্শ** (The Democratic Ideals) : গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আদর্শ হইল জনসাধারণের দ্বারা সরকার গঠন। যেখানে সমগ্র জাতির একটা বৃহৎ অংশ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে, তাহাকেই গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয়। জনসাধারণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন-কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের সকলের সমান অধিকার, সাম্যনীতি ইত্যাদি স্বীকৃত হয়। প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের অতি সুন্দর সংজ্ঞা-নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গণতন্ত্র জন-সাধারণের সরকার, ইহা জনসাধারণের জন্য ও জনসাধারণের দ্বারা গঠিত ("A government of the people, for the people and by the people")। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়।

জনসাধারণের সমান অধিকার-স্থাপনের দ্বারা আদর্শসমাজ গঠন

সমালোচনা : কিন্তু অনেকে গণতান্ত্রিক সরকারের নিন্দা করিয়াছেন। প্লেটো গণতান্ত্রিক সরকারের বিরোধী ছিলেন। Carlyle ও Ruskin এইরূপ সরকারের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। (১) সমগ্র জাতির একটা বৃহৎ অংশ শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবে, ইহাকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

---

* ১৪২ পৃঃ দেখ।

(২) অভিজাততান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের দ্বারা গঠিত না হইলেও ইহা জনসাধারণেরই সরকার এবং জনসাধারণের কল্যাণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। অভিজাততান্ত্রিক মতবাদীরা বলেন যে; গণতান্ত্রিক সরকার কোন সরকারই নয়, ইহাকে অরাজকতা বা anarchy-র একটা ভিন্ন রূপ বলা যায়। তাঁহাদের মতে গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নহে, ইহা শক্তিশালী ও প্রভাবশালীদের সরকার। গণতান্ত্রিক মতবাদীরা ইহার উত্তরে বলেন যে, গণতন্ত্রের আদর্শ হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য জনকল্যাণসাধন করা, যাহা অভিজাততান্ত্রিক সরকার সর্বদা করে না।

(৩) গণতান্ত্রিক সরকার স্বল্পকালস্থায়ী। সাধারণতঃ ইহা কোন একটি বিশেষ দলের সরকার। নির্বাচনে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, সেই দলই সরকার গঠন করে এবং সরকার-পক্ষের সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে বিপক্ষ দলের বিরোধিতা করা। জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া তাহারা আপন দলগত স্বার্থরক্ষার কাজেই ব্যস্ত থাকে। এইরূপ স্বল্পকালস্থায়ী সরকারের জনসাধারণের কল্যাণ সম্পর্কে কোন দূরদৃষ্টি থাকে না।

(৪) ম্যাকেঞ্জির মতে গণতান্ত্রিক ও অভিজাততান্ত্রিক উভয় মতবাদেরই যথেষ্ট ত্রুটি আছে। গণতান্ত্রিক আদর্শ সাম্যবাদকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়, সমাজের গুণী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা উপযুক্ত সম্মান ও সমাদর পায় না। এই কারণে গণতন্ত্রে ব্যক্তিত্বের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৫) ব্রাউনিং (Browning)-এর ভাষায় গণতন্ত্র সুদক্ষ বা উপযুক্ত ব্যক্তি চায় না, সমগ্র জাতিকেই হঠাৎ বড় করিতে চায়। কিন্তু সমগ্র জাতিকে একদিনে উন্নত করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হয় এবং জাতির উন্নতি-পরিচালনার জন্য চাই সুদক্ষ ব্যক্তিত্বশীল ব্যক্তির প্রভাব।

কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারের আদর্শ যে মহান্, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার আদর্শ হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। আদর্শ সমাজেরও উদ্দেশ্য সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা, সকলকে বাক্যের ও কার্যের স্বাধীনতা দান করা, সমাজে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করা, জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা।

অভিজাততান্ত্রিক আদর্শের কতকগুলি ত্রুটি আছে। উপযুক্ত ব্যক্তিকে আবিষ্কার করা এবং তাহাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ করার প্রণালী সম্বন্ধে ইহা

সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারে না। উপযুক্ত ব্যক্তিরা সর্বদা শাসনকার্য-পরিচালনার ব্যাপারে উৎসাহীও হয় না। এইজন্য প্লেটো বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত শাসককে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে বাধ্য করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কার্যকর করা সম্ভব হয় না।

অভিজাততান্ত্রিক সরকারের ত্রুটি

উপসংহার: এইজন্য ম্যাকেঞ্জি মনে করেন, গণতান্ত্রিক ও অভিজাত-তান্ত্রিক উভয় আদর্শের মধ্য হইতেই কল্যাণকর গুণগুলি লইয়া আদর্শ সমাজ গঠন করিতে হইবে। যে-দেশের জনসাধারণ অজ্ঞ, মূর্খ, যাহাদের মধ্যে একতা নাই, তাহাদের শাসক শ্রেষ্ঠ ও গুণী ব্যক্তিরা হইলেই ভাল হয়। অবস্থার পরিবর্তন হইলে, শাসনব্যবস্থা পরে পরিবর্তিত হইতে পারে। জনসাধারণ যতই একতাবদ্ধ, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হইবে, ততই তাহারা গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত হইবে। গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে পারিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে আশা করা যায়।

উভয়ের সমন্বয়-সাধন

কিন্তু অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শকেই সমাজের একমাত্র আদর্শ বলা যায় না। রাষ্ট্রের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, রাষ্ট্র রাজতন্ত্র হইতে, গণতন্ত্র গণতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। গণতন্ত্রকেও প্রকৃত আদর্শ বলা যায় না, ম্যাকেঞ্জি নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যতদিন জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন না হয়, ততদিন রাজতন্ত্র চলিতে পারে। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, সমাজের প্রকৃত কল্যাণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

রাষ্ট্রের গতি

গণতান্ত্রিক সরকারও ত্রুটিহীন নহে। গণতন্ত্রের আদর্শ—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী এবং শান্তি, সৌভাগ্য ও উন্নতি। আদর্শ হিসাবে ইহারা প্রকৃতই সকলেরই কাম্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারাই আদর্শ সমাজের একমাত্র আদর্শ নয়। মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে আরও যে-সকল উচ্চতর বৃত্তি আছে, তাহাদের উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে। মানুষের বিচার-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষসাধন সমাজের অন্যতম আদর্শ হওয়া উচিত। বিচার-বুদ্ধিশীল ব্যক্তির দ্বারাই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হওয়া সম্ভব। আদর্শ

মানবের উৎকর্ষ সাধনই আদর্শ

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিশীল হওয়া একান্ত দরকার, নতুবা আদর্শ লাভ করা বা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

বিচারবুদ্ধির স্তরে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নীত করিতে হইলে, সমাজের সকল রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে। মানুষের কার্যাবলী, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয়সাধনের দ্বারা আদর্শ সমাজ গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় এবং তাহা করিতে হইলে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী, ন্যায়পরতা ও প্রেমের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

সকল অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয়সাধন

(১) **স্বাধীনতা** (**Liberty**) : আদর্শ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবে স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। একের স্বাধীনতা যাহাতে অন্যের স্বাধীনতায় বাধাসৃষ্টি না করে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুস্থ, শিক্ষিত ও সংযত ব্যক্তিরাই প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভের অধিকারী।

স্বাধীনতা ও ব্যক্তি

এইজন্য সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে সকলেরই স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করিতে হয়। সভ্য সমাজের নাগরিকেরা বাক্যের স্বাধীনতা দাবী করে, কারণ মানুষের প্রকাশকে বাধা দিলে সেই সমস্ত কথাই চাপা থাকিবে, যাহা প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। তবে জনসাধারণের কথাবার্তায় সাধারণ সংযম থাকিলে তাহাদিগকে বাক্যের স্বাধীনতা দেওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতাও সময় সময় সীমাবদ্ধ করিতে হয় সমাজের বৃহত্তর প্রয়োজনে। যেমন যুদ্ধের সময় বাক্যের স্বাধীনতা বজায় থাকিলে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। এইজন্য এই সময় বাক্যের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। কিন্তু যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও শান্তি-কালীন অবস্থায়ও পূর্ণ স্বাধীনতার একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। যেমন কোন লোক কাহাকেও বিনা অপরাধে মিথ্যাবাদী বা চোর, ডাকাত, খুনী ইত্যাদি অপবাদ দিতে বা অপমান করিতে পারিবে না; এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতে দেওয়া যায় না, যাহাতে অন্যের শান্তির ব্যাঘাত হইতে পারে। এই-সকল বিষয়ে রাষ্ট্রীয় শাসনকে নৈতিক শাসনরূপে গণ্য করা উচিত।

স্বাধীনতার সীমা

সুতরাং মানুষের স্বাধীনতা যদি সমাজের আদর্শে বাধা দেয়, তাহা হইলে সেই স্বাধীনতা কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার।

(২) **সাম্য (Equality) :** সাম্য বলিতে সকলের সমান অধিকার বুঝায়। সাম্যের বিভিন্ন রূপ আছে, যথা—অর্থনৈতিক সাম্য, রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য ও সামাজিক সাম্য।

অর্থনৈতিক সাম্যই কাম্য

অর্থনৈতিক সাম্য : সমাজতন্ত্রবাদী ও সমভোগবাদীরা অর্থনৈতিক সাম্যের পক্ষপাতী। অর্থাৎ সমাজের উৎপাদিত সামগ্রীর উপর সকলের সমান অধিকার থাকিবে, সকলেই তাহা সমানভাবে ভোগ করিবে। "Among friends all things are common."—ইহাই তাহাদের নীতি।

সাম্য বজায় রাখিবার অসুবিধা

কিন্তু এইরূপ সাম্য সমাজে বজায় রাখা সর্বদা সম্ভব হয় না। কারণ, বিভিন্ন লোকের জীবিকানির্বাহের প্রণালী বিভিন্ন, কর্ম বিভিন্ন। সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনও বিভিন্ন। কবি বা দার্শনিক বা ধার্মিকের পক্ষে যেরূপ সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করা সম্ভব, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। কারণ, তাহার গবেষণাকার্যের জন্য বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। এইজন্য প্রয়োজন অনুসারে সামগ্রীর বণ্টন হওয়া উচিত।

সাম্য উন্নতির প্রতিবন্ধক

দ্বিতীয়তঃ, সমভোগবাদীরা বলে, উৎপাদিত সামগ্রী সমানভাবে বণ্টন করা উচিত। কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করিলে শ্রমিক ও প্রকৃত কর্মীরা তাহাদের শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে না। অন্যদিকে যাহারা শ্রমবিমুখ তাহারা বিনা পরিশ্রমেই সামগ্রীর সমান অংশ লাভ করিবে। মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তু কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিবে—ইহাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, বিনা পরিশ্রমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগৃহীত হইলে মানুষের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পরিবারের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই, সম্পত্তির বণ্টন একেবারে সমানভাবে হয় না। সুতরাং সমাজেও প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য : রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বলিতে রাষ্ট্র ও আইনের নিকট সকলেই সমান—ইহাই বুঝায়। অর্থাৎ সমাজে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। সকলের প্রতি সমান আচরণ করিতে হইবে।

সামাজিক সাম্য : সামাজিক সাম্য বলিতে সমাজের অন্তর্গত সকল

ব্যক্তিই সমান—ইহাই বুঝায়। জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে কোন বিভেদ থাকিবে না, ইহাই সামাজিক সাম্যের মূলনীতি। মনুষ্যত্বই মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত করিয়াছে। মানুষে মানুষে একত্ব উপলব্ধি করিলে জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ দূরীভূত হয়। তবে সাধারণ লোক ও মহৎ ব্যক্তির মধ্যে যে-পার্থক্য বর্তমান তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই পার্থক্যের দ্বারা সামাজিক সাম্য নষ্ট হয় না।

সামাজিক সাম্যই সমাজের আদর্শ

৩। **মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব (Fraternity) :** সামাজিক ঐক্য, শান্তি ও আদর্শের ভিত্তি হইল মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্ব। সমাজের সকলের মধ্যে মিত্রতা বা বন্ধুত্বের ভাবকেই মৈত্রী বলা হয়। সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে এই ভাবের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। সকলেই সকলকে যদি বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে বিরোধ ও বিভেদ দূরীভূত হইবে, ঐক্য-প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে।

মৈত্রী ও সামাজিক ঐক্য

স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ব্যতীত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আদর্শ হইল ন্যায়পরতা।

৪। **ন্যায়পরতা (Justice) :** বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি ন্যায়পরতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। প্লেটো ইহাকে বিচারশক্তির সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং যেখানে বিচারশক্তি প্রয়োগ করা যায়, সেইখানেই ন্যায়পরতা সম্ভব। প্লেটো মনে করেন যে, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়াই ন্যায়-পরতা। কিন্তু সামাজিক ন্যায়পরতা বলিতে কেবল প্রাপ্য বস্তুকেই বুঝায় না। সকলকে বিকশিত হইবার, জীবনের পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ দান করিলেই সামাজিক ন্যায়পরতা রক্ষা করা সম্ভবপর।

ন্যায়পরতা কি ?

ন্যায়পরতা রক্ষা করা সমাজের অন্যতম আদর্শ। কারণ, ন্যায়পরতার ভিত্তিতেই সমাজকে আদর্শের পথে ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করা যাইতে পারে।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন করিবার জন্য ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজন। সকল ব্যক্তি সমান সম্ভাবনা লইয়া

জন্মগ্রহণ করে না। বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা বিভিন্ন। কাজেই তাহাদের মানসিক প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হইবার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়াই সমাজের কর্তব্য। সুযোগ-সুবিধার অভাবে কাহারও জীবন যেন ব্যর্থ হইয়া না যায়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ সমাজে এইরূপ ন্যায়পরায়ণতা দেখা যায় না। কেহ কেহ এ বিষয়ে খুবই ভাগ্যবান্, আবার কেহ কেহ এতই হতভাগ্য যে, তাহাদের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাহা বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না, ফলে জীবন তাহাদের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সমাজের এইরূপ পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত অন্যায়। শাসকবর্গের উচিত ন্যায়পরতার ভিত্তিতে সকল কার্য সম্পাদন করা, যাহাতে সমাজের সকলের কল্যাণ সাধিত হয়। সকলেই স্বাস্থ্য, সুখ, প্রয়োজনীয় অর্থ, জীবনের উন্নতি ইত্যাদি কামনা করে। রাষ্ট্রের উচিত এই আদর্শ লাভ করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে-কাজ করা হয়, তাহাকেই ন্যায়সঙ্গত কাজ বলা যায়।

ন্যায়পরতা রক্ষা করিবার উপায়

কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, কেবল শাসকবর্গের চেষ্টার দ্বারা পরম কল্যাণ লাভ করা যায় না, জনগণের সহযোগিতা ব্যতীত প্রকৃত জনকল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। তবুও কল্যাণ-লাভের চেষ্টার দ্বারাই অর্ধেক কল্যাণলাভ হয়। শাসকবর্গের জনকল্যাণের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হইলেও তাহাদিগকে জনকল্যাণমূলক কাজ করিতে হইবে। এমনভাবে সমাজকে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে জনগণ তাহাদের পরম কল্যাণকে লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহাদের আত্মবিকাশের সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়।

জনসাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু প্রশ্ন হইল—রাষ্ট্র সমাজের জন্য এমন কি সুব্যবস্থা করিতে পারে, যাহার দ্বারা সকলের কল্যাণ হয়? এবং কি ভাবে নানা পরিবর্তন ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সুব্যবস্থা বজায় রাখা যাইতে পারে?

অ্যারিস্টটল প্রথম প্রশ্নের সম্পর্কে **বণ্টনমূলক ন্যায়পরতার (Distributive Justice)** এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্পর্কে **সংশোধনমূলক ন্যায়পরতার (Corrective Justice)** কথা বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পারস্পরিক ন্যায়পরতা (Justice

দুই প্রকারের ব্যবস্থা

in exchange) বলিয়া অপর এক প্রকারের ন্যায়পরতার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের ন্যায়পরতারই

' (ক) **বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা** (Distributive Justice): জনকল্যাণের মহৎ আদর্শকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কিরূপ ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজন, তাহার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্লেটোর মত

প্লেটোর মতে যে যে-কাজের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কাজে নিয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফললাভ হয়। কিন্তু প্লেটোর এই ধারণাকে কার্যকর করা কোন বড় রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় না। এমন কি, ছোট রাষ্ট্রের পক্ষেও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা অসম্ভব। তবে ইহা সত্য যে, সম্পূর্ণরূপে সম্ভব না হইলেও ইহাই রাষ্ট্রের আদর্শ হওয়া উচিত। মানুষের কোন আদর্শই সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায় না, তবুও আদর্শ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাতে যতটা লাভ হয়, ততটাই মঙ্গল।

অ্যারিস্টটলের মত

অ্যারিস্টটলের মতে সমাজে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে, তাহাতেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ। ইহাকেই তিনি Distributive Justice বা বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা বলিয়াছেন। (১) ধনী-দরিদ্র, উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সকলকেই আত্মবিকাশের সুবিধা দিতে হইবে। (২) রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকে তাহাদের যথাযোগ্য কর্মে নিয়োজিত না করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র চেষ্টা করিবে, যাহাতে প্রত্যেকের উপযুক্ত ক্ষেত্র বাছিয়া লইবার পথ উন্মুক্ত হয়। (৩) শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের ব্যক্তিত্বের ও শক্তির বিকাশসাধন করিতে হইবে, ভদ্রতা ও শিষ্টতা শিক্ষা দিতে হইবে। (৪) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সংগীত-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে যাহার যে-বিষয়ে মানসিক প্রবণতা আছে, সে সেই-বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে। (৫) যাহাদের আর্থিক অবস্থা অনুকূল নহে, তাহারাও যাহাতে সমান সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথায় প্রকৃতিদত্ত গুণাবলী কুঁড়িতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। ইহা সমস্ত সমাজের পক্ষেই বিরাট ক্ষতি। (৬) সমাজের এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকেই আপন প্রকৃতিদত্ত গুণাবলীর বিকাশসাধন করিতে পারে এবং সেই শিক্ষার দ্বারা

অর্থোপার্জনও করিতে পারে। (৭) বাসস্থানের ও জলসরবরাহের সুব্যবস্থা, আলো, বাতাস, লাইব্রেরি, শিল্প, ভ্রমণ ও অন্যান্য নানা প্রকারের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া সকলেরই শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধান করিতে হইবে।

এই সকল নিয়ম পালন করিতে পারিলেই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বলা যায়।

সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা (Corrective Justice) : বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা অবলম্বন করা সমাজে সম্ভব হইলে যাহাতে এই-সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নষ্ট না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নানাপ্রকারে এই-সকল ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আকস্মিক দুর্ঘটনা, জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদির ফলেও চোর, ডাকাত, খুনী, মিথ্যাবাদী ইত্যাদির দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা, সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ইত্যাদি নষ্ট হইতে পারে।

ইহার উদ্দেশ্য সুযোগ-সুবিধাকে রক্ষা করা

এই-সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য অ্যারিস্টটল সংশোধনমূলক ন্যায়পরতার কথা বলিয়াছেন। (১) সমাজের শৃঙ্খলা যাহারা ভঙ্গ করে, তাহাদের শাস্তি দিয়া, শিক্ষা দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। অনেক সময় ইহাদের দ্বারা যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণ করা সম্ভব হয় না। কেহ যদি কাহারও প্রাণসংহার করে, তবে তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়া এই ক্ষতি পূরণ করা যায় না, প্রতিশোধ নেওয়া যায় মাত্র। সুতরাং এইরকম ঘটনা যাহাতে সমাজে সংঘটিত হইতে না পারে, তাহার জন্য কঠোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (২) রাষ্ট্রের উচিত পুলিশবাহিনীর দ্বারা সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা; দোষীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা, বিশেষ প্রকারের আইন জারি করিয়া মদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদির বিক্রয় সীমাবদ্ধ করা এবং নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। (৩) আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে মানুষের জীবনে যে-ক্ষতি হয়, তাহা পূরণের জন্য বাধ্যতামূলক জীবনবীমার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অ্যারিস্টটলের মত

এইরূপ নানাপ্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যতটা সম্ভব ক্ষতি-সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।

উপসংহার : প্রকৃতপক্ষে বণ্টনমূলক ন্যায়পরতার উদ্দেশ্য—সমাজে

সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং এই-সকল সুবিধা যাহাতে সকলে ভোগ করিতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা। আর সংশোধনমূলক ন্যায়পরতার উদ্দেশ্য—সমাজে যে-সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা।

ন্যায়পরতার অপর একটি উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যাহাতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। এইজন্য সমাজের সকল ব্যক্তির কার্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার কার্যের মূল্য-নিরূপণ এবং সেই অনুসারে তাহার বেতন ও পদমর্যাদা নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমের নিজস্ব মূল্য আছে। শ্রমজীবীদের কার্যকে অবহেলা করিলে চলিবে না। তাহাদের কার্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অন্যান্য কার্য অপেক্ষা অধিক ছাড়া কম নয়। তাহাদের প্রতি যাহাতে কোন অন্যায় না করা হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার। সুতরাং সমাজে সকল দিকে যাহাতে ন্যায়পরতা বজায় রাখা হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সামাজিক আদর্শ লাভ করিতে হইলে যাহার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন, তাহা হইল **প্রেম** (Love)।

(৫) **প্রেম** (Love): প্রেম মানুষের মনের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি। প্রেমের দ্বারা মানুষের মনকে যতটা জয় করা সম্ভব হয়, ততটা আর কোন উপায়ে হওয়া সম্ভব নয়। প্রেমের সূত্রপাত হয় পরিবারের মধ্য হইতে, প্রেমের দ্বারাই পরিবারের ঐক্য স্থাপিত হয়। এই প্রেমের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হইবে, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। এইজন্য দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি প্রেমের ভাবের দ্বারা সমাজে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমাজও ব্যক্তিকে ভালবাসিবে, ব্যক্তির প্রতি তাহার অকুণ্ঠ সহানুভূতি থাকিবে, ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে, তাহা হইলেই আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

প্রেম ও সামাজিক ঐক্য

যূথ বা দলগত মনোভাব (Herd Sentiment)

১। **সমাজজীবনে যূথ** (The Herd in Social Life) **:** Herd is a "large company of people— a multitude."

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, একাকী থাকিতে পারে না। সঙ্গপ্রিয়তা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তি মানুষকে অপরের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য করে এবং ইহারই প্রভাবে মানুষ নানাপ্রকারে সঙ্ঘ, দল বা গোষ্ঠী গঠন করিয়া থাকে। যূথও একপ্রকারের সামাজিক দল বা গোষ্ঠী। জীবনধারণের একটা উপায় হিসাবে যখন কতকগুলি লোক একত্র হয়, তখন তাহাকে যূথ বলা হয়।

যূথ বা দল

যূথ মনোভাব হইল একপ্রকারের অনুকরণশীল সংযোগ (imitative cohesion)। যূথের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা আপন দলের সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মতবাদ বিনা যুক্তিতে অন্ধবিশ্বাসে মানিয়া লয়। কেবলমাত্র আপন দলের মতবাদ বলিয়াই তাহারা সেই মতবাদকে সমর্থন করে। দল যাহা সমর্থন করে না, তাহা দলের অন্তর্ভুক্ত কেহই সমর্থন করে না। এইখানে তাহারা কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারে না, অন্ধবিশ্বাসে দলকে অনুসরণ করে। পশুদের মধ্যেও এই সঙ্গপ্রিয় প্রবৃত্তিই (gregarious instinct) যূথ-মনোভাবের সৃষ্টি করে।

যূথ ও ব্যক্তি

মানব-সমাজে এই প্রবৃত্তির ফলে দলের সকলের মধ্যে একাত্মতা-বোধ জাগ্রত হয় এবং যূথের মাধ্যমে এই দলগত অনুভূতি প্রকাশ পায়। যূথ-মনোভাব দলের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করে। রাজনীতিতে এই মনোভাবের প্রভাবে লোক, যে-দলের সম্ভাবনা বেশী, সেই দলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং যে-দলের জয়ের সম্ভাবনা কম, সেই দল পরিত্যাগ করে। যাহারা দলের আদর্শের বিরোধিতা করে, তাহারা দল হইতে বিতাড়িত হয়। এইজন্য স্বাধীনচেতা, খুব বুদ্ধিমান ও আবেগপূর্ণ ব্যক্তিরা দলে স্থান পায় না। কারণ, তাহারা দলের আদর্শকে অন্ধভাবে মানিয়া লইতে চাহে না।

যূথ-মনোভাবের প্রভাব

যূথ সাধারণতঃ অস্থায়ী হইলেও আধুনিক সমাজে স্থায়ী যূথ দেখিতে

পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের একত্র বসবাসকে যূথ-জীবন বলা যায়। জীবনধারণের একটা উপায় হিসাবে এবং দলগত মনোবৃত্তির ফলেই বিভিন্ন দেশ হইতে আগত এই-সকল উদ্বাস্তু একত্র বসবাস করে। এতদ্ব্যতীত রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় দল, খেলার দল ইত্যাদিও যূথের অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক সমাজে যূথ

২। **যূথ-মনোভাব ও স্বার্থ** (**Herd Sentiment and Interest**)**ঃ** যূথ-মনোভাবের সহিত মানুষের বিভিন্ন স্বার্থ জড়িত থাকে। মানুষের স্বার্থ দুই প্রকারের হইতে পারে, একটি নিজস্ব স্বার্থ ও অপরটি সামাজিক স্বার্থ। এই উভয় প্রকারের স্বার্থই মানুষের যূথ-মনোভাবের ভিত্তি।

অনেক সময় দেখা যায়, ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে যূথের সহিত সংযুক্ত হয়। যেমন, বিপদ-আপদ হইতে আত্মরক্ষার্থ, অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি-লাভার্থ, অথবা সমাজে খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা-অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির মধ্যে যূথ-মনোভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও যূথ-মনোভব

আবার গভীর সাম্প্রদায়িক বা দলগত অনুভূতির দ্বারাও যূথ-মনোভাব জাগ্রত হয়। এই-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ অপেক্ষা সাধারণ স্বার্থলাভই ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। আপন দলের সম্মানার্থ বা কল্যাণার্থ ব্যক্তি আপন পৃথক স্বার্থের কথা ভুলিয়া যায় ও দলের সহিত একাত্মতা অনুভব করে। এই মনোভাবের মাধ্যমে মানুষের দলগত প্রবৃত্তি (gregarious instinct) প্রকাশিত হয়। দলের স্বার্থ বা সাধারণ স্বার্থই এই সময় ব্যক্তির নিকটে প্রাধান্যলাভ করে। ব্যক্তি আপন স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও সাধারণ স্বার্থ-লাভের জন্য সচেষ্ট হয়।

সাধারণ স্বার্থ ও যূথ-মনোভাব

৩। **জনতা** (**Crowd**)**ঃ** যূথ ব্যতীতও সমাজে আরও বিভিন্ন প্রকারের জনসমষ্টি বা দল বর্তমান, যেমন—জনতা।

কোন ঘটনা উপলক্ষে স্বল্পকালের জন্য সম্মিলিত জনসমাবেশকে জনতা বলা হয়। ম্যাকাইভার জনতা সম্পর্কে বলিয়াছেন, সুসংবদ্ধ সমাজের অসংবদ্ধ দলকে জনতা বলা যায় ("It is an unorganised grouping occuring within a system of

জনতার সংজ্ঞা

social organisation")। যেমন,—রাস্তার জনতা, কোন সভায় সম্মিলিত শ্রোতৃবৃন্দ বা দর্শকবৃন্দ।

জনতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a crowd):

(১) জনতার হঠাৎ সমাবেশ হয়, আবার শীঘ্রই ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

(২) সংখ্যাধিক্যই জনতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কয়েকজন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির হঠাৎ সমাবেশকে জনতা বলা যায় না। অনেক ব্যক্তির আকস্মিক সমাবেশের দ্বারা জনতার সৃষ্টি হয়।

(৩) মানুষের সঙ্গপ্রিয় প্রবৃত্তি হইতে জনতার আবির্ভাব হয়। এইজন্য এই প্রবৃত্তিকেও জনতার বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

(৪) জনতা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। এইরূপ জনতার নিকট যুক্তি অর্থহীন হইয়া পড়ে। আবেগের বশে জনতা বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলে।

(৫) অতিরিক্ত আবেগের বশে পরিচালিত হয় বলিয়া জনতার দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সংকীর্ণ আকার ধারণ করে। গভীরভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়, ইহার ফলে জনতার আচরণ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

(৬) জনতার দায়িত্বজ্ঞান অত্যন্ত ক্ষীণ। কারণ, যেখানে সমষ্টিগত দায়িত্ব বর্তমান, সেখানে কাহারও ব্যক্তিগত কোন দায়িত্ব থাকে না। এইজন্য জনতার আচরণ অনেক সময় দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে।

(৭) জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা আবার ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া সাধারণ স্বার্থলাভে সচেষ্ট হয়। এইজন্য অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে জনতা প্রচণ্ড শক্তিতে লড়াই করে।

(৮) অনেক সময় জনকল্যাণমূলক কার্যেও জনতাকে অত্যন্ত অগ্রণী হইতে দেখা যায়। অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া জনতা অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য ও লোকের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

এই-সকল বিভিন্ন কারণে সমাজজীবনের উপরে জনতার যে-উল্লেখযোগ্য প্রভাব বর্তমান, তাহা অনস্বীকার্য।

৪। যূথ ও জনতা (Herd and Crowd)—যূথ ও জনতার মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য বর্তমান: (১) যূথ ও জনতা উভয়েই অস্থায়ী সামাজিক দল। উভয়েরই সমাজের উপর প্রভাব অসীম।

(২) উভয়েই সঙ্গপ্রিয় প্রকৃতির মাধ্যমে গড়িয়া উঠে।

(৩) যূথ ও জনতা উভয়েই আবেগপ্রবণ, আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়।

(৪) সাধারণ স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যেই যূথ ও জনতা সংগঠিত হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ তাহাদের কাছে গৌণ হইয়া পড়ে।

যূথ ও জনতার মধ্যে এই-সকল **সাদৃশ্য** বর্তমান থাকায় অনেকে মনে করেন, উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট **বৈসাদৃশ্য** বর্তমান।

(১) যূথ ও জনতা উভয়ে অস্থায়ী হইলেও যূথ জনতা অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী। জনতা অতি স্বল্পকাল স্থায়ী, অল্পক্ষণের জন্য কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত জনতার সমাবেশ হয়।

(২) জীবনধারণের একটা উপায় হিসাবে মানুষ যূথের অন্তর্ভুক্ত হয়। জনতা কিন্তু জীবনধারণের একটা উপায় নহে—একটি ঘটনা, একটা আকস্মিক উদ্গিরণ। রাস্তায় কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য হঠাৎ জনতার আবির্ভাব হয়, আবার হঠাৎ তাহারা অন্তর্হিত হয়।

৫। যূথ-মনোভাবের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ (Manifestation of Herd Sentiment) : যূথ মনোভাবের প্রকাশ নানাভাবে ঘটিতে পারে :

(১) সময় সময় উহা অন্ধ আবেগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অনেক সময় আবেগময় অনুভূতি এমনভাবে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে যে, যূথ-মনোভাবের প্রকাশ তখনই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। ধর্মভাবের মধ্যে বিশেষতঃ এই ধরণের আবেগ পরিলক্ষিত হয়। আবেগের বশবর্তী হইয়া দলে দলে লোক সেই যূথের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজনৈতিক দলগুলিও এইভাবে গঠিত হয়।

(২) সমাজ যখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, মানবজীবনে যখন হতাশার ভাব আসিয়া পড়ে, তখনই এই প্রকারের যূথ-মনোভাব প্রকাশিত হয়। মানুষ তখন আপন স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া দলের সহিত নিজেকে এক ও অভিন্ন মনে করে।

(৩) অজানা ভয়, মুক্তির আশা অথবা লাভের আশা ইত্যাদির দ্বারাও যূথ-মনোভাব জাগ্রত হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ দলগত মনোভাবের প্রধান প্রেরণা দেয়। স্বার্থভাব উদ্দীপিত হয় অনুকরণের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, সামাজিক অবস্থার দ্বারা। মানুষ নিরাপত্তার জন্য এবং ব্যক্তিগত উন্নতিলাভের জন্য দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়।

(৪) সমাজে যখন কোন নূতন ভাবধারা, নূতন চিন্তা, এমন কি, নূতন

কোন ফ্যাশান প্রচলিত হয়, তখন তাহা অনুসরণ করিবার জন্যও এইরূপ যূথ-মনোভাব প্রকাশিত হয়।

(৫) যূথ-মনোভাবের দ্বারা জনস্বার্থ বা সাধারণ স্বার্থও প্রকাশিত হয়। কোন কোন ঘটনা হঠাৎ জাতীয় চেতনাকে উদ্দীপিত করে এবং সকলের মধ্যে একটা ভাবাবেগ সংক্রামক রোগের মত ছড়াইয়া পড়ে। ইহার ক্ষুদ্রতর রূপ দেখা যায় স্কুলের, কলেজের অথবা দেশের ফুটবল বা ক্রিকেট দলের সমর্থকগণের মধ্যে। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে পারিলে আনন্দের একটা হিল্লোল বহিয়া যায় স্বপক্ষীয় সমর্থকদিগের মধ্যে। এই আবেগের মধ্যে স্বার্থভাব অন্তর্হিত হইয়া দলের সহিত একাত্মতা-বোধ জাগ্রত হয়। ইহারই বৃহত্তর রূপ দেখা যায় যখন সমগ্র জাতির কোথাও জয় বা পরাজয় হয়, অথবা জাতি কোথাও সম্মানিত বা অপমানিত হয়। যুদ্ধকালীন বিপদের সময় অথবা আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কার সময় সমগ্র দেশে এমন একটা ভাবাবেগের ছড়াছড়ি পড়িয়া যায় যে, ইহা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র 'আমি'-কে অন্তর্হিত করিয়া একটি বৃহত্তর 'আমি'-কে জাগ্রত করে। 'আমরা' জয়লাভ করিয়াছি, 'আমরা' অপমানিত হইয়াছি, এই বাক্যগুলির মধ্যে যে-'আমরা'-ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র 'আমি'-ভাব লুপ্ত হইয়া যায়। ব্যক্তি ও যূথের মধ্যে সম্পর্ক হঠাৎ যেন খুব নিবিড় হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হঠাৎ সংকীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্য হইতে মুক্ত হইয়া সকলের সঙ্গে এক হইয়া যায়।

(৬) আবার, এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা বা বিচারক্ষমতাও আবেগের বশে লুপ্ত হয়। এই সময়ে ব্যক্তি তাহার সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইয়া এমন আবেগ প্রকাশ করিতে থাকে, যাহা স্বাভাবিক নহে, এবং সমাজও স্বাভাবিক অবস্থায় এইরূপ আবেগের প্রকাশ অনুমোদন করে না।

যূথ-মনোভাবের বিভিন্ন প্রকাশ মানুষের সঙ্গপ্রিয়তা-প্রবৃত্তি হইতে আসে। আদিমযুগে নিরাপদে অবস্থান করিবার জন্য মানুষের মধ্যে যূথ-মনোভাবের উদ্ভব হয়। মানবজীবনের সর্বস্তরে যূথ-মনোভাবের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। আধুনিক সমাজেও ইহার পরিবর্তিত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যূথ-মনোভাবের সহজ ও সংযত প্রকাশ জাতির স্বার্থের পক্ষে মঙ্গলজনক।

সাধারণ স্বার্থ (Common Interest)

১। **স্বার্থ কাহাকে বলে (What is Interest):** "An interest may be defined as any aim or object which stimulates activity towards attainment, and it is an object of the will."—Maciver, স্বার্থ হইল এমন একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, যাহা লাভ করিবার জন্য কর্মে উদ্দীপনা জাগ্রত হয় এবং ইহা ইচ্ছার বস্তুগত দিক।

সমাজ স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি স্বার্থ স্বভাবতই সকলের মধ্যে বর্তমান থাকে, অপর কতকগুলি স্বার্থ সকলে কামনা করে বলিয়া জাগ্রত হয়। প্রত্যেক সঙ্ঘের এইরূপ কতকগুলি স্বার্থ থাকে।

সামাজিক সম্পর্কের সংজ্ঞার মধ্যে একটা বস্তুগত দিক (Objective) আছে, আর একটা মনোবৃত্তি বা ব্যক্তিগত (Subjective) দিক আছে। যখন বলা হয়, 'রামকে আমি ভালবাসি,' তখন 'ভালবাসা' হইল ব্যক্তিগত দিক বা মনোবৃত্তি, আর রাম হইল বস্তুগত দিক বা স্বার্থ। এইরূপ প্রত্যেক মনোবৃত্তির একটা বস্তুগত দিক আছে, যাহাকে স্বার্থ বলা হয়। ভয়, ভালবাসা, বিস্ময়, গর্ব, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদিকে মনোবৃত্তি (attitude) বলা হয়; আর বন্ধু, শত্রু, পরিবার, ঈশ্বর প্রভৃতিকে বস্তু বা স্বার্থ বলা হয়। কারণ, বন্ধু, শত্রু, পরিবার, ঈশ্বর প্রভৃতির বিষয়ে আমি কৌতূহলী, তাহাদের সহিত আমার স্বার্থ জড়িত আছে। আবার যদি কেহ ধর্ম বিষয়ে কৌতূহলী হয়, অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে যদি তাহার স্বার্থ থাকে, তবে সেইখানে তাহার মনোবৃত্তি তাহাকে সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য করে। সুতরাং স্বার্থ বস্তুগত, ইহা ব্যক্তি-মনের উপর নির্ভরশীল নহে।

মনোবৃত্তি ও স্বার্থ

তবে স্বার্থ ও মনোবৃত্তি পরস্পর-সাপেক্ষ। যেখানে স্বার্থ আছে, সেইখানে আমরা মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হই। কিন্তু একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ থাকিলে তাহাদের মনোভাব একরূপ হয় না। যেমন,—আইন সম্পর্কে চোর, ডাকাত, ব্যবসায়ী, নাগরিক, পুলিশ, বিচারক ইত্যাদি সকলেরই স্বার্থ আছে, কিন্তু তাহাদের মনোভাব বিভিন্ন। ধর্মবিষয়ে আস্তিক ও নাস্তিক—উভয়েই স্বার্থপ্রণোদিত বা কৌতূহলী হইয়া আলোচনা করে, কিন্তু মনোভাব তাহাদের

বিভিন্ন মনোভাব ও স্বার্থ

বিভিন্ন। এই জন্যই সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে আমরা বস্তুগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত মনোভাব দুইটিই দেখিতে পাই।

২। সমাজ-জীবনে স্বার্থের প্রকার-ভেদ *(Types of Interest in Social Life) : প্রত্যেক সামাজিক সম্পর্কের দুইটি দিক আছে : একটি ব্যক্তিগত (Subjective) ও অপরটি বস্তুগত (Objective)। ব্যক্তিগত দিকটিকে ব্যক্তিগত মনোভাব বা মনোবৃত্তি বলা হইয়াছে, আর বস্তুগত দিকটিকে স্বার্থ বলা হইয়াছে।

ম্যাকাইভার দুই প্রকারের স্বার্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন : **পৃথক স্বার্থ** (Like Interest) ও **সাধারণ স্বার্থ** (Common Interest)।

পৃথক স্বার্থ বলিতে ব্যক্তির যাহা নিজস্ব স্বার্থ, তাহাকেই তিনি বুঝাইয়াছেন। আর, সাধারণ স্বার্থ বলিতে যাহা সকলের স্বার্থ, তাহাকেই বুঝাইয়াছেন। যথা—কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই নিজের পরীক্ষার ফল ভাল করিতে চায়। কারণ, তাহাদের প্রত্যেকের স্বার্থ পৃথক। এইরূপ স্বার্থকে পৃথক স্বার্থ (Like Interest) বলা হয়। কিন্তু যখন তাহারা কলেজের উন্নতির জন্য চ্যারিটি শো করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে চায়, তখন তাহাদের কোন পৃথক স্বার্থবোধ থাকে না। সকলের স্বার্থ এখানে এক হইয়া যায়। এইরূপ স্বার্থকে সাধারণ স্বার্থ (Common Interest) বলা হয়।

পৃথক স্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থ

পৃথক স্বার্থবোধ হইতে আবার সাধারণ স্বার্থের উদ্ভব হইতে পারে। যথা—আপন আপন লাভের উদ্দেশ্যে দুই ব্যবসায়ীর পৃথক স্বার্থবোধ যখন তাহাদের একত্রে ব্যবসা করিতে উদ্বুদ্ধ করে, তখন ব্যবসার উন্নতির জন্য তাহাদের স্বার্থ এক হইয়া যায়। এইভাবে সমাজে ব্যক্তির পৃথক পৃথক স্বার্থবোধ হইতে সাধারণ স্বার্থের উদ্ভব হইয়াছে। ম্যাকাইভার বলেন, আধুনিক কালে সকল দেশই নিজের দেশকে রক্ষা করিবার জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। আশা করা যায় যে, ইহাদের এই পৃথক স্বার্থবোধ হইতে প্রকৃত আন্তর্জাতিক সাধারণ স্বার্থবোধ জাগ্রত হইবে। (**"To-day many of us hope that the like interests of the great nations in maintaining peace may be a source for the development of true common international interests."**)

সাধারণ স্বার্থ

*স্বার্থের শ্রেণীবিভাগ—৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

সাধারণ স্বার্থের ধারণা হইতেই স্বার্থ ও মনোবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। মনোবৃত্তি কখনও সাধারণ হইতে পারে না। কারণ, সকলেরই মনোবৃত্তি পৃথক। কিন্তু স্বার্থ পৃথক ও সাধারণ দুই প্রকারেরই হইতে পারে।

সাধারণ স্বার্থের প্রকার-ভেদ (Types of common interest) :

সাধারণ স্বার্থ আবার দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা—(ক) **সামাজিক দলের প্রতি আকর্ষণ** ও (খ) **নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ।**

(ক) সামাজিক দলের প্রতি আকর্ষণ (Attachment to a social group) : আপন দলের প্রতি ও দলের স্বার্থের প্রতি আকর্ষণ এক প্রকারের সাধারণ স্বার্থ। যখন ব্যক্তি নিজেকে পরিবারের একজন, দেশের একজন বলিয়া মনে করে, তখন তাহার নিকট নিজের ও দেশবাসীর স্বার্থ এক হইয়া যায়। এইভাবে ব্যক্তি নিজেকে দলের সহিত এক ও অভিন্ন মনে করে।

দলের প্রতি আকর্ষণ

প্রথমে পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া মানুষ সামাজিক হইতে শিক্ষা করে, পরে বৃহত্তর দলের সহিত তাহার একাত্মতাবোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু এইভাবে নিজেকে একটি দলের সহিত অভিন্ন মনে করার সঙ্গে সঙ্গে অপর দলের প্রতি বিরোধী মনোভাবের উদয় হয়। আপন দলের প্রতি মমত্ববোধ হইতে অপর দলের প্রতি বিরোধ জন্মে। মানুষ তখন 'আমরা' ও 'তাহারা'-র মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করে। আধুনিক সভ্যতার ইহা একটি মস্ত বড় সমস্যা। জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন দল, পৃথিবীর অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি আধুনিক যুগে পরস্পর-নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এই-সকল বিভিন্ন দল মানব-সমাজে নানাপ্রকার বিরোধের সৃষ্টি করিতেছে। ইহার ফলে সমগ্র জাতির ঐক্য ও স্বার্থ ব্যাহত হইতেছে। পৃথক স্বার্থের উর্ধ্বে সাধারণ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিবার অক্ষমতার ফলে সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে এমন এক ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে দলের পৃথক স্বার্থ জাতির সাধারণ স্বার্থের বিরোধী না হয়।

স্বার্থবিরোধের ফল

(খ) নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ (Attachment to an impersonal goal or endeavour) : বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন ও খেলাধুলা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ দ্বিতীয় প্রকারের সাধারণ স্বার্থ।

কৌতূহল, আগ্রহ ইত্যাদির মধ্যে এই প্রকারের স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক যখন কোন উচ্চস্তরের গবেষণা-কার্যে নিমগ্ন থাকেন, তখন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার নিজের জীবিকা-অর্জনের জন্য বা সম্মানলাভের জন্য গবেষণা করেন না। নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ বা সাধারণ স্বার্থ বা এই বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ বা কৌতূহলই তাঁহাকে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী করে। গ্যালিলিও, কুরী, বেকন প্রভৃতির জীবন এইরূপ আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবশ্য বৈজ্ঞানিক-রাও জীবিকা-অর্জনের জন্য কিংবা সম্মান ও যশোলাভের জন্য গবেষণা করেন, কিন্তু যদি তাঁহার স্বার্থ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হয়, তবে তাঁহাকে আদর্শ বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। কারণ, তিনি প্রকৃত আদর্শবাদী নহেন।

আদর্শের প্রতি আকর্ষণ

উপসংহার ঃ মানুষের প্রায় প্রত্যেক কাজের মধ্যে সাধারণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ যুক্তভাবে অবস্থান করে। মানুষ তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ কামনা করিবেই। আবার যে-দলকে সে সমর্থন করে, সেই দলের জয়ও সে কামনা করে। সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে এই উভয় প্রকারের স্বার্থই বর্তমান।

ব্যক্তিগত স্বার্থই যদি মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে ব্যবহার করিলে, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। ভালবাসা, বন্ধুত্ব, পারিবারিক মায়ামমতা, দলের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি থাকিত না। আপন স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত মানুষ অপরের সহিত আর কোন সম্পর্কই রাখিত না। পরিবার, দল, সমাজ ইত্যাদি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমাজ

মানুষের প্রথম মনোবৃত্তি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কেহ কেহ বলেন, মানুষের আদিম প্রবৃত্তি হইতেছে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রকাশ। কিন্তু সামাজিক মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিকও বটে, আবার সমাজকেন্দ্রিকও বটে। উভয় উপাদানই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান। আদিম মানুষের মধ্যেও এই উভয় প্রকারের উপাদানই বর্তমান ছিল। পৃথক ও সাধারণ এই উভয় স্বার্থ ছিল বলিয়াই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারিয়াছে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক উপাদান

৩। **স্বার্থ ও সঙ্ঘ (Associations * and Interests) ঃ** স্বার্থই

---

* ১১১ পৃষ্ঠা দেখ।

সঙ্ঘের ভিত্তি। কারণ, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত কতকগুলি ব্যক্তি যখন একত্র হয়, তখন তাহাকে সঙ্ঘ বলে।

সঙ্ঘের সভ্যদের স্বার্থই তাহাদিগকে সঙ্ঘ গঠন করিতে বাধ্য করে। সঙ্ঘের গঠনের ও পরিচালনার মধ্যে মনোবৃত্তি অপেক্ষা স্বার্থের প্রভাব বেশী। মনোবৃত্তি সঙ্ঘ গঠনের পদ্ধতিকে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু সঙ্ঘ গঠন করিতে পারে না। স্বার্থলাভের উপায় হিসাবেই সঙ্ঘের উদ্ভব হয়। সভ্যদিগের পৃথক স্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থ—উভয়ই বর্তমান থাকিলে সঙ্ঘ সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। পরিবার, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, গীর্জা, ক্লাব, স্কুল, কলেজ, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি এইরূপে স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে।

স্বার্থই সঙ্ঘের ভিত্তি

স্বার্থ সঙ্ঘের ভিত্তি হইলেও কেবল স্বার্থ দ্বারা সঙ্ঘ সুগঠিত হইতে পারে না। সঙ্ঘের বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য, উন্নতির জন্য একজন নায়কের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ব্যক্তিত্ব সঙ্ঘ গঠনের ও উন্নতিসাধনের বিশেষ সহায়ক। কিন্তু সঙ্ঘের নায়ক যদি তাঁহার পৃথক স্বার্থটাই বড় করিয়া দেখেন, তাহা হইলে সকলের সাধারণ স্বার্থের ক্ষতি হইতে পারে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ অনেক সময় ক্ষমতাগর্বে সাধারণ স্বার্থকে অবহেলা করিয়া নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন।

নায়ক ও সঙ্ঘ

সঙ্ঘের মধ্যে আবার পৃথক ও সাধারণ স্বার্থের সংযোগ সাধিত হয়। স্বার্থের বিভিন্নতা অনুসারে সঙ্ঘকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ ও পৃথক উভয় প্রকারের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। অর্থনৈতিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য পৃথক স্বার্থ-সাধন। ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা বেতন, লভ্যাংশ ইত্যাদি লাভের জন্য এই-সকল সঙ্ঘের সহিত যুক্ত হয়। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলির উদ্দেশ্য সাধারণ স্বার্থসাধন, যথা—শান্তিসঙ্ঘ। এইরূপ সঙ্ঘের আদর্শ দেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। ইহাতে সকলেরই সমান স্বার্থ, কারণ শান্তি বজায় থাকিলে সকলেরই স্বার্থ রক্ষিত হয়। সুতরাং সাধারণ স্বার্থলাভ ভিন্ন সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলি গড়িয়াই উঠিত না। কিন্তু একবার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে তখন সভ্যদের পৃথক স্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থ—উভয়প্রকার স্বার্থলাভই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়।

পৃথক ও সাধারণ স্বার্থের সংযোগ

যে-কোন দল বা সঙ্ঘের মধ্যে এই উভয় প্রকারের স্বার্থকেই দেখিতে

পাওয়া যায়। কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের সভ্যরা প্রত্যেকেই ইহার সহিত যুক্ত থাকিয়া ব্যক্তিগত আনন্দ লাভ করে। কিন্তু ইহা ব্যতীত তাহাদের অপর এক প্রকারের স্বার্থ থাকে, যাহা ব্যক্তিগত বা পৃথক স্বার্থ নহে, সাধারণ স্বার্থ। যেমন, কলেজ-দলের খেলায় জয় তাহারা কামনা করে তাহাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নহে, কলেজের সুনাম-অর্জনের জন্য। তাহাদের পৃথক স্বার্থ তখন সাধারণ স্বার্থের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। কোন খেলোয়াড় খেলায় খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াও আনন্দ পায় না, যদি তাহার দল পরাজিত হয়। আবার খুব নিকৃষ্ট খেলোয়াড়ও তাহার খেলার জন্য লজ্জাবোধ করে না, যদি তাহার দল খেলায় জয় লাভ করে। প্রত্যেকেই এই ক্ষেত্রে একই স্বার্থের অংশীদার।

পৃথক ও সাধারণ স্বার্থ ও সঙ্ঘ

পরিবারের মধ্যেও এই উভয় প্রকারের স্বার্থের যুক্ত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের পৃথক স্বার্থ কামনা করে। কিন্তু একজন যদি খুব খ্যাতি লাভ করে বা কোন বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে, তাহা হইলে পরিবারের সকলেই গৌরব অনুভব করে। এই গৌরববোধ করিবার কারণ কোন ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ হইবে বলিয়া নয়। ব্যক্তিগত কোন স্বার্থলাভ সেই ব্যক্তির দ্বারা না হইলেও সকলেই এই কৃতিত্বে গৌরববোধ করে। আবার, পরিবারের কুলাঙ্গার কোন সন্তানের জন্য সকলেই লজ্জাবোধ করে। তাহা হইতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকিলেও সকলেই তাহার কার্যের জন্য লজ্জিত হয়। সুতরাং পরিবারের মধ্যে সকলেই পৃথক স্বার্থ-কামনা করিলেও সাধারণ স্বার্থও কামনা করে। এইভাবে পৃথক ও সাধারণ স্বার্থের সংযোগ সাধিত হয়।

পৃথক ও সাধারণ স্বার্থ ও পরিবার

উপসংহারঃ কেহ কেহ সঙ্ঘের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহারা মনে করে, মানুষ চায় আপন সুখ, নিজের পৃথক স্বার্থের জন্য সে সাধারণ দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থাৎ তাহার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। কিন্তু এই মনস্তত্ত্বমূলক সুখবাদকে সমর্থন করা যায় না। কারণ, পৃথক স্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থকে 'স্বার্থপরতা' ও 'নিঃস্বার্থপরতা' মনে করিলে চলিবে না। মানুষের ব্যক্তিগত সুখকামনার মধ্যে সমষ্টিগত সুখকামনাও বর্তমান থাকে। কারণ, সমষ্টিগত সুখ ব্যতীত ব্যক্তিগত সুখ লাভ করা সম্ভব হয় না। সঙ্ঘের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্বার্থ একীভূত হইয়া সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। সমষ্টিগত কল্যাণবোধের দ্বারাই সঙ্ঘ বাঁচিয়া থাকে।

ধর্ম (Religion)

১। **ধর্মের সংজ্ঞা** (Definition of Religion): ধর্মের একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নহে। ধর্ম সম্পর্কে অনেক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, কিন্তু কোনটিকেই ঠিক সম্পূর্ণ সংজ্ঞা বলা যায় না। ধর্ম যাঁহার নিকট যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি সেইরূপভাবে ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই-সকল সংজ্ঞা অনেকটা অন্ধ ব্যক্তিদের হস্তী-পরিদর্শনের ন্যায় আংশিক সত্যকে প্রকাশ করে, সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ইহাদের বলা যায় না। এইজন্য ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন।

টাইলর (Tylor) বলিয়াছেন, ধর্ম হইল আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতি বিশ্বাস ("The belief in spiritual beings.")। ম্যারেটের (Marret) মতে অতিপ্রাকৃতের প্রতি শ্রদ্ধা, ভীতি বা কৌতুহলের অনুভূতিকে ধর্ম বলা হয়। কিন্তু এই-সকল সংজ্ঞায় ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বা অনুভূতির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ধর্মের ক্রিয়াকলাপ বা অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ নাই। জেম্‌স্‌ই (James) প্রথম এই ত্রুটি দূর করিবার চেষ্টা করেন। জেম্‌স্‌ বলেন, ধার্মিক জীবন বলিতে অদৃশ্য নিয়মাবলীর প্রতি বিশ্বাস বুঝায় এবং এই নিয়মাবলীর সহিত সতত সামঞ্জস্য-বিধানের দ্বারা আমাদের পরম কল্যাণ হয় ("Religious life consists of the belief that there is an unseen order and that our supreme good lies in harmoniously adjusting ourselves thereto.")। ফ্রেজার (Frazer) কেবল বিশ্বাস ও কর্মের প্রয়োজনীয়তার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, ধর্মীয় অনুভূতি ও নম্রতার প্রয়োজনীয়তাকেও গুরুত্ব দিয়াছেন।

বিভিন্ন সংজ্ঞা ও মতবাদ

এই-সকল সংজ্ঞা ধর্মের সামাজিক প্রকৃতির কোন উল্লেখ করে নাই। ডুরখাইম্‌ (Durkheim) এইজন্য বলিয়াছেন, কোন পূত সত্তার অনুভূতি হইতে তাহার প্রতি বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে এবং এই-সকল আচার-অনুষ্ঠান ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করিয়াছে।

কাণ্ট (Kant) কর্তব্যকে স্বর্গীয় আদেশ বলিয়া গ্রহণ করাকে ধর্ম-আখ্যা দিযাছেন। হাউয়েলস (Howells) বলিয়াছেন, ধর্ম হইল মানবগোষ্ঠীর কতকগুলি অকপট বাধ্যতামূলক নীতি, যাহা বিজ্ঞানের ভিত্তি ব্যতীত তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও জগতের সহিত তাহাদের সম্পর্কদৃঢ় করে। ধর্ম হইল অদৃশ্য সত্তার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র। মানুষের অজ্ঞাত ভয়কে দূর করিবার জন্য উদ্ভট কল্পনার প্রাচীর তুলিয়া জগতের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইবার মনস্তাত্ত্বিক চেষ্টা হইল ধর্ম।

আমাদের দেশে ধর্ম বলিতে কেবল অলৌকিক সত্তার প্রতি বিশ্বাস বা আচার অনুষ্ঠানকে বুঝায় না। জীবনের আচরণের সমষ্টি হইল ধর্ম (totality of behaviour)। মানুষের সকল সামাজিক কর্মই ধর্মের অঙ্গীভূত। যাহার যাহা নির্দিষ্ট কর্ম, তাহা সম্পাদন করাই ধর্ম, তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়াই অধর্ম।

যাহা হোউক, ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক আলোচনা করা সমাজদর্শনের উদ্দেশ্য নহে। সমাজদর্শনের পক্ষে ধর্মের সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রযোজন।

২। **ধর্মের সামাজিক তাৎপর্য (The Social Significance of Religion):** সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সত্তার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ভক্তিকে ধর্ম বলা হয। কিন্তু ধর্ম কেবল পরমসত্তার উপাসনা নহে, ধর্মের অপর একটি দিক আছে, যাহার আলোচনা অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ। ধর্মের এই আদর্শটি হইল সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। ডিকিনসন্ (Dickinson) আন্তর্জাতিক ঐক্য-প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য প্রকৃত ধর্মভাব-প্রচারের প্রযোজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রকৃত ধর্মপ্রচারের দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ ও যুদ্ধ বন্ধ করা যাইতে পারে ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা সহজ হইতে পারে। আচার্য বিনোবা ভাবে সকল ধর্মের মূলনীতি কি—এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, একতা বা ঐক্যবদ্ধ হওয়াই সকল ধর্মের মূল আদর্শ, সকল জীবের সঙ্গে একাত্মতা-বোধ জন্মিলে বৈষম্যের ভাব দূরীভূত হইয়া যাইবে, একই আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজমান,—এই ভাব জাগ্রত হইবে।

ধর্ম ও সামাজিক ঐক্য

যদিও ধর্মে পূজা-উপাসনা, ধ্যান-ধারণার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, কিন্তু

জীবসেবা, বিশ্বমানবের সেবা ইত্যাদিও ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :

ধর্ম ও জীবসেবা

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

অর্থাৎ জীবসেবাই ভগবৎসেবা। বিবেকানন্দের মতে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। সুতরাং ধর্মের ধারণার মধ্যে মানুষের পরম কল্যাণ নিহিত আছে। জনকল্যাণসাধন করিবার জন্য ধর্মভাবের প্রচার অতি প্রয়োজনীয়।

মানুষে মানুষে একাত্মতা উপলব্ধি করিবার জন্য, বিদ্বেষভাব দূর করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক যুগে অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। আদিমযুগে মানুষ যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত, তখনই তাহারা কোন অলৌকিক শক্তির উপরে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া তাহার পূজা-উপাসনা ইত্যাদির দ্বারা সেই শক্তির কৃপা লাভ করিবার চেষ্টা করিত। ইহা হইতে একদিন মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত হয় এবং ধীরে ধীরে এই ভাব উন্নতি লাভ করিয়া সমাজে বহু জনহিতকর কার্য সংঘটিত হয়। যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে এক অনন্ত সত্তার মধ্যে বিরাজমান, তখন সে কেবলমাত্র জাগতিক বস্তু বা জাগতিক সাফল্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। প্রার্থনা, উপাসনা, ধ্যান-ধারণার দ্বারা সে সেই অনন্ত সত্তার অধিকারী হইতে চায়। ইহার জন্য তাহার জীবনকে অত্যন্ত সংযত, সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিতে হয়। ধর্ম মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা আনে; দুঃখ ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে মানুষকে শক্তি দেয়; লোভ, মোহ, কামনা, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি হইতে মানুষকে রক্ষা করে; নৈতিক শক্তি ও সাহস জোগায়।

মানব-চরিত্রে ধর্মের প্রভাব

অনেক সময় দেখা যায়, ধর্মের ধারণার সহিত কুসংস্কার মিশ্রিত থাকে। এই-সকল কুসংস্কার মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে দূরত্ব বাড়াইয়া দেয়। তাহা ছাড়া ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া বহু অধার্মিকজনোচিত ঘটনা, মারামারি, রক্তারক্তি ইত্যাদি সংঘটিত হয়। এইজন্য কেহ কেহ ধর্মকে দোষারোপ করিয়া

থাকে। কিন্তু তাহারা ধর্ম সম্পর্কে ভুল মতবাদ পোষণ করে। ধর্ম কেবল ধর্মমত নয়, অন্ধবিশ্বাস নয়—ইহা বাস্তব, ইহার ব্যবহারিক মূল্য অত্যধিক।

সমাজে ধর্মের প্রভাব

ইহা সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা আনে, বিচ্ছিন্ন সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করে, কিন্তু প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতগুলি সবই সত্যকে প্রকাশ করে না। ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের পুরোহিতেরা সমাজে আপন প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য জনসাধারণকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া তোলে, অপর ধর্মমতের বিরোধীতা করে, ফলে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বিরোধীতা, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ইত্যাদি দেখা দেয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, সকল ধর্মেরই মূললক্ষ্য এক, সেই অনন্ত সত্তাকে লাভ করা, অনন্তজীবনের অধিকারী হওয়া।

মানুষের মধ্যে একটি চিরন্তন বাসনা আছে। তাহা হইল—সে কেবল বাঁচিয়া থাকিযাই সুখী হয় না, মহিমাময় জীবন লাভ করিতে চায়। এই মহিমাময় জীবন-লাভের বাসনা তাহাকে ধর্মের প্রেরণা দেয়। মানুষের ক্ষুদ্রতা, অপূর্ণতা, সসীমতা হইতে বৃহৎ, পূর্ণ ও অসীম সত্তার সঙ্গে মিলিত হইবার বাসনার উদয় হয়। যতক্ষণ পরম সত্তার সহিত মানুষ মিলিত হইতে পারে না, ততক্ষণ সে অপূর্ণই থাকে। সুতরাং প্রকৃত ধর্মের মধ্যে কোন জটিলতা নাই, কোন কুসংস্কার নাই। রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন:

ধর্মের প্রকৃত রূপ

"সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরমের অন্বেষণই ঈশ্বরের অন্বেষণ।" ("The search of the mind for beauty, goodness and truth is the search for God.)। ধর্ম কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ নহে। যেখানে সত্যের অনুসন্ধান হয়, সুন্দরের পূজা হয়, কল্যাণকে আহ্বান করা হয়, সেইখানে ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেইখানেই ঈশ্বর বিরাজমান থাকেন। ধর্ম ব্যক্তিগতও নহে, দেশগতও নহে। ধর্মের মূলতত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঈশ্বর এক, বিভিন্ন ধর্মমত বিভিন্ন উপায়ে একই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে।

৩। **ধর্মের উৎপত্তি (Origin of Religion):** ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন দার্শনিক ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন।

টাইলরের মতে আত্মার ধারণা হইতেই ধর্মভাবের উদ্ভব হইয়াছে। আদিমযুগের লোকেরা জীবন্ত মানুষের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিত এবং তাহাদের ধারণা ছিল যে, আত্মা যখন চিরকালের জন্য দেহ ত্যাগ করিয়া

যায়, তখনই মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই আত্মার ধারণা হইতেই সর্বপ্রাণবাদের (animism) উদ্ভব হইয়াছে এবং সর্বপ্রাণবাদই ধর্মের আদি বলিয়া টাইলর মনে করিয়াছেন। মৃত মানুষের আত্মা জীবন্ত মানুষের অনেক ক্ষতি করিতে পারে বলিয়া আদিম মানুষেরা বিশ্বাস করিত। সেইজন্য তাহারা মৃত আত্মাদের তৃপ্তি-সাধনের জন্য পূজা-উপাসনা ইত্যাদি নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিত। এই প্রেতাত্মার ধারণা ও তাহার তৃপ্তিসাধনের জন্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ হইতেই ধর্ম ও ধর্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছে। এককথায়, সর্বপ্রাণবাদ এবং প্রেতাত্মার পূজাই ধর্মের মূল উৎস।

টাইলরের মতবাদ

ফ্রেজারই প্রথম আদিমযুগের ধর্মের আলোচনায় প্রয়োগবাদ (pragmatism) প্রবর্তন করেন। তিনি মনে করেন, মানুষের নিষ্ক্রিয় চিন্তা বা ধ্যান-ধারণা হইতে ধর্মের উদ্ভব হয় নাই, ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে যাদুবিদ্যার (magic) অক্ষমতা বা অকৃতকার্যতা হইতে। তাঁহার মতে ধর্মের উৎপত্তির পূর্বে মানুষের মধ্যে যাদুবিদ্যা প্রচলিত ছিল। যাদুবিদ্যার ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে আনিয়া আপন প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। কিন্তু যাদুবিদ্যা যখন অকৃতকার্য হইতে লাগিল, তখনই ধর্মভাবের উদ্ভব হইল (when magic failed, religion began)। কিন্তু এই মতবাদ গতানুগতিকভাবে মানুষের ইতিহাস হইতে ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করে, প্রকৃতপক্ষে যে-সকল ধর্ম তখন মানব সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহাদের কথা বা মানব-সভ্যতার উপরে তাহাদের প্রভাবের কথা লইয়া আলোচনা করে না।

ফ্রেজারের মতবাদ

ডুরখাইম মনে করেন যে, নানাপ্রকার বিপদ-আপদ, ভুল-ভ্রান্তি হইতে নিরাপদে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা হইতেই ধর্মভাবের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহার মতে সামাজিক দৃঢ়তা-অর্জনই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

ডুরখাইমের মতবাদ

প্রকৃতপক্ষে কেবল সর্বপ্রাণবাদ (animism) বা ভক্তিবস্তুবাদ (fetishism) বা প্রতীকবাদের (totemism) দ্বারা ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহারা হইল ধর্মের এক-একটি অঙ্গ। ইহারা ধর্মের অংশ বটে, কিন্তু ধর্মের সম্পূর্ণ রূপ নহে।

ধর্মের প্রকৃত উদ্ভব বিবর্তন-প্রক্রিয়ার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর।

(১) আদিমযুগের মানুষ অনুন্নত ছিল বলিয়া তাহাদের চতুষ্পার্শ্বের পরিবর্তনশীল জগৎ তাহাদিগকে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও অভিভূত করিয়াছিল। (২) এই-সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা পরিবর্তন মানুষের মধ্যে ভীতি ও কৌতূহল জাগ্রত করিত এবং (৩) তাহারা এই পরিবর্তনের কারণ জানিবার চেষ্টায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিত। (৪) ইহা হইতেই প্রাকৃতিক শক্তির অধীশ্বররূপে এক সত্তার অস্তিত্বে এবং তাহার শক্তি ও কার্যকলাপে মানুষের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। (৫) তাহারা এই শক্তিকে দমনীয় (controllable) ও অদমনীয় (uncontrollable) বলিয়া মনে করিত। দমনীয় শক্তি হইতে যাদুবিদ্যা, আর অদমনীয় শক্তি হইতে ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। আদিমযুগ হইতেই ধর্ম ও যাদুবিদ্যা পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে।

বিবর্তন প্রক্রিয়া ও ধর্ম

এই-সকল মতবাদ ব্যতীত ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক যুগে বহু মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই-সব মতবাদ হইল প্রকৃতিবাদ, মার্কসীয় মতবাদ ইত্যাদি।

৪। **প্রকৃতিবাদ কাহাকে বলে (What is Naturalism) :**

Naturalism is "a view of the world, and of man's relation to it, in which only the operation of natural (as opposed to supernatural or spiritual) law and forces is admitted or assumed."

প্রকৃতিবাদ হইল এমন একটি মতবাদ, যাহা প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়মাবলীর দ্বারা জাগতিক সমস্ত ঘটনার ও মানুষের সহিত জগতের সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রদান করে। অর্থাৎ যে-মতবাদ সকল ঘটনার প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়া থাকে, তাহাকে প্রকৃতিবাদ বলা হয়।

এক সময় ছিল, যখন মানুষ সকল প্রকারের প্রাকৃতিক ঘটনার অলৌকিক ব্যাখ্যা দিত, সমস্ত কিছুর মধ্যে অলৌকিক সত্তার অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত। ঝড়, জল, বৃষ্টি, রৌদ্র প্রভৃতি সবই বিভিন্ন দেবতা দ্বারা সংঘটিত হয় বলিয়া মনে করিত। এইজন্য মানুষ জলের দেবতা, রৌদ্রের দেবতা, ঝড়বৃষ্টির দেবতা ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ সত্তার অস্তিত্বেও মানুষ বিশ্বাসী হইয়াছে।

প্রাকৃতিক ঘটনা ও দেবদেবী

কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা এই-সকল ঘটনার ব্যাখ্যা

দিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি কোন অলৌকিক দেবতার ক্রিয়া নয়—অতি স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক নিয়মেই এই-সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বিজ্ঞান সর্বপ্রকার অলৌকিক ব্যাখ্যার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া দিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

ইহার ফলে একদল প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব হয়, যাহারা সকল প্রকার অলৌকিক সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতে থাকে, যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর নহে, তাহার প্রতি তাহারা অবিশ্বাসী হইয়া উঠে। তাহাদের মতে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করিবার জন্য ঈশ্বরের বা কোন অলৌকিক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা সকল বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রকৃতিবাদীরা বিশ্বাস করে না, তাহারা মনে করে, প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে, প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহার পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। পরমাণু ও গতির সাহায্যে বিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা, কার্যকারণ-সম্পর্কের দ্বারা জগতের পরিবর্তন ও জাগতিক সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব

প্রকৃতিবাদ অপেক্ষাকৃত নূতন মতবাদ। প্রাচীনকালে ইহা জড়বাদ নামে প্রচলিত ছিল। জড়বাদীরা জড় হইতেই সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে থেলিস, ডিমোক্রিটাস প্রভৃতি কয়েকজন জড়বাদী দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল; তাঁহারা জড় ও পরমাণুকেই সমস্ত বস্তুর আদি-উপাদান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আধুনিক কালে জড়বাদ প্রকৃতি-বাদ নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে। প্রকৃতিবাদীদের মতে কেবল পরমাণু দ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। শক্তি (Energy), গতি (Motion), প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্যকারণ-সম্পর্ক জড় অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। ডারউইনের বিবর্তনবাদও প্রকৃতি-বাদকে সমর্থন করে। আধুনিক প্রকৃতিবাদীরা জড় হইতে প্রাণ ও মনের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করে। তাহাদের মতে জড় হইতে বিবর্তনের ফলে প্রাণের উদ্ভব হয়। আবার প্রাণ হইতে মনের অভিব্যক্তি হয়। এইভাবে সরল বস্তু বিবর্তিত হইয়া জটিল আকার ধারণ করে। জগতের প্রত্যেক নূতন স্তর পূর্বস্তর হইতে উদ্ভূত হয়। প্রকৃতিবাদীদের মতে এই বিবর্তনের কোন

জড়বাদ ও প্রকৃতিবাদ

উদ্দেশ্য নাই। বিবর্তন-প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক নহে, ইহা যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতিবাদও বিভিন্ন দার্শনিকের কাছে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, যাহার ফলে বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

৫। প্রকৃতিবাদ-সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of Naturalism):

প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে তিনরকম মতবাদ প্রচলিত আছে, যথা—(ক) **নির্বিচারী প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ** (Dogmatic Naturalism or Materialism), (খ) **অজ্ঞেয়বাদী প্রকৃতিবাদ** (Agnostic Naturalism) ও (গ) **মনস্তত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদ** (Psychological Naturalism)।

(ক) নির্বিচারী প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ (Dogmatic Naturalism or Materialism): জড়বাদীরা মনে করে যে, জড়ই বিশ্বের চরমতত্ত্ব। তাহাদের মতে জড় হইতেই প্রাণ, মন ইত্যাদির উদ্ভব হয়।

ব্যাখ্যা

বিশ্বের অভিব্যক্তির পূর্বে কেবল জড় ও গতি বর্তমান ছিল। এই জড় ও গতি হইতেই যান্ত্রিকভাবে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বের অভিব্যক্তি সম্ভবপর হইয়াছে। এই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ নাই, যান্ত্রিকভাবেই ইহা পরিচালিত হয়।

প্রাচীন গ্রীস দেশে এইরূপে কয়েকজন জড়বাদী দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদিকে বিশ্বের আদি-উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। থেলিসের (Thales) মতে জলই বিশ্বের আদি-উপাদান, অ্যানাক্সিমেনেস (Anaxemenes) বায়ুকেই আদি-উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিরাক্লিটাস (Heraclitus) অগ্নিকেই আদি-উপাদান বলিয়াছেন, আর এম্পেডোক্লেসের (Empedocles) মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ—এই চারিটিই বিশ্বের আদি-উপাদান। ইহার পর গ্রীসদেশে পরমাণুবাদী দার্শনিকদের আবির্ভাব হয়। ডেমোক্রিটাস ও লিউকিপ্পাসের (Democritus and Leucippus) মতে পরমাণুই বিশ্বের আদি-উপাদান।

গ্রীসদেশের জড়বাদী দার্শনিক

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুবাদ নূতন আকার ধারণ করে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করে, নিশ্চল জড়ের দ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহাদের মতে শক্তিই জড়ের প্রকৃত রূপ। এই জড় ও গতি

হইতে যান্ত্রিকভাবে বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে এবং বিশ্ব পরিবর্তিত হইতেছে।

পরমাণুবাদ ও জড়বাদ

জড়বাদীরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করে। যাহা কিছু প্রত্যক্ষবহির্ভূত, তাহার অস্তিত্বে জড়বাদীরা বিশ্বাস করে না। প্রত্যক্ষের দ্বারা কোন ঈশ্বরের বা পরমব্রহ্মের অস্তিত্বকে জানা যায় না। সুতরাং জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে—এই মতবাদে জড়বাদীরা বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারে না। তাহাদের মতে প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা জড় ও শক্তিকে জানিতে পারি। সুতরাং, জড় ও শক্তি হইতে বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে—ইহাই সত্য।

সমালোচনা : নির্বিচারবাদী জড়বাদীরা বিশ্বসৃষ্টির যে-ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহা যুক্তিসম্মত নহে :

(১) তাহাদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যতীতও অনুমান, উপমান ইত্যাদি প্রমাণকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ, তাহা প্রমাণ করিতে হইলেও অনুমান, উপমান ইত্যাদির সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষের বাহিরে যে কোন সত্তা নাই—এই মতবাদ স্বীকার করা যায় না।

(২) ইহা ব্যতীত জড়বাদীরা প্রাণ, মন ইত্যাদি জড় হইতেই উদ্ভুত বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু প্রাণ ও মনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা জড়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। জড় হইতে কি উপায়ে প্রাণ ও মনের উদ্ভব হয়, তাহার কোন ব্যাখ্যা তাহারা দিতে পারে নাই।

(৩) জড়বাদীদের মতে এই বিশ্বের অভিব্যক্তি যান্ত্রিকভাবে হইতেছে, ইহার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু জগতের বিবর্তন-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ইহা যেন কোন উদ্দেশ্য লইয়া, কোন আদর্শে পৌছিবার জন্য বিবর্তিত হইতেছে, ইহাকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। ইহার সম্মুখে যে-আদর্শ বর্তমান, সেই আদর্শকে বিসর্জন দিলে বিবর্তন-প্রক্রিয়াই যেন অর্থহীন ও মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার আদর্শ বলিয়া মনে হয়। এই আদর্শকে না মানিলে জগতের বিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় না।

(খ) অজ্ঞেয়বাদী প্রকৃতিবাদ (Agnostic Naturalism) : অজ্ঞেয়বাদী প্রকৃতিবাদীরা জড়বাদীদের মত কোন একটা সত্তাকে চরমতত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করে না। তাহারা বলে, বিশ্বের চরমতত্ত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান-

লাভ করা সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা চরমতত্ত্বকে কখনও জানিতে পারি না, কেবল চরমতত্ত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করিতে পারি। সুতরাং চরমতত্ত্ব বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা আমাদের নিকট চিরকাল অজ্ঞেয়। আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সাহায্যেই জগতের ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত। কোন অলৌকিক অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, যাহা অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক এবং যাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে, তাহার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার প্রচেষ্টা অর্থহীন। চরমতত্ত্ব চিরকালই আমাদের নিকট অজ্ঞেয় থাকিবে। তবে প্রাণীর মধ্যে যে-চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই, তাহা জড়ের উপবস্তু (Epiphenomenon)। অর্থাৎ জড় হইতেই তাহার উৎপত্তি হইয়াছে।

ব্যাখ্যা

সমালোচনা: অজ্ঞেয়বাদী প্রকৃতিবাদের বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি হইতেছে: (১) এই মতবাদ মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ই মানুষের জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস নহে। ভারতীয় দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিক-মতে অতীন্দ্রিয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মানুষের একপ্রকার ইন্দ্রিয় থাকে, তাহার দ্বারা মানুষ অলৌকিক বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তাহাদের মতে প্রত্যক্ষ দুই প্রকারের—লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে জাগতিক বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, আর অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বিষয়, দূরের বিষয়, অতীত বা ভবিষ্যতের বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহাকে তাহারা যোগজ প্রত্যক্ষও বলিয়া থাকে।

(২) চরমতত্ত্ব মানুষের অজ্ঞেয় বা জ্ঞানের সীমার বাইরে—এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নহে। হেগেলের মতে চরমতত্ত্বের সহিত লৌকিক জগতের প্রকৃতপক্ষে কোন দূরত্ব নাই। এই বিশ্বের মধ্যেই চরমতত্ত্ব প্রকাশমান, বিশ্ব চরমতত্ত্বের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং এই সসীম জগতেই অসীম চরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর।

(৩) অজ্ঞেয়বাদীরা চৈতন্যকে জড়ের উপবস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যথেষ্ট সহায়তা করিলেও প্রকৃতিবাদীরা মূল্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য ইত্যাদিকে স্বীকার করে না বলিয়া দর্শনের দিক হইতে এই মতবাদকে খুব মূল্য দেওয়া যায় না।

(৪) এতদ্ব্যতীত অচেতন জড় হইতে চৈতন্যর উদ্ভব কিরূপে হইল, সেই সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদীরা কোন সদ্ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই।

(গ) মনস্তত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদ (Psychological Naturalism) : আধুনিক কালের কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মানুষের মনে ঈশ্বর, দেবদেবী, চরমতত্ত্ব, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির ধারণার উদ্ভবের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিয়াছে। তাহাদের মতে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর, চরমতত্ত্ব, দেবদেবী ইত্যাদি কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তবে ইহাদের ধারণার উৎপত্তি মানুষের মনে কিরূপে হইল, সেই সম্পর্কে এই মনোবিজ্ঞানীরা বলে যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে মনস্তত্ত্বমূলক ক্রিয়া। তাহারা বলে, মানুষের অবদমিত যৌন বাসনা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি। ফ্রয়েড (Freud), ইয়ুং (Zung), ভুণ্ট্ (Wundt) ইত্যাদি এই মতবাদের উল্লেখযোগ্য সমর্থক।

ব্যাখ্যা

ফ্রয়েড মনে করেন যে, আমাদের মনের অবচেতন-স্তরে (subconscious) অনেক ইচ্ছাই অবদমিত হইয়া থাকে। সমাজের ভয়ে, শাসনের ভয়ে তাহারা চেতন-স্তরে (conscious) প্রবেশ করিতে পারে না। নিরন্তর এই-সকল বাসনা চেতন-স্তরে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে চেতন-স্তরে প্রবেশ-লাভ করিতে পারে না বলিয়া তাহারা স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ অবদমিত যৌন বাসনা স্বাভাবিকভাবে চেতন-স্তরে প্রবেশলাভ করিবার অনুমতি না পাওয়াতে ধর্মের ছদ্মবেশেও প্রকাশিত হয়। কারণ, ধর্মভাবের সামাজিক স্বীকৃতি আছে। ধর্মের আবেগের মাধ্যমে অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়।

ফ্রয়েডের মতবাদ

বিবর্তনবাদী ডারউইনের মতেও মানুষের মৌলিক উপাদান কামনা-বাসনা; বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের মৌলিক উপাদান নহে, কৃত্রিম উপাদান। কামনা-বাসনা মানুষের মনের অবচেতন-স্তরে লুক্কায়িত থাকে, সেইখান হইতে ধর্মের ছদ্মবেশে তাহারা প্রকাশিত হইতে চায়। সুতরাং ধর্ম বা ঈশ্বর-কল্পনার মূল উৎস অবদমিত কামনা-বাসনা বা যৌন প্রবৃত্তি।

বিবর্তনবাদীদের মতবাদ

সমালোচনা : কিন্তু মনস্তত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদ ধর্ম সম্পর্কে যে-ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে, তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই।

(১) মানুষ বিচারবুদ্ধিশীল জীব। কেবল কামনা-বাসনার দ্বারা মানুষ পরিচালিত হইতেছে—এই মতবাদ স্বীকার করা যায় না। (২) ধর্মভাবের উৎপত্তিও যে কেবল অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা হইতে হইয়াছে, তাহাও স্বীকার্য নহে। বরং ধর্মাবতারদিগের জীবনী পাঠ করিলে বিপরীত ধারণাই জন্মে। বিচারবুদ্ধি তাঁহাদেব একটা মহৎ আদর্শেব দিকে লইয়া যায়, চরমতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা স্বর্গীয় সুখে নিমজ্জিত থাকেন। (৩) সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরম্-এর আদর্শেব উৎপত্তি কেবল যৌনবাসনারূপ পশু-প্রবৃত্তি হইতে হইয়াছে, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। (৪) উপরন্তু যৌন আকাঙ্ক্ষাব যথাযথ তৃপ্তিসাধন হইলেই ধর্মভাব বিলুপ্ত হইতে পারে না। (৫) বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই উচ্চচিন্তা সম্ভব, ধর্মভাব মানুষের উচ্চতর মনোবৃত্তিরই প্রকাশ। যৌন আকাঙ্ক্ষার বিকৃত প্রকাশ বলিলে ধর্মকে অত্যন্ত নিম্নস্তরে নিক্ষেপ কবা হয়।

৬। **ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যা (The Marxist Interpretation of Religion):**

মার্কসের মতবাদ

জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস ধর্মেব উৎপত্তি সম্পর্কে এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান কবিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজে শ্রেণীবৈষম্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ও শোষণনীতি অব্যাহত রাখিবার জন্য পুঁজিপতিরা ধর্মভাবের সৃষ্টি করিয়াছে।

(১) দুঃখ ও দারিদ্র্যে যাহারা নিপীড়িত হইতেছে, তাহাদিগকে স্বর্গ-সুখের আশ্বাস দিয়া নিরস্ত কবিয়া রাখাই ধর্মের উদ্দেশ্য। জনসাধারণের মধ্যে 'ধর্মভাবের উদ্রেক হইলে তাহারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টের জন্য পুঁজিপতি-দের দোষী না কবিয়া নিজেদের ভাগ্যকেই দোষারোপ করে এবং দুঃখকষ্টকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করিয়া নীরবে সহ্য করিয়া যায়। আর এই সুযোগে পুঁজিপতিরা জনসাধারণকে শোষণ করিতে থাকে।

(২) ধর্ম মানুষকে যে ঈশ্বর ও স্বর্গের আশ্বাস দেয়, তাহার কোন ভিত্তি নাই। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে ধর্ম মিথ্যা ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এঙ্গেলস বলিয়াছেন, মিথ্যাই হইল ধর্মের প্রথম কথা ("The first word of religion is a lie.")। এই মিথ্যা স্বর্গসুখের আশ্বাস দিয়া পুঁজিপতিরা জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

(৩) ধর্মভাবের মধ্যে এমন একটা মাদকতা আছে, যাহা জনসাধারণকে

অভিভূত, আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং তাহারা বিচারবুদ্ধি হারাইয়া অন্ধ-বিশ্বাসে ধর্মভাবকে মানিয়া লয়। মার্কস মনে করেন, ধর্ম হইল জনগণের আফিং ("Religion is the opium of the masses.")। ইহার ফলে পুঁজিপতিদের জনসাধারণকে শোষণ করিবার পক্ষে সুবিধা হয়। কারণ, ধর্মভাবের ফলে মানুষ পার্থিব সুখ-সুবিধা, ঐশ্বর্য, ধন, যশ ইত্যাদির প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে, অপার্থিব, অলৌকিক, কল্পিত সুখের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

(৪) যাহারা দারিদ্র্যে, দুঃখ-কষ্টে নিপীড়িত, তাহাদিগকে ধর্ম স্বর্গীয় সুখের আশ্বাস দান করে। ধর্ম মানুষকে একত্র না করিয়া বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্য মার্কস মনে করেন, লোকের মনে যতদিন ধর্মবিশ্বাস থাকিবে, ততদিন পুঁজিপতিরা তাহাদের শোষণ করিবে।

(৫) পুঁজিপতিদের অত্যাচার হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইতে হইলে তাহাদের মন হইতে ধর্মবিশ্বাস, স্বর্গ, পরলোক ইত্যাদির বিশ্বাস দূর করিতে হইবে।

এই-সকল কারণে মার্কস ও এঙ্গেলস তাহাদের প্রস্তাবিত সমাজতন্ত্রবাদে ধর্মের কোন স্থান দেন নাই। তাঁহাদের মতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হইলে মানুষের দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। ইহলোকে সুখী হইতে পারিলে মানুষ আর স্বর্গরাজ্য বা পরলোকের সুখের আশায় এই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিবে না। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে, তাহার সুবণ্টনের ব্যবস্থা হইলে মানুষ ইহজীবনেই সুখী হইবে এবং ধীরে ধীরে ধর্মভাব তাহাদের মন হইতে মুছিয়া যাইবে। মার্কসবাদীরা মনে করে, সমাজ হইতে সাম্রাজ্য-বাদ উঠিয়া গেলে যে-শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে ধর্ম ও কুসংস্কারের কোন স্থান থাকিবে না। ধর্ম ও কুসংস্কার তখন স্বাভাবিক-ভাবেই সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ ও ধর্ম

সমালোচনা: মার্কসের ধর্ম সম্পর্কে মতবাদ ভুল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত:

(১) ধর্ম পুঁজিপতিদের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। আদিম যুগে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির নিকটে যখন নিজেকে বড় অসহায়, ক্ষুদ্র মনে করিত, তখনই মানুষের মনে এক অপার্থিব সত্তার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে,

ধর্মভাব মানুষের অন্তর হইতে আপনি বিকশিত হইয়াছে। পুঁজিপতিদের মিথ্যা আশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের ধারণার উদ্ভব হয় নাই।

(২) এঙ্গেলসও স্বীকার করিয়াছেন যে, "ধর্ম মানুষের অলীক কল্পনা; যে-প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শক্তির উপর অলৌকিকতার আরোপ করিয়া ধর্মভাবের সৃষ্টি করা হইয়াছে।" প্রথমে এই শক্তি ছিল প্রাকৃতিক শক্তি, পরে তাহা লোকের কল্পনায় পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করে এবং সেই-সকল শক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের দেবদেবীরূপে কল্পনা করা হয়।

(৩) মার্কসের মতে ধর্ম মানুষের মনকে মোহিত, অভিভূত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে। ধর্ম মানুষকে একত্র না করিয়া বিচ্ছিন্ন করে এবং সামাজিক উন্নতিতে বাধা দেয়। কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্মের মূলতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া যদি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাহা হইলেই যত অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(৪) মার্কস ধর্মের যে কুফলের কথা বলিয়াছেন, তাহা ধর্মের ফল নহে, অধর্মের ফল। ধর্ম কখনও মানুষকে নীচতা, বিরোধিতা, কুসংস্কার ইত্যাদি শিক্ষা দেয় না। ধর্মের শিক্ষা নিঃস্বার্থপরতা, পরোপকারিতা, সহযোগিতা, উদারতা ইত্যাদি। মানুষ যখন ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তখনই স্বার্থপর ও পরস্পরবিরোধী হয়। ধর্মের মূলনীতি হইল সকলের সহিত একাত্মতা অনুভব করা। ধর্মের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা মানুষের অহং-ভাব লুপ্ত হইয়া গেলে মানুষ বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতা অনুভব করে, সমস্ত বিরোধের ঊর্ধ্বে চলিয়া যায়। ধর্ম মানুষের চরিত্র উন্নত ও মহৎ করিয়া সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করে।

(৫) মার্কস মনে করেন, মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব ইত্যাদি ঘুচিয়া গেলেই মানুষ সুখী হইবে। তাঁহার মতে মানুষের কোন বস্তুর অভাব না থাকিলে, সে আর স্বর্গের অন্বেষণ করিবে না, পৃথিবীতে দুঃখ আছে বলিয়াই মানুষ স্বর্গীয় সুখ কামনা করে। কিন্তু মানুষকে তাহার ভোগের সকল প্রকারের সামগ্রী দিলেও মানুষ সুখী হইবে না। কারণ, আত্মিকবিকাশ সাধনই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। আত্মার উন্নতির দ্বারা মানুষ স্বর্গীয় আনন্দলাভ করে।

(৬) তবে আত্মার উন্নতি মানুষের জীবনের লক্ষ্য হইলেও ধর্ম ইহজীবনকে

তুচ্ছ করে না। ধর্মের শিক্ষা হইল—মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে বাস করিবে, ততদিন ইহার সম্পর্কে তাহার দায়িত্বকে অবহেলা করিতে পারিবে না। প্রত্যেককেই সামাজিক কর্তব্যপালন করিতে হইবে, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কামভাবে পার্থিব কর্তব্যসম্পাদন করিতে হইবে। ইহাই ধর্মের নির্দেশ।

উপসংহার ঃ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম সমাজ হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না। মানুষ কেবল পার্থিব সম্পদ লইয়া বেশীদিন সুখী হইতে পারে না। মানুষের খাদ্য-দ্রব্যের, পার্থিব সম্পদের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু তাহা কেবল জৈবিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। জৈবিক প্রয়োজন মিটাইতে পারিলেই মানুষের দৃষ্টি আরও ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ হইবে। সত্যের অনুসন্ধান করা, সুন্দরের পূজা করা, কল্যাণের আহ্বান করাই ধর্ম। এই ধর্ম কখনও লুপ্ত হইবে না। কেবল স্বর্গসুখের আশায় লোক ধার্মিক হয় না, আত্মিক বিকাশসাধনের জন্য ধর্মের উপাসনা করে। সুতরাং মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে।

ধর্ম চিরস্থায়ী

৭। ধর্মের সংহতি-শক্তি (Religion as a Cohesive Force) ঃ সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে মানুষের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করিবার জন্য, সমাজকে সুসংহত করিবার জন্য ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছে। ধর্মের অনুশাসনের দ্বারা মানুষ যত সংযত হইয়াছে, অন্য কোনপ্রকারে তাহা হওয়া সম্ভবপর হইত না। ধর্ম মানুষের জীবনকে সংযত করে, পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করে, জীবনে শৃঙ্খলা আনে এবং মানুষকে শক্তিশালী করে।

ধর্মের দুইটি দিক আছে: (১) একদিকে ধর্ম ব্যক্তির আত্মিক উন্নতিসাধন করে, (২) অন্যদিকে ধর্ম সামাজিক ঐক্যস্থাপন করে। ধর্মের শেষোক্ত দিকটিই আমাদের সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে সমাজকল্যাণকর সকল কার্যই ধর্মের অন্তর্গত জনসেবা, রাজনৈতিক আদর্শ, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রতি অনুরাগও ধর্মের অঙ্গীভূত।

ধর্মের প্রধান কাজ সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা।

(১) আধুনিক যুগে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের পক্ষেও ন্যায়পরতা ও মৈত্রীর আদর্শ সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। এই-সকল ক্ষেত্রে মানবজাতির কল্যাণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবের দ্বারা অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভবপর।

(২) সমাজে হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বস্তির উন্নয়ন ইত্যাদি সেবামূলক কার্যের দ্বারাও সমাজের বহু উন্নতিসাধন করা যায়। (৩) এই-সকল কর্মের মধ্যে অবশ্য ধর্মের কোন বাহ্য প্রকাশ থাকে না, কিন্তু ধর্মকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে দেখা যায়, অনেক ধর্মপ্রতিষ্ঠানও এই কার্যগুলিকে ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করে।

এই ধরনের কার্যের আরও উন্নতি হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধর্মের মূলনীতি লোকে যতই বুঝিতে পারিবে, ততই তাহাদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হইবে এবং জনহিতকর কার্যে লোকে বেশী উৎসাহিত হইবে।

আধুনিক যুগে জাতিতে জাতিতে বিরোধের ভয়ংকর পরিণামের ভয়ে লোকে আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠার কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে। কিন্তু কেবলমাত্র যান্ত্রিক পরিকল্পনার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধের অবসান হইবে না। ধর্মের বিভিন্নতা আন্তর্জাতিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠার পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-বিরোধ, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ ধর্ম। কিন্তু সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব এক। সুতরাং আন্তর্জাতিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিভিন্ন ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া মূল-তত্ত্বগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই সকল বিরোধের অবসান ঘটিবে।

ধর্ম ও আন্তর্জাতিক ঐক্য

কিন্তু ইহার বিপদ এই যে, এই চেষ্টার ফলে অপর একটি নূতন ধর্মের উদ্ভব হইয়া, প্রাচীন ধর্মমতগুলির বিরোধী হইয়া পড়িতে পারে। ইহাতে নূতন ধর্মটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই সম্পর্কে কলিকাতায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ যে-ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: "পৃথিবীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে বিভক্ত করা উচিত নয়। কারণ, বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নাই, সকল মানুষই এক। তাঁহার মতে গরু বিভিন্ন বর্ণের হইতে পারে, কিন্তু দুগ্ধ শ্বেতবর্ণই হইয়া থাকে। যে-বস্তু দিয়াই অগ্নি প্রজ্বলিত করা হোক না কেন, সকল অগ্নিই এক।"

রাধাকৃষ্ণণের মত

তথাপি জাতিতে জাতিতে যে-বিরোধ বর্তমান যুগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, এক জাতি যখন নিজস্ব

নীতি ও মতবাদ অপর জাতিকে জোর করিয়া বিশ্বাস করাইতে বা গ্রহণ করাইতে চায়, তখনই মানুষে মানুষে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।' পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত বর্তমান। কিন্তু ভারতবর্ষে চিরদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও কাহারও উপর আপন নীতি, মতবাদ ও ধর্মকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেয় নাই। কারণ, প্রকৃত ধর্ম কখনও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। ধর্মের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ধর্মের যাহা কিছু প্রকাশ, সবই সেই এক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত। গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ সকলে এই একই বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

জাতিবিরোধ ও ধর্ম

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল মানুষই বর্তমানে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যা হইল কি উপায়ে এই মিলন-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। রাধাকৃষ্ণন আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করিবার তিনটি উপায়েব কথা বলিয়াছেন: "প্রথমতঃ, মানুষের নিজেকে সম্পূর্ণ বুঝিতে ও জানিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, সে অপরকে কি দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, সে অপরের নিকট হইতে কি গ্রহণ করিতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।"

জাতিবিবোধ-উপশমেব উপায়

তিনি আরও বলেন: "প্রকৃত ধর্ম হইল নিজেকে জানা (know thyself) ও অপরের দুঃখকষ্টের অংশগ্রহণ করা।" জীবন-সংগ্রাম হইতে পলায়ন করা ধর্মের উদ্দেশ্য নহে, ধর্মেব উদ্দেশ্য মানুষকে উন্নত জীবনের দিকে পরিচালিত করা। কর্ম ও ধর্ম সামঞ্জস্যহীন নহে; কর্মই ধর্ম, ইহাই ঈশ্বরের বাণী। সুতরাং প্রকৃত ধর্মের প্রচারেব দ্বারাই আন্তর্জাতিক ঐক্য ও শান্তি-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে উদার করে, উন্নত করে।

প্রকৃত ধর্ম

যিনি প্রকৃত ধার্মিক, তাঁহার দেশপ্রেম পৃথিবীব্যাপী, যুদ্ধ তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্যবস্তু; প্রেম, ভালবাসা সর্বাপেক্ষা সুন্দর। নিঃস্বার্থপরতা, প্রতিবেশীকে ভালবাসা, প্রতিবেশীর সহিত সহযোগিতা করা ইত্যাদি ধর্মের শিক্ষা। ধর্মের উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে জাগ্রত করিয়া ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা, ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মের মধ্যে রহিয়াছে দয়া, ভালবাসা, প্রীতি, ক্ষমা ইত্যাদির মূলমন্ত্র। সুতরাং পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক

প্রকৃত ধর্ম ও আন্তর্জাতিক শান্তি

ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, যুদ্ধ ও বিরোধ বন্ধ করিতে হইলে ধর্মের মূলনীতিগুলির প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের মনকে উন্নত ও উদার করিতে হইবে। সংযম, আত্মবিশ্লেষণ ও স্বার্থত্যাগের শিক্ষার দ্বারা মৈত্রী, ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সুতরাং একমাত্র ধর্মের মূলতত্ত্বের শিক্ষাই আন্তর্জাতিক বিরোধ বন্ধ করিয়া শান্তিপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতে পারে। সেইজন্য আধুনিক যুগে মানুষকে ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ধর্ম ও শিক্ষার আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

৮। **ধর্ম ও শিক্ষা** (Religion and Education): জনকল্যাণসাধনের জন্য ধর্মভাব যদি অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়, তবে ধর্মশিক্ষা শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া একান্ত দরকার।

কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মতবিরোধ থাকার ফলে শিক্ষার মধ্যে ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন করা সর্বদা সম্ভব হয় না। যেমন, বিদ্যালয়ের মধ্যে যদি কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থ-পাঠের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে অন্যধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা আপত্তি করিতে পারে। কারণ, সাধারণ লোকের ধারণা বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরবিরোধী। এইজন্য একই বিদ্যালয়ে বিভিন্নধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রী থাকিলে সেই বিদ্যালয়ে, ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। তখন ধর্মশিক্ষাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী হইতে বর্জন করিতে হয়।

ধর্মশিক্ষার অসুবিধা

কিন্তু ধর্মের বিভিন্নতা কেবল বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে, মূলতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং কোন বিশেষ ধর্মের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া ধর্মের মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ধর্মের মূলতত্ত্বের শিক্ষা

আধুনিক যুগে অনেকেই ছেলেমেয়েদের চরিত্র-গঠনে ধর্মশিক্ষা অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। জনকল্যাণমূলক কার্যে ছাত্রছাত্রীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে অপরিণতবয়স্ক শিশুমনের উপর কোন বিশেষ ধর্ম জোর করিয়া চাপানো উচিত নহে। কারণ, ইহাতে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যও নষ্ট হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করা, বাহির হইতে জোর করিয়া কিছু শিক্ষা দেওয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম সম্পর্কেও এই

কথা বলা যায়। তথাপি শিশুরা যে-পরিবেশে বড় হয়, সেই পরিবেশের ধর্মভাব অথবা অধর্মভাব হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা, যায় না। তাহাদের পিতামাতার ধর্ম সম্পর্কে যে-ধারণাই থাকুক না কেন, সেই ধারণার দ্বারা শিশুরাও প্রভাবান্বিত হয়। এমন কি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার মনোভাব শিশুদের উপর প্রভাববিস্তার করে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই-সকল প্রভাব হইতে তাহাদের মুক্ত করিয়া কোন বিশেষ ধর্মের ভাব তাহাদের মধ্যে জাগ্রত করা উচিত হইবে কিনা।

ধর্মের নূতন শিক্ষা

ধর্মভাব সম্পর্কে কিছু নির্দেশ ছাত্রছাত্রীদিগকে দেওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন : (১) বিভিন্ন ধর্মের বৈষম্যের আলোচনা ব্যতীত ইতিহাস দুর্বোধ্য হইবে, সাহিত্যিকের ধর্মভাব ব্যতীত সাহিত্য অর্থহীন হইয়া পড়িবে। (২) কিন্তু কোন একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাহাদের উচিত নহে। বিভিন্ন ধর্মমতকে উদারভাবে গ্রহণ করিবার মত উদারতা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। (৩) গ্রীকদের সম্পর্কে জানিতে হইলে তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতে হইবে এবং গ্রীকদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহাদের ইতিহাসের বিচার করিতে হইবে। (৪) সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব থাকিলে মানুষের মন সংস্কারমুক্ত হইতে পারে, বিভিন্ন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী না হইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে পারে। এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি করিয়া মানুষে মানুষে ঐক্যস্থাপন করাই ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য। (৫) অপর একটি প্রয়োজনীয় দিক, যাহা শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহা হইতেছে ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাব বা মূলতত্ত্ব। সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করিতে হইবে।

বিভিন্ন উপায়ে এই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে :

(১) বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে, শিল্পের ফলে সৌন্দর্যের প্রতি এবং ইতিহাস ও সাহিত্যের শিক্ষার ফলে কল্যাণের প্রতি অনুরাগ ও অকল্যাণের প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। (২) শিশুদের মনে এই ধারণা যেন না জন্মে যে, কোন বিশেষ ধর্ম অবলম্বন করিলেই বা কোন বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারাই কেবল মঙ্গল হয়। সকল ধর্মের মধ্যেই মানুষের পরম কল্যাণ নিহিত আছে—এই ভাবই জাগ্রত করিতে হইবে। (৩) এরূপ ভাবে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিতে পারে, সত্যকে শ্রদ্ধা করিতে এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করে; সৌন্দর্য এবং

কুৎসিতকে চিনিতে পারে, সৌন্দর্যকে গ্রহণ করিয়া কুৎসিতকে বর্জন করিতে পারে; কল্যাণ এবং অকল্যাণকে বুঝিতে পারে, কল্যাণজনক কার্যে যেন তাহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মে এবং অকল্যাণজনক কার্যে বিরাগ জন্মে।

এই ভাবে সত্য, শিব সুন্দরের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য এবং তাহা হইলেই ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং নিজেদের জীবনকে আদর্শ অনুসারে গঠন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া সমাজের কল্যাণজনক কার্যে আগ্রহশীল হইবে।

৯। আধুনিক ধর্মের ভূমিকা (The Role of Religion to-day):

আধুনিক ধর্মের প্রধান কার্য হওয়া উচিত—নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ধর্মের মধ্য হইতে যাবতীয় কুসংস্কার, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রাধান্য কমাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ, ধর্মের এই-সকল বাহ্য দিক মানুষের মনকে আচ্ছন্ন ও মোহাভিভূত করে। এই-সকল মোহ হইতে মানুষের মনকে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত ধর্মের পথ পরিষ্কার করিতে হইবে।

ধর্মশিক্ষার দ্বারা পৃথিবী ও মানবজীবন আরও সুন্দর, উজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করিবে, মানুষের জীবনে প্রশান্তি আসিবে, হিংসা, দ্বেষ, বিরোধ ইত্যাদি দূরীভূত হইবে। এই-সকল নিম্নতর প্রবৃত্তি সংযত হইলে মানুষ উচ্চতর চিন্তার উপযোগী ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিতে সমর্থ হইবে, শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে। যদিও ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তথাপি মানুষ সমাজে বাস করে এবং ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক উন্নতিলাভ সহজতর হয়। ধর্মের কর্তব্য মানুষকে তাহার আপন কর্তব্য কর্মের প্রতি সচেতন করা, তাহার জীবনের যে একটা মূল্য আছে—এই বোধ জাগ্রত করা, এবং এই জীবনেই চরম আনন্দলাভের পথ নির্দেশ করা। ধর্ম মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে যে-আনন্দ আছে, সেই আনন্দ উপলব্ধি করাইবে এবং সামাজিক বিরোধ দূরীভূত করিয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিবে।

ধর্মশিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান (Social Pathology)

১। **সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞানের প্রকৃতি (Nature of Social Pathology) :**

মানুষের শরীরের মত সমাজও নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যখন সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দ্বারা সমাজের ক্ষতিসাধন করে, তখনই সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে বলা যায়। কারণ, এইরূপ আচরণের দ্বারা সমাজের আদর্শ নষ্ট হয়, সমাজের উন্নতি রুদ্ধ হয়।

সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

একজন ভ্রষ্টচরিত্র উচ্ছৃঙ্খল নাগরিকের দ্বারা সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইতে পারে। চোর, ডাকাত, খুনী ইহাদের দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার যে ব্যবসায়ী খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে ভেজাল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে, তাহার দ্বারা সমাজের সর্বাপেক্ষা বেশী অপকার হয়। এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই সামাজিক ব্যাধি দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে। এইজন্য ব্যাধির সূচনাতেই সুচিকিৎসার প্রয়োজন। কারণ, সময়মত চিকিৎসা না করিলে ব্যাধি সমস্ত সমাজদেহে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবার জন্যই সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান।

২। **অপরাধ (Crime) :**

"Crime is the breaking of a law and therefore implies the existence of a legal code." আইনভঙ্গ করাকেই অপরাধ বলা হয় এবং 'অপরাধ' শব্দটিই আইনের অস্তিত্ব সূচনা করে। আইনের

রাষ্ট্রীয় আইন ও অপরাধ

সৃষ্টি অবশ্য উন্নত সমাজেই হইয়াছে। আদিম যুগের সমাজে কোন লিখিত আইন ছিল না। উন্নত সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্যই আইনের সৃষ্টি হয়। এই আইন সকলে মানিতে বাধ্য। রাষ্ট্রের আইন অমান্য করিলে অপরাধ হয় এবং রাষ্ট্র অপরাধীর বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করে।

এই-সকল রাষ্ট্রীয় আইন-সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বেও সমাজে কতকগুলি

রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে রাষ্ট্রীয় আইন থাকা সত্ত্বেও সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি বর্তমান আছে। এই-সকল প্রথা-পদ্ধতি না মানিলেও সামাজিক অপরাধ হয় এবং সমাজও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

সামাজিক আইন ও অপরাধ

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, শাস্তিবিধান করিয়াও ব্যক্তিকে সংশোধন করা যায় না। শাস্তির কাল শেষ হইলে আবার সে পূর্বের মত একই অপরাধ করিয়া থাকে। চুরি করিতে করিতে এমন অভ্যাস হইয়া যায়, যাহা হইতে মানুষ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ কঠোর শাস্তিভোগ করিয়াও মানুষ একই অপরাধ পুনঃ পুনঃ করে। এইজন্যই অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

অপরাধ ও শাস্তি

অপরাধের কারণ (Causes of Crime): অপরাধের কারণ সম্পর্কে কয়েক প্রকারের মতবাদ প্রচলিত আছে।

(১) অপরাধবিজ্ঞানীদের (Criminologists) মতে অন্যান্য ব্যাধির মত অপরাধও এক প্রকারের শারীরিক ব্যাধি, অর্থাৎ কোনপ্রকার শারীরিক বা মানসিক ত্রুটির ফলেই অপরাধ সংঘটিত হয়। এইরূপ শারীরিক বা মানসিক ত্রুটি জন্মগতও হইতে পারে, আবার সঙ্গদোষেও ঘটিতে পারে। কারণ, এই-সকল ব্যাধিও অন্যান্য সংক্রামক রোগের মত সংক্রামিত হয়। এইজন্য ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। সুচিকিৎসার দ্বারা এই-সকল ব্যাধি হইতে ব্যক্তিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও রক্ষা করিতে পারা যায়।

অপরাধ-বিজ্ঞানীদের মত

(২) আবার অপরাধ-সম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞানীদের (Criminal Sociologists) মতে অপরাধের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী সমাজব্যবস্থা। সমাজের মধ্যে দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ইত্যাদি আছে বলিয়াই লোকে অপরাধ করিতে বাধ্য হয়। অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট নয়। অভাবের দায়েই লোকে চুরি করে। কার্ল মার্কসও এই মতবাদের সমর্থক। তাঁহার মতে রাষ্ট্রীয় আইনকানুন পুঁজিপতিদের স্বার্থে রচিত হয়, যাহার ফলে পুঁজিপতিদের গৃহে ধন পুঞ্জীভূত হইয়া শ্রমিক-শ্রেণীকে ক্রমশঃই দরিদ্রতর করে। দরিদ্র-শ্রেণী তখন অভাবের দায়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সমাজব্যবস্থাই অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার কারণ। মার্কসের মতে সমাজে যদি

অপরাধ সম্পর্কীয় সমাজ-বিজ্ঞানীদের মত

ধনসম্পত্তি-সুবণ্টনের ব্যবস্থা থাকিত, তবে সামাজিক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইত না।

(৩) নৈরাশ্যও অপরাধ-সংঘটনের অন্যতম কারণ। যাহারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরাভূত হয়, সকলের কাছে অবহেলিত হয়, তাহারাই বেশী অপরাধ করে। অনেক মনস্তাত্ত্বিক নৈরাশ্যের ভাব হইতে অপরাধ সংঘটিত হইবার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেক সময় দেখা যায়, পিতৃ-মাতৃহীন সন্তানদের মধ্যে অন্যান্যদের কাছে অবহেলিত হইবার ফলে চুরি করিবার প্রবৃত্তি জাগে এবং যতই তাহার জন্য তাহারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়, ততই তাহাদের অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, শিশুরা এই-সকল বিকৃত উপায়ে তাহাদের প্রতি অন্যান্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নৈরাশ্যে বিশ্বাসীদের মত

(৪) ফ্রয়েডের মতে অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণ অবদমিত যৌন কামনা। যে-সমস্ত অবদমিত যৌন কামনা মনের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত থাকে, সেগুলি সহজ পথে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পাইয়া নানা প্রকারের সমাজ-বিরোধী কার্যের মাধ্যমে বিকৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়।

ফ্রয়েডের মত

(৫) কিন্তু এই-সকল কারণ ব্যতীত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার আরও একটি কারণ আছে। তাহা হইল ব্যক্তির অতিরিক্ত স্বার্থবোধ এবং সামাজিক চেতনার অভাব। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির কল্যাণ সম্পর্কে ব্যক্তি যদি কিছুমাত্র চিন্তা না করে, তাহার নিজস্ব স্বার্থচিন্তাই যদি তাহার কাছে প্রধান হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ করিবার প্রবণতা জাগ্রত হয়। স্বার্থচিন্তা হইতেই ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি, কালোবাজার ইত্যাদি অপরাধ করিয়া থাকে। ইহাতে যে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষতি হয়, তাহা তাহারা চিন্তাই করে না।

স্বার্থবোধ ও অপরাধ

যাহা হোউক, অপরাধ যে-কারণেই সংঘটিত হউক না কেন, সমাজের কল্যাণের জন্য ইহাকে সমূলে বিনাশ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ সমাজকে অপরাধমুক্ত করিবার জন্য শাস্তিবিধানই বিশেষ প্রচলিত।

৬। **শাস্তি (Punishment)ঃ** "Punishment is a means, by which Society controls the conduct of its members and is an expression of public indignation felt by a society."

—Wright

অর্থাৎ, শাস্তি হইল এমন একটি উপায়, যাহার দ্বারা সমাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অপরাধীর প্রতি সমাজের ঘৃণা-মিশ্রিত ক্রোধের প্রকাশ করে। ইহা কেবলমাত্র অপরাধীর উপর সমাজের প্রতিশোধ নহে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার উপায়-বিশেষ। এইজন্য রাষ্ট্রের যে-কোন আইন অমান্য করিলেই তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এ-সকল ক্ষেত্রে শাস্তিবিধান না করিলে দুর্নীতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে, রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে। সুতরাং রাষ্ট্র শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করে।

শাস্তির সংজ্ঞা ও ব্যাখা

কিন্তু শাস্তিবিধান করিবার পূর্বে রাষ্ট্রকে অপরাধীর বিচার করিয়া প্রকৃতই সে আইন অমান্য করিয়াছে কিনা, তাহা অন্বেষণ করিতে হয়। এই বিচারকার্যও আইন অনুসারে হইয়া থাকে। অন্যথায় ন্যায়বিচার হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য শাস্তির সহিত আইনের ও ন্যায়পরতার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে আইন কাহাকে বলে, আইনের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শাস্তি, আইন ও ন্যায়পরতা

৪। **আইনের সংজ্ঞা** (Definition of law): "Laws are the general regulations enacted and enforced by some constituted authority."—Maciver.

অর্থাৎ, আইন হইল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধিবদ্ধ বাধ্যতামূলক নিয়মাবলী। আইনের মধ্যে এমন একটা শক্তি বর্তমান, যাহা সকলের উপর প্রযোজ্য এবং সকলেই তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য। জনসাধারণ, পুলিশ, বিচারক সকলেই আইনের অধীন। যে আইন লঙ্ঘন করিবে, তাহাকেই শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

আইনের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

আদিম সমাজে কতকগুলি রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। এই রীতিনীতিগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে। সামাজিক প্রথা (custom) ও আইনের (law) মধ্যে পার্থক্য হইল—সামাজিক প্রথা অলিখিত নিয়ম, অধিকাংশ সময়ে তাহা সমাজের ব্যক্তিদের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে। আর, আইন হইল রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত লিখিত নিয়ম। উপরন্তু, সামাজিক

সামাজিক প্রথা ও আইন

সকল প্রথার মধ্যে একটা আদর্শগত মূল্য বর্তমান, যাহা রাষ্ট্রীয় সকল আইনের মধ্যে থাকে না। *

৫। **আইনের উৎপত্তি (Origin of law):** অতি প্রাচীনকালে আইন ও ন্যায়পরতা সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান বা ধারণা ছিল না। মানুষ তখন তাহার ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া স্বাধীনভাবে সকল কার্য সম্পাদন করিত।

পরবর্তী কালে গোষ্ঠীর (clan) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমাজের অনিষ্টকারীদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সে-সম্পর্কে চিন্তা করিতে লাগিল। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তির উপর যদি কেহ কোন অন্যায় আচরণ করিত, তাহাতে গোষ্ঠীর সকলেই ক্ষুব্ধ হইত এবং অন্যায় আচরণকারীর উপর প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিত। ইহার ফলে বিবাদ ও যুদ্ধ এবং বহুলোকের প্রাণহানি হইত। সেই সময় হইতেই মানুষ উপলব্ধি করিল যে, এইভাবে একজনের জন্য বহুলোকের প্রাণ নষ্ট করা অপেক্ষা অপরাধীর শাস্তিবিধানের একটা ব্যবস্থা করা উচিত এবং তখন হইতে শাস্তিবিধান প্রচলিত হইল।

প্রাচীন গোষ্ঠী ও আইন

কিন্তু তখন শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ লওয়া। এইজন্য যে যেরূপ অন্যায় করিত, তাহার উপর ঠিক সেইরূপ প্রতিশোধ লওয়া হইত। "An eye for aneye and a tooth for a tooth"—ইহাই ছিল তখনকার রীতি। অর্থাৎ, যদি কেহ কাহারও চক্ষু নষ্ট করে, তবে তাহারও চক্ষু নষ্ট করিয়া দিতে হইবে, কেহ কাহারও দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে তাহারও দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত। হামুরবির (Hamurabi) প্রাচীন আইনেও এইরূপ শাস্তিবিধানের উল্লেখ আছে।

প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা

পরবর্তী যুগে মানুষের ধারণা আরও উন্নত হইলে মানুষ প্রতিশোধ লওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ (compensation) দেওয়ার ব্যবস্থা করিল। মানুষ তখন উপলব্ধি করিল যে, প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অত্যন্ত অমানুষিক। তখন তাহারা অপরাধীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিল।

ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা

* পৃঃ ৬৭ দেখ।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা আরও সংশোধিত হয়। যাহার পক্ষে যতটা ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব, তাহার উপর ততটা ক্ষতিপূরণের দাবিই করা হইত। এতদ্ভিন্ন শিশু, স্ত্রীলোক ইত্যাদি অপরাধীর বিচার সহৃদয়তার সহিত করা হইত।

সংশোধিত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

আধুনিক যুগে আইনকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কলহ বা অন্য কোন অপরাধের বিচার দেওয়ানী আইনে হয় এবং তাহার ফলে অপরাধীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। আর সমাজবিরোধী কোন কার্য করিলে ফৌজদারী আইনে বিচার হয় এবং রাষ্ট্র অপরাধীর কঠোর শাস্তিবিধান করে।

আধুনিক ব্যবস্থা

উপসংহার: এইরূপে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। আইনের দ্বারা অপরাধীর বিচার না হইলে, বা অন্যায়কারীর বিচারের ভার ব্যক্তির উপর ছাড়িয়া দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য, ব্যক্তির আচরণকে সংযত করিবার জন্য আইন ও ন্যায়পরতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং আইনভঙ্গকারীদের শাস্তিবিধানেব ব্যবস্থা হইয়াছে।

৬। **শাস্তির উৎপত্তি (Origin of Punishment):** শাস্তিদানের প্রথা কেবল যে আইন-সৃষ্টির পরে হইয়াছে তাহা নহে, আইন-সৃষ্টির বহু পূর্বেও সমাজে অন্যায়কারীদেব প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক যে-কোন কার্যই সমাজের চক্ষে অপরাধ এবং সমাজ তাহার শাস্তিবিধান করে।

আদিম সমাজ ও শাস্তি

অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও এইরূপ শাস্তিদান-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আছে। তবে সম্প্রদায়ের যাহারা মোড়ল বা নেতৃস্থানীয় তাহারাই সাধারণতঃ শাস্তিপ্রদান করিয়া থাকে।

কাহারও কাহারও মতে শাস্তিদানব্যবস্থা মানুষের ক্রোধের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। আবার কেহ কেহ বলেন, সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই শাস্তিদান-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শাস্তির উদ্দেশ্য অন্যায়ের প্রতিরোধ করা, যাহাতে সমাজে আর কেহ এইরূপ অপরাধ না করে। কঠোর শাস্তিবিধানের দ্বারা অন্যান্যের মনে ভয়ের উদ্রেক করা হয়। ফলে তাহারা আর এইরূপ অপরাধ করিতে সাহস পায় না। কাজেই অপরাধ বন্ধ করাই মৃত্যুদণ্ডরূপ কঠোর শাস্তি-

শাস্তিবিধানের তাৎপর্য

দানের উদ্দেশ্য, প্রতিশোধ লওয়া বা ক্রোধের প্রকাশ করা শাস্তিদানের উদ্দেশ্য নহে। মৃত্যুদণ্ড এইজন্য খুব কম ক্ষেত্রেই দেওয়া হইয়া থাকে। তবে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত, যাহাতে সমাজে অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

৭। শাস্তিবিধানের বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of Punishment): কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, শাস্তি দিয়া অপরাধ বন্ধ করা যায় না। সুতরাং শাস্তিবিধান করিলেই সমাজের দুর্নীতি যে বন্ধ হইবে, তাহা মনে করা ভুল। এমন কি, যাহারা বহুবার শাস্তিভোগ করিয়াছে তাহারাই পুনঃ পুনঃ একই অপরাধ করিতে থাকে। এইজন্য কিরূপ শাস্তি দিলে লোকে পুনরায় সেই অপরাধ করিবে না এবং শাস্তির উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে অবগত হওয়া দরকার।

শাস্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে-বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলির মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—(ক) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Retributive Theory of Punishment), (খ) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ (Deterrent or Preventive Theory of Punishment) ও (গ) সংশোধনাত্মক মতবাদ (Reformative Theory of Punishment)।

(ক) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Retributive Theory of Punishment): এই মতবাদ অনুসারে শাস্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করা। যে-অপরাধী যেরূপ অন্যায় করিয়াছে, তাহার উপর অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। যে যেরূপ কর্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। এক কথায়, প্রতিশোধ লওয়াই এই শাস্তির উদ্দেশ্য। প্রাচীন সমাজে এই নীতি বিশেষ প্রচলিত ছিল। 'A tooth for a tooth, and an eye for an eye'—ইহাই ছিল তাহাদের শাস্তিদানের রীতি।

প্রাচীন যুগের প্রতিশোধমূলক শাস্তি

কিন্তু আধুনিক যুগেও এই নীতি অনুসারে শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে। তবে বর্তমানে এই শাস্তিবিধানের একমাত্র অধিকারী রাষ্ট্র। ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকটে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে বা বিচারপ্রার্থনা করিলে, রাষ্ট্র সমস্ত ব্যাপারটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া যে-শাস্তিবিধান করিবে, তাহাই সকলকে মানিয়া লইতে হইবে, এবং বর্তমান যুগেও প্রধানতঃ প্রতিশোধগ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই শাস্তিবিধান করা হইয়া থাকে।

আধুনিক যুগে প্রতিশোধমূলক শাস্তি

ইহার দুইটি বিভিন্ন রূপ আছে, যথা—

(১) **কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ** (**Rigoristic form of the Retributive Theory**) ও (২) **লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ** (Mollified form of the Retributive Theory) :

প্রথম মতানুসারে কঠোর অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্য কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ কি অবস্থায় পড়িয়া অপরাধী একজনের প্রাণসংহার করিয়াছে, তাহা বিচার না করিয়াই অপরাধীর প্রাণদণ্ডের বিধান দিতে হইবে। বিভিন্ন কারণে লোক গুরুতর অপরাধ করিতে পারে। যে অপরের সম্পত্তি হরণ করিবার জন্য একজন লোকের প্রাণসংহার করিয়াছে, তাহার অপরাধের গুরুত্ব, যে আত্মরক্ষার্থ প্রাণসংহার করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার অপরাধ অপেক্ষা বেশী। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার না করিয়া শাস্তি দিলে, তাহা ন্যায্য বিচার হয় না। কিন্তু কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুসারে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার না করিয়াই অপরাধের পরিমাণ-অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

কিন্তু লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুসারে এইরূপভাবে বিচার করিলে তাহা সুবিচার হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরাধ-সংঘটনের অন্যতম কারণ হইতে পারে। এইজন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কি অবস্থায় পড়িয়া ব্যক্তি অপরকে হত্যা করিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় কি ছিল, তাহার সেই সময়ের মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই ব্যক্তির প্রতি সুবিচার করা হইবে এবং অপরাধের প্রকৃতি-অনুযায়ী শাস্তিবিধানও করা যাইবে।

লঘু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

আধুনিক কালে এই নীতি অনুসারেই রাষ্ট্র শাস্তিবিধান করিয়া থাকে। বর্তমানে প্রতিশোধাত্মক মতবাদের কঠোরতা উঠিয়া গিয়াছে, বিচারক কেবল প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য শাস্তিবিধান করেন না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ব্যক্তির অভিপ্রায়, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি বিচার করিয়া তবে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

(খ) **প্রতিরোধাত্মক মতবাদ** (**Deterrent or Preventive Theory of Punishment**) : এই মতবাদ অনুসারে অপরাধীকে

শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য—জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া বা শিক্ষা দেওয়া।

জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্যই অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া দরকার; কারণ, অপরাধী যদি কঠিন শাস্তি না পায়, তাহা হইলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিও অনুরূপ অপরাধ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না এবং ক্রমে ক্রমে সমাজে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া নয়, অন্যান্য ব্যক্তিও যাহাতে এইরূপ অপরাধ আর না করে, তাহার ব্যবস্থা করা। যাহারা খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত করিয়া সমাজের প্রভূত ক্ষতি করে, তাহাদের একজনকে ধরিয়া যদি প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ব্যবসায়ীও ভীত হইবে এবং খাদ্যে ভেজাল দেওয়া বন্ধ করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণতঃ এই-সকল গুরুতর অপরাধী কঠোর শাস্তি পায় না বলিয়া খাদ্যে ভেজালের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্যই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে কঠোর শাস্তি দিয়া অন্যায়-প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রতিরোধাত্মক শাস্তি

সমালোচনা: প্রতিরোধাত্মক মতবাদ অনুসারে কঠোর শাস্তিবিধান করিলে অপরাধীর সংখ্যা যে হ্রাস পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(১) কিন্তু এই মতবাদে সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির মঙ্গলকে বিসর্জন দেওয়া হইতেছে। সমাজের মঙ্গল করাই এই মতবাদের উদ্দেশ্য এবং ইহা যে প্রকৃতই কল্যাণকর, তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু যে-ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, সমাজের মঙ্গলার্থ তাহার মঙ্গলের কথা চিন্তা করা হইতেছে না। একবার অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে বা লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, ইহা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

(২) এই মতবাদে অন্যান্যকে শিক্ষা দিবার জন্য অপরাধীকে যন্ত্ররূপে বা উপায়রূপে ব্যবহার করিয়া জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে, কিন্তু তাহাকে সংশোধিত হইবার কোন সুযোগ দেওয়া হইতেছে না।

(৩) প্রতিরোধাত্মক শাস্তির যূপকাষ্ঠে অপরাধীকে উৎসর্গ করিয়া সমাজের কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিকে উৎসর্গ করিয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করা সম্ভব নহে।

(৪) অপরাধীও সমাজের একজন ব্যক্তি, সেও সমাজের নিকট হইতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার দাবি করিতে পারে। কিন্তু সমাজ তাহাকে উদ্দেশ্য-রূপে ব্যবহার না করিয়া উপায়রূপে ব্যবহার করিতেছে। মানুষকে কেবলমাত্র উপায়রূপে ব্যবহার করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

(৫) শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক কোন ত্রুটি বা অভাববশতঃ বা অন্য কোন কারণে কেহ যদি কোন অন্যায় করিয়া থাকে, তাহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহাকে উৎসর্গ করিয়া অন্যান্যের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না।

উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে প্রতিবোধাত্মক মতবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায় না।

(গ) **সংশোধনাত্মক মতবাদ** (**Reformative Theory of Punishment**)ঃ এই মতবাদ অনুসারে শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অপরাধীব চরিত্রসংশোধন করা। ব্যক্তিকে উপায়রূপে গ্রহণ না করিয়া উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহার করাই এই মতবাদেব লক্ষ্য। সহানুভূতিশীল ব্যবহারের দ্বারা অপরাধীর চরিত্রসংশোধন করা সম্ভব। সুশিক্ষা অথবা সুচিকিৎসার মাধ্যমে বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া অপরাধীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারিলেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয়। সমাজে দুর্বল, রুগ্ন, বৃদ্ধ সকলেরই স্থান আছে। কেহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে সমাজ সুচিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার দ্বারা তাহাকে নিরাময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। অপরাধও এইরূপ একটি ব্যাধি-বিশেষ। সুচিকিৎসাব দ্বারা অপরাধীর সুস্থতা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা উচিত।

সংশোধনাত্মক ·বধান

মানুষ যেরূপ নানা কারণে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, অপরাধীও সেইরূপ বিভি কারণে অপরাধ করে। অপরাধের প্রকৃত কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া অপরাধীর সংশোধনাত্মক শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেকে সঙ্গদোষে পড়িয়া চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে বা অন্যান্য অন্যায় কার্য করে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া সহজেই ন্যায়পথে ফিরাইয়া আনা সম্ভব। আবার, অপরাধীকে তাহার অপরাধের জন্য দায়ী করা যায় না, সমাজ-ব্যবস্থাই তাহার জন্য দায়ী। ক্ষুধার জ্বালায় বা অভাবে পড়িয়া যদি কেহ

অপরাধের কারণ-বিশ্লেষণ ও সংশোধনাত্মক শাস্তি

চুরি করে, তাহার জন্য তাহাকে মোটেই দায়ী করা যায় না। অভাবে পড়িলে মহৎ ব্যক্তিও চুরি করিতে বাধ্য হয়।

উপরন্তু, কঠোর শাস্তি দিয়া ব্যক্তির জীবন নষ্ট না করিয়া বরং শিক্ষা বা চিকিৎসার দ্বারা তাহার স্বভাব পরিবর্তন করা উচিত। কঠোর শাস্তি দিয়া কাহারও মন পরিবর্তন করা যায় না এবং চিরকাল তাহাকে অপরাধী করিয়া রাখা হয়। শিক্ষার দ্বারা, সহানুভূতিশীল ব্যবহারের দ্বারা অতি সত্বর মানুষের মনের পরিবর্তন করা সম্ভব। আধুনিককালে এই মতবাদকেই অনেকে সমর্থন করেন।

উপসংহার: উপরি-উক্ত সকল মতবাদের সপক্ষে এবং বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করা যায়। কিন্তু অপরাধীর শাস্তিবিধান করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অপরাধের প্রকৃত কারণ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াই শাস্তিবিধান করা কর্তব্য। এইজন্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিশোধাত্মক, প্রতিরোধাত্মক ও সংশোধনাত্মক শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন একটি মতবাদকে সাধারণভাবে গ্রহণ করা যায় না। সকল ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণ করাও সম্ভবপর নহে। কঠোর অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি না দেওয়া হইলে সমাজে অপরাধীর সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। আবার, সকল অপরাধীকে সংশোধন করাও সম্ভবপর নহে। এইজন্য প্রতিরোধাত্মক শাস্তির ব্যবস্থাও করিতে হইবে। উপরন্তু, যদি কেহ অসদুদ্দেশ্যে কাহাকেও হত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধাত্মক শাস্তিবিধান করা দরকার হইয়া পড়ে। অন্যথায় সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং প্রতিটি অপরাধ স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে যে, অপরাধীকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া উচিত। অবস্থা অনুসারে শাস্তি লঘু-প্রতিশোধাত্মক, প্রতিরোধাত্মক অথবা সংশোধনাত্মক হইবে।

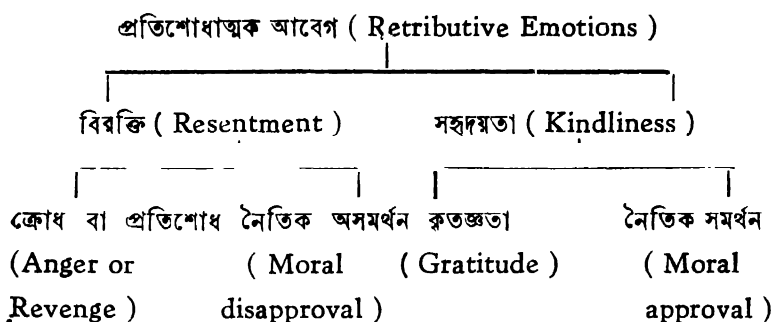
৮। শাস্তিদানের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (Psychological Explanation of Punishment): শাস্তিদানের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার মূলে রহিয়াছে মানুষের বিরক্তিবোধ (Resentment) এবং বিরক্তিবোধের উৎপত্তি হয় নৈতিক আবেগ বা উত্তেজনা (moral emotion) হইতে। নৈতিক উত্তেজনার প্রকাশ দুইপ্রকারে হইতে পারে—নৈতিক সমর্থন (moral approval) ও নৈতিক অসমর্থন (moral disapproval)।

শাস্তিবিধানের মূল কারণ

যে-কার্যে নৈতিক সমর্থন থাকে, সেই কার্য সম্পাদিত হইলে মানুষ আনন্দবোধ করে। যে-ব্যক্তি কার্যটি সম্পাদন করে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব জাগ্রত হয় ও তাহাকে পুরস্কৃত করিবার বাসনা উদিত হয়। অপরপক্ষে যে-কার্যে মানুষের নৈতিক সমর্থন থাকে না, সে-কার্য সম্পাদিত হইলে লোকের বিরক্তিভাব জাগ্রত হয় এবং শাস্তিদানই হইল এই বিরক্তি-ভাবের প্রকাশ।

প্রতিশোধাত্মক আবেগের শ্রেণীবিভাগ

ওয়েস্টারমার্ক (Westermarck) মানুষের মনের ক্রোধ, প্রতিশোধ-স্পৃহা, দয়া, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদিকে প্রতিশোধাত্মক আবেগের (Retributive emotions) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। নিম্নে ওয়েস্টারমার্ক-প্রদত্ত প্রতিশোধাত্মক আবেগের শ্রেণী-বিভাগ দেখানো হইল :



বিরক্তিভাব প্রকাশের উদ্দেশ্য—সমাজের অন্যায়-অবিচার বন্ধ করা এবং সহৃদয়তা-প্রকাশের উদ্দেশ্য হইল সমাজের যাহা কিছু কল্যাণকর ও আনন্দদায়ক, তাহা রক্ষা করা। উভয়প্রকার আবেগের প্রকাশই সমাজে প্রয়োজনীয়। বিরক্তিবোধ হইতে জাগে প্রতিশোধ-স্পৃহা, আর সহৃদয়তার ভাব হইতে কৃতজ্ঞতার উদয় হয়।

অপরপক্ষে নৈতিক সমর্থন বা অসমর্থনের ভাব প্রকাশিত হয় নৈতিক বিচারের মাধ্যমে। নৈতিক বিচার বলিতে অপক্ষপাতিত্ব ও নিঃস্বার্থপরতা বুঝায়। কারণ, যে-বিচারের সঙ্গে বিচারকের স্বার্থভাব জড়িত থাকে বা

নৈতিক বিচার

যেখানে পক্ষপাতিত্ব করা হয়, তাহাকে নৈতিক বিচার বলা যায় না। স্বার্থশূন্য ও পক্ষপাতহীন বিচারই প্রকৃত বিচার এবং যে-আবেগ হইতে নৈতিক বিচারের উদ্ভব হয়, তাহাও

স্বার্থশূন্য ও পক্ষপাতহীন আবেগ। সুতরাং নৈতিক আবেগের বৈশিষ্ট্যই হইল স্বার্থশূন্যতা (Disinterestedness), অপক্ষপাতিত্ব (Impartiality) ও সামান্যতা (Generality)। সামান্যতা বলিতে সৎকার্যে সকলের নৈতিক সমর্থন বা অসৎকার্যে নৈতিক অসমর্থন বুঝায়। যখন কোন কার্যকে ভাল বলিয়া প্রশংসা করা হয় বা মন্দ বলিয়া নিন্দা করা হয়, তখন তাহাকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতবাদ বলা যায় না। এইরূপ কার্য সকলের দ্বারাই প্রশংসিত অথবা নিন্দিত হইয়া সামান্যতা অর্জন করে।

যে-বিচারক নৈতিক আদর্শে প্রণোদিত, তিনি সর্বদাই নিঃস্বার্থ ও পক্ষপাতশূন্য হন এবং বন্ধু ও শত্রু সকলেরই সমান বিচার করিয়া থাকেন।

শাস্তি ও নৈতিক সমর্থন

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, শাস্তি হইল অন্যায় কার্যে মানুষের নৈতিক অসমর্থনের প্রকাশ। নৈতিক অসমর্থনের ভাব হইতে অপরাধীকে কষ্ট বা শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ের উদ্রেক হয়। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য, সামাজিক কল্যাণের জন্য অপরাধীকে শাস্তিদান মানুষের নৈতিক সমর্থন লাভ করে।

প্রতিশোধাত্মক শাস্তি ও নৈতিক অসমর্থন

নৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তিদানও সমর্থন করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ, প্রতিশোধাত্মক শাস্তির ব্যবস্থা আধুনিক যুগে অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমানে শাস্তিদানই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্যকে লাভ করিবার একটি উপায়মাত্র।

শাস্তিদানের উদ্দেশ্য

শাস্তিদানের উদ্দেশ্য—অপরাধীকে তাহার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করা, কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত করান। অপরাধী যখন অনুতপ্ত হয়, তখন তাহাকে শাস্তিদানের কোন প্রয়োজন হয় না। বিচারক ও জনসাধারণের বিরক্তিবোধও তখন দূরীভূত হয় এবং তাঁহারা অপরাধীকে ক্ষমা করেন। এইজন্য অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) বলিয়াছেন, জনসাধারণের বিরক্তিবোধের উদ্দেশ্য অপরাধীকে শাস্তিদান বা কষ্টদান নহে, তাহাকে তাহার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত করানই বিরক্তিবোধের উদ্দেশ্য। সুতরাং যে-নৈতিক আবেগ হইতে প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয়, তাহা হইতেই আবার অপরাধীকে সংশোধন করিবার, মার্জনা করিবার বাসনা উদিত হয়।

কিন্তু অন্যায় সংঘটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই মানুষের প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয় এবং শাস্তিদানের দ্বারা তাহারা এইরূপ অন্যায় কর্মের প্রতিবাদ জানায়। এইভাবে প্রথম আবেগ বা উত্তেজনার প্রকাশ হয়। এইরূপ প্রতিবাদ জানাইবার একটা উপকারিতা নিশ্চয়ই আছে। তবে সকল শাস্তির একটা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

উপসংহার: উপসংহারে ইহা বলা যায় যে, শাস্তি জনসাধারণের বিরক্তিবোধের ও নৈতিক অসমর্থনের প্রকাশ। যে-কার্য জনসাধারণের বিরক্তি বা ক্রোধ জাগ্রত করে, তাহার জন্য শাস্তিও তাহাদের ক্রোধের পরিমাণ অনুসারে দেওয়া হইয়া থাকে। সমাজের কল্যাণমূলক শাস্তিকে ন্যায়সঙ্গত বলা যাইতে পারে। এইজন্য শাস্তির উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ও শিক্ষামূলক হওয়া উচিত। অপরাধী যাহাতে অন্যায় সম্পর্কে সচেতন হয়, অনুতপ্ত হয়, তাহাও দেখা কর্তব্য।

৯। অপরাধ দূর করিবার উপায় (Real Cure for Crimes):

সমাজ হইতে অপরাধের পরিমাণ কমাইতে হইলে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন,—(১) মানুষের অবশ্য-প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব দূরীভূত করিতে পারিলে, বা সামাজিক অবস্থার উন্নতি হইলে অপরাধীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে।

(২) উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা মানসিক নৈরাশ্য দূর করিতে হইবে। উন্নত সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার ফলে মানুষের মন উন্নত হইলে অপরাধ-প্রবণতা হ্রাস পায়।

(৩) মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ অধিকতর জাগ্রত করিতে হইবে। ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারে যে, সমাজের কল্যাণ ও তাহার নিজস্ব কল্যাণ অভিন্ন, সমাজের ক্ষতিতে তাহার নিজেরই ক্ষতি হয়, তাহা হইলে অপরাধের প্রবণতা ধীরে ধীরে কমিয়া যাইবে।

(৪) এতদ্ব্যতীত ব্যক্তির মধ্যে সহানুভূতি, পরোপকার-প্রবৃত্তি ইত্যাদি জাগ্রত করিতে পারিলে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণসাধনে অগ্রণী হয়। নৈতিক শিক্ষার ফলে অপরাধের প্রবণতা কমিয়া যাইতে বাধ্য। কারণ, নৈতিক শিক্ষা আত্মোন্নতিসাধন করিয়া ব্যক্তিকে পরোপকারী ও সহানুভূতিশীল করে।

(৫) উত্তম পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াও মানুষের মনকে উন্নত করা যায়।

(৬) মানুষের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া, সুস্থ শরীরে সুস্থ মন গড়িয়া তুলিতে পারিলে অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে বাধ্য।

(৭) অপরাধী কি কারণে অপরাধ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া সেই কারণের মূল উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করা উচিত।

(৮) রাষ্ট্রের উচিত—সমাজে অপরাধ যাহাতে সংঘটিত না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। কেবল পুলিশী শাসনের দ্বারা প্রকৃত অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব নয়; সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ও উন্নত নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যতীত সমাজ হইতে অন্যায় বা অপরাধ কোনদিনই অপসারিত হইবে না।

সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি
(Social Evolution and Social Progress)

১। বিবর্তন কাহাকে বলে (What is Evolution) :

Evolution is "the development of growth, according to its inherent tendencies, of anything that may be compared to a living organism." অর্থাৎ বিবর্তন হইল অন্তর্নিহিত শক্তি বা প্রবণতা-অনুযায়ী কোন কিছুর ক্রমবিকাশ বা বৃদ্ধি, যে ক্রমবিকাশকে জীবের বৃদ্ধির সহিত তুলনা করা যায়। বিবর্তন বলিতে নূতন কিছু সৃষ্টি বুঝায় না, অবিকশিত ও অব্যক্ত শক্তির ক্রমবিকাশ বা প্রকাশকেই বিবর্তন বলা হয়।

বিবর্তনের সংজ্ঞা

'Evolution' শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে ল্যাটিন 'evolver' শব্দ হইতে, যাহার অর্থ হইল 'খুলিয়া দেওয়া' (unrolling)। প্রাচীন কালে রোমানরা ছাগ বা মেষ-চর্মের উপর পুস্তক রচনা করিত এবং এই-সকল পুস্তক কাষ্ঠ বা হস্তিদন্ত-নির্মিত দণ্ডের দ্বারা ম্যাপের মত গুটাইয়া রাখা হইত। পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে এই গুটানো পুস্তক খোলাকেই 'evolution' বলা হইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই শব্দটি ইংরাজীতে ব্যবহৃত হয় এবং ইতিহাসের গুটানো পৃষ্ঠা খোলাকেই (unrolling the scroll of history) 'evolution' আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং ভাঁজ-করা বা গুটানো বস্তুকে খুলিবার ধারণা হইতেই 'evolution'-এর ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। বর্তমানে 'evolution' বা বিবর্তন বলিতে বিকশিত হওয়া বা ব্যক্ত হওয়া বুঝায়।

'evolution' শব্দটির উৎপত্তি

১৭৬২ সালে বনেট (Bonnet) প্রথম শারীরিক বিবর্তনবাদের মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার পরে ডারউইন (Darwin) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বিবর্তনবাদীদের মতে জগৎ কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, আদিম যুগ হইতে ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে জগৎ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। গ্রহবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের এই পৃথিবী চিরকাল বর্তমান অবস্থায় ছিল না, একদিন ইহা তরল অগ্নিকুণ্ডের মত ছিল। কালক্রমে পরিবর্তিত হইতে হইতে ইহার উষ্ণতা হ্রাস পাওয়ার ফলে পৃথিবী

পৃথিবীর বিবর্তন

শীতল ও কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। জল, বাতাস ইত্যাদির উদ্ভব হওয়ায় পৃথিবী জীবের বাসের উপযোগী হইয়াছে। পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তিও নিম্নস্তরের জীব হইতেই ক্রমবিবর্তনের ফলে সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে এই মতবাদকে 'Theory of Preformation' বলা হয়।

২। **সমাজের বিবর্তন** (**Evolution of Society**)ঃ সমাজ-বিজ্ঞানীরা সমাজের ইতিহাসেও এই বিবর্তনবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমাজও এইরূপ ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তিত হইয়া বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয়, বিবর্তনের ফলে সমাজের উদ্ভব হয়। তাহার পর বহু পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজ অগ্রসর হইতে থাকে। সামাজিক বিবর্তনের শক্তি হইল সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি। কোন বাহ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমাজ বিবর্তিত হয় না এবং বিবর্তনের যাহা বৈশিষ্ট্য—সরল অবস্থা হইতে জটিলতার দিকে অগ্রসর হওয়া, তাহা সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেও বর্তমান।

সামাজিক বিবর্তনের বিশ্লেষণ

যে-সকল সমাজ-বিজ্ঞানী সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পেনসারের মতে বিশ্বের বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান—ঐক্যবিধান (Concentration or Integration), পৃথকীকরণ (Differentiation) ও নিয়মানুগত্য (Determination)। সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও তিনি এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (১) সমাজ একদিন অনির্দিষ্ট, অসংবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন পরিবার বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। বিবর্তনের ফলে এই-সকল বিচ্ছিন্ন পরিবার সুসংবদ্ধ হইয়া সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাই হইল সমাজ-বিবর্তনের প্রথম প্রক্রিয়া অর্থাৎ ঐক্যবিধান-প্রক্রিয়া। (২) ক্রমে ক্রমে শ্রমবিভাগের ফলে একই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়। ইহা অভিব্যক্তির দ্বিতীয় প্রক্রিয়া বা পৃথকীকরণ-প্রক্রিয়া। (৩) বিভিন্ন জাতি আবার ঐক্যবদ্ধ হইবার ফলে নানাপ্রকার সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব হয়। এই ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ-প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে। এইজন্য নিয়মানুগত্যকে অভিব্যক্তির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়।

স্পেনসারের মতবাদ

গিন্সবার্গ (Ginsberg) কিন্তু স্পেনসারের এই বিবর্তন-প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন যে, এই বিবর্তন-প্রক্রিয়া সর্বদা নূতন কিছু সৃষ্টি করে এবং এই সৃষ্টিকার্যের মধ্যেই সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা বর্তমান ("It is a process of change culminating in the production of something new, but exhibiting an orderly continuity in transition.")। তিনি আরও মনে করেন যে, সমাজের বিবর্তন—সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের বিবর্তন। মানুষের মধ্যে নূতন নূতন চিন্তাব উদ্ভবের ফলে সমাজেব বিবর্তন হইতেছে। সমাজের বিবর্তন-প্রক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে হওয়া সম্ভব নহে। ব্যক্তিরাই সমাজের বিবর্তনকে পবিচালিত করে। তবে ব্যক্তির চিন্তাধারার বিবর্তনকেও আবার সমাজই সম্ভব করিয়া তোলে। কারণ, ব্যক্তি সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিব চিন্তাধারা সামাজিক রীতিনীতিব উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে। এইজন্য গিন্সবার্গ বলিয়াছেন, ব্যক্তি যেমন সমাজ সৃষ্টি করে, সমাজও তেমনই ব্যক্তিকে গঠন করে ("But if individuals make society, it is equally true that society makes individuals.")। সুতরাং সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিরও বিবর্তন হইতে থাকে এবং সামাজিক বিবর্তন বলিতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই বিবর্তন বুঝায়।

গিন্সবার্গেব মত

৩। **সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি (Social Evolution and Social Progress) :** সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতিকে অনেক দার্শনিক অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সামাজিক বিবর্তন ও অগ্রগতিকে **অভিন্ন** মনে করা উচিত নহে। কারণ—

(১) বিবর্তন হইল, যাহা অব্যক্ত ও অবিকশিত ছিল, তাহা ব্যক্ত ও বিকশিত হওয়া, আর অগ্রগতি হইল আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া উন্নত হওয়া।

(২) বিবর্তন হওয়া বলিতে উন্নতি হওয়া বুঝায় না। বহুমুখী পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ বিবর্তিত হয়। অগ্রগতি এই-সকল বহুমুখী পরিবর্তনের একটা দিকমাত্র।

(৩) সমাজের প্রত্যেক নূতন রূপকে অগ্রগতি বলা যায় না। যেমন, আমাদেব দেশের জাতিভেদ-প্রথা সামাজিক বিবর্তনের একটা রূপ। জাতিভেদ-প্রথার সৃষ্টি হওয়াকে সামাজিক অগ্রগতির পরিচয় বলা যায় না।

কারণ, ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইজন্য হব্‌হাউস বলিয়াছেন যে, সামাজিক বিবর্তন সমাজের উন্নতিকে প্রমাণ করে না। ("the fact that society has evolved is no proof that it has progressed.")। সুতরাং বিবর্তন ও অগ্রগতি এক কথা নয়।

(৪) অগ্রগতির মধ্যে একটা নৈতিক আদর্শ বর্তমান, বিবর্তন কিন্তু কোন আদর্শ অনুসারে ঘটে না। আদর্শের দিকে অগ্রসর হইলে বা অগ্রসর হইবার জন্য সচেষ্ট হইলে সামাজিক অগ্রগতি হইতেছে বলা যায়।

অগ্রগতি সম্পর্কে আবার বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে ব্যক্তির অগ্রগতির লক্ষ্য—ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন এবং সামাজিক অগ্রগতিব আদর্শ—এমন সমাজ-গঠন, যাহা ব্যক্তির বিকাশসাধনে সহায়তা করে। কিন্তু আদর্শের এই সকল ব্যাখ্যাকে বাস্তব রূপদান করা সহজ নহে। তথাপি আদর্শে পৌঁছানো বা আদর্শলাভ করাটাই বড কথা নয়, আদর্শের জন্য চেষ্টা করাই সমাজের অগ্রগতি সূচনা করে। আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করা কখনও সম্ভব নহে। কারণ, সমাজের যত উন্নতি হয়, আদর্শের স্বরূপও ততই উন্নত হইতে থাকে। আমাদের বর্তমান সমাজের আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধন, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এক কথায়, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কবা ও সত্যম্‌-শিবম্‌-সুন্দরমের আদর্শকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই হইল সমাজের সর্বোচ্চ আদর্শ।

অগ্রগতির স্বরূপ

সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও উহারা সম্পর্কহীন নহে। কারণ, সমাজের অগ্রগতিও একপ্রকার বিবর্তন এবং সামাজিক বিবর্তন সামাজিক অগ্রগতিকে সহায়তা করে।

৪। সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড (Criteria of Social Progress):

সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড কি, অর্থাৎ সামাজিক অগ্রগতি কি উপায়ে নিরূপণ করা সম্ভব, সেই সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা বহু আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ব্ল্যাকমার (Blackmar) ও গিলিন (Gillin) প্রদত্ত মানদণ্ডের তালিকাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের মতে পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত কয়েকটি বিষয়ে সমাজের অগ্রগতি হইলে তাহাকে উন্নত সমাজ বলা যায়:

(১) সমাজের সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা (Closer integrity of society), (২) সমাজের কাঠামো ও কার্যাবলীর পৃথকী-করণ (differentiation of social structure and functions), (৩) সমাজের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে গ্রন্থিযুক্ত বা সংযুক্তকরা (closer articulation of parts), (৪) পরবর্তী প্রত্যেকটি বংশধরের জন্য উন্নততর জীবনধারণের ব্যবস্থাপন (better conditions of life for each succeeding generation), (৫) বংশ ও জাতির উন্নতিসাধন (improvement of race and stock), (৬) সুযোগ-সুবিধার সমব্যবস্থা অর্থাৎ সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা (equalisation of opportunity), (৭) প্রত্যেকের উপকারার্থ অধিকতর ধনসম্পদের বিনিয়োগ (increased service of wealth in the interest of all), (৮) প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির জন্য সামাজিক নির্দেশ (Social direction of society in the interest of the individual) এবং (৯) প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ (control over the force of nature)।

উন্নত সমাজের মানদণ্ড

এই-সকল বিষয়ে উন্নতিকে ব্ল্যাকমার ও গিলিন সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই তালিকার কতকগুলি বিষয় সঠিক হইলেও, সবগুলিকে সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয় একেবারে অস্পষ্ট আর কতকগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না, কতকগুলি বিষয়কে আংশিক সত্য বলা যায়; যেমন,—প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মানুষের উপকারও করা যাইতে পারে, আবার অপকারও, এমন কি, ধ্বংসসাধনও করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই যে সমাজের কল্যাণ হইবে, তাহা বলা যায় না।

সমালোচনা

৫। সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন দিক (Different Aspects of Social Progress) : সামাজিক অগ্রগতির মূল্যনিরূপণ করিতে গিয়া গ্রীন (Green) ইহার দুইটি বিভিন্ন দিকের কথা বলিয়াছেন—(১) ব্যাপকতার দিক ও (২) গভীরতার দিক।

(ক) ব্যাপকতার দিক (Extensive Aspect) : সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপকতার দিক বলিতে সর্বসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বুঝায়।

পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ যখন ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহার লক্ষ্য থাকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধন করা। সর্বসাধারণের কল্যাণকে উপেক্ষা করিয়া কোন বিশেষ গোষ্ঠীর উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে সামাজিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে, সংকীর্ণ আকার ধারণ করিবে।

সমগ্র মানবের কল্যাণই ব্যাপকতার দিক

এইজন্য প্রত্যেক সমাজেরই উচিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল গোষ্ঠীর উন্নতিবিধান করিয়া তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন করা, বিরোধ ও বিভিন্নতা দূর করা। তাহা হইলেই সমাজের সকলের কল্যাণ সাধিত হইবে এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইবে। মানুষ নিজেকে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না করিয়া বৃহত্তর মানবজাতির একজন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং মানব-সমাজের বৃহত্তর কল্যাণলাভের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করিবে।

সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপকতার ঐতিহাসিক প্রমাণঃ (Historical Evidences of the Extensive Aspect of Social Progress):

সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপকতা যে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) অতি প্রাচীনকালে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর (clan or tribe) অন্তর্ভুক্ত হইয়া বসবাস করিত। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকিত এবং গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য সকল ব্যক্তি সচেষ্ট হইত। প্রয়োজন হইলে একটি সামাজিক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও দ্বিধাবোধ করিত না।

(২) কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার ফলে জাতি বা বৃহত্তর গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে সাধারণ কল্যাণের সীমা আরও বিস্তৃত আকার ধারণ করে ও মানুষের সামাজিক চেতনাবোধ গভীরতর হয়।

(৩) তবে বিভিন্ন জাতির সামাজিক চেতনাবোধের ব্যাপকতা সীমাহীন নহে। বর্তমানে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণামের কথা আধুনিক যুগে কাহারও অবিদিত নাই।

(৪) ফলে মানুষ বর্তমানে এই জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডি ভাঙিয়া দিয়া সমগ্র মানবজাতির সহিত মিলিত হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানুষ সেই স্তরে উঠিতে এখনও সক্ষম হয় নাই।

(৫) অবশ্য, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এইরূপ বৃহত্তর ঐক্যলাভের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা U. N. O. (United Nations Organisation) নামক যে-আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ভাঙিয়া দিয়া আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতখানি সফলতা অর্জন করিতে পারিবে, তাহা বলা যায় না, তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হইবার জন্য সমাজ চেষ্টা করিতেছে।

সুতরাং সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপকতার দিকে তিনটি প্রধান স্তর লক্ষ্য করা যায়—উপজাতীয় (tribal), জাতীয় (national) ও আন্তর্জাতিক (international)। এগুলি সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর। তবে সমাজ যখন উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, তখন নিম্নতর স্তর সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় না, উচ্চতর স্তরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিরাজ করে এবং নিম্নস্তরই বিস্তৃত হইয়া উচ্চতর স্তর গঠন করে। নূতন পুরাতন সমস্ত রীতিনীতিকে ধ্বংস করিলে সমাজের সমধিক ক্ষতিসাধন করা হয়, তাহাদের সংরক্ষণের দ্বারাই সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

ব্যাপকতার বিভিন্ন স্তর

সমাজের বৃহত্তর কল্যাণলাভের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করিয়া মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করাই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

(খ) গভীরতার দিক (Intensive Aspect) : সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক পরস্পরবিচ্ছিন্ন নহে, উহারা একে অপরের পরিপূরক।

সমাজ যখন গোষ্ঠী বা উপজাতির স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক

স্তরের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ যতই বিস্তৃত হইতে থাকে, ততই গভীরতাও অর্জন করে। উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইলে ব্যক্তিরা তখন গভীরতর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয়।

সামাজিক চেতনা-বোধের গভীরতা

সুতরাং সামাজিক চেতনাবোধের ব্যাপকতা ব্যক্তি-মনের গভীরতার উপর নির্ভরশীল। কারণ, সামাজিক চেতনাবোধ যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। সমাজদর্শনের উদ্দেশ্য—সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিবার উপায় নির্দেশ করা।

(১) সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সৃষ্টি ও রক্ষার দ্বারা সামাজিক চেতনাবোধ গভীরতর হয়।

(২) নাগরিকদিগের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের মাধ্যমে সামাজিক চেতনা-বোধের গভীরতার প্রকাশ হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে-সকল নিয়ম বা আইনকানুন প্রণীত হয়, তাহার দ্বারাও সামাজিক চেতনাবোধের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

(৩) কিন্তু এই-সকল আইনকানুন যাহাতে নাগরিকদিগের সাধারণ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ না করে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, তাহাতে সামাজিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৪) আইনের ভাষার উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য না দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাব বা উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

ব্যক্তির স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ যখন অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, তখনই সমাজের অগ্রগতি দ্রুত হয়। সুতরাং সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপকতা ও গভীরতা উভয় দিকই সমান প্রয়োজনীয়।

এই উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়া কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।

৬। সামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়া (The Process of Social Progress) : সমাজের উন্নতি করিতে হইলে প্রকৃতির ও পরিবেশের নিম্নস্তরকে উচ্চস্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

এই নিয়ন্ত্রণ তিনপ্রকারের হইতে পারে : (ক) **মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ, (খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও (গ) আত্মনিয়ন্ত্রণ।**

(ক) মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ (Control of Natural Forces by Human Agency) : সমাজের উন্নতি করিতে হইলে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের আয়ত্তে আনিয়া প্রকৃতিকে নিজেদের সুবিধামত নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশগুলি এই বিষয়ের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিকে আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া মানুষের ও সমাজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতেছে। রেলগাড়ি, এরোপ্লেন, জাহাজ, বিদ্যুৎ, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি নির্মাণ ও আবিষ্কার করিয়া মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে বহুল পরিমাণে নিজ আয়ত্তে আনিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই-সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ ভুল পথে পরিচালিত করিতেছে। মানুষের যে-গবেষণার দ্বারা জগতের প্রভূত কল্যাণসাধন করা যাইত, তাহার দ্বারা এখন জগতের ধ্বংসের আয়োজন হইতেছে। সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব করিতে হইলে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কার্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। এইজন্য আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা, পরস্পরের মধ্যে একটা সহানুভূতিশীল বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন। মানুষের বিচারবুদ্ধি ও নৈতিক বোধ আরও জাগ্রত করা দরকার। তাহা হইলেই মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারিবে।

সমাজের কল্যাণের জন্য প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ

(খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) : সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে সমাজের অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনাকে বুঝায়। কারণ, সমাজের উন্নতি এই-সকল প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সমাজে সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা থাকিলে তাহা জাতির বা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরেই সামাজিক উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও আদর্শ ব্যক্তি গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। সামাজিক অগ্রগতির জন্য এই-সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হওয়া একান্তই প্রয়োজন। সুতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠান-গুলি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে সেগুলি ব্যক্তির উন্নতি ও আত্মোপলব্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে।

অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনা

(গ) **আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-control)ঃ** মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত করাকেই আত্মনিয়ন্ত্রণ বলা হয়। আত্মার উন্নতিই সর্বোচ্চ উন্নতি। জীবনের উদ্দেশ্য আত্মাকে বিকশিত করা। সমাজের উন্নতি প্রধানতঃ ব্যক্তির উন্নতির উপর নির্ভরশীল।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক অগ্রগতি

সুতরাং সামাজিক অগ্রগতির জন্য ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্রগঠন করিয়া, ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে হইবে। ব্যক্তিকে সামাজিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। ব্যক্তি আপনাকে ও প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সামাজিক শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে, যাহাতে সামাজিক আদর্শকে লাভ করা সহজ হয় এবং সামাজিক অগ্রগতি দ্রুত হয়। আত্মোপলব্ধিই মানুষের জীবনের চরম আদর্শ। বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতা-উপলব্ধি ভিন্ন আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় দমন করিয়া, কামনা-বাসনা জয় করিয়া বিশ্বজগতের কল্যাণকে আপন কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

৭। **সামাজিক অগ্রগতিতে বাধা (Hindrances to Social Progress)ঃ** মানুষের জীবন গতিময় ও নিয়ত-পরিবর্তনশীল। সমাজও এইরূপ ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সমাজের এই গতি যাহাতে লক্ষ্য বা আদর্শের পথে অগ্রসর হয়, সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। সামাজিক অগ্রতির পথে অনেক বাধাবিঘ্ন বর্তমান।

(১) মানুষের কুসংস্কার, অনুন্নত চিন্তাধারা সমাজের উন্নতির অন্যতম বিঘ্ন।

(২) মানুষের জ্ঞানকে কার্যে প্রয়োগ বা ব্যবহার করিতে অসমর্থ হওয়া এবং গঠনমূলক চিন্তাধারার অভাবও সামাজিক অগ্রগতিতে বাধাসৃষ্টি করে।

(৩) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে সামাজিক সমস্যা-সমাধানে নিয়োগ করিবার অকৃতকার্যতাও সামাজিক অগ্রতিতে বাধাসৃষ্টি করে।

(৪) প্রাচীন রীতিনীতি ও চিন্তাধারা সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম অন্তরায়।

(৫) স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী ব্যক্তিদের অন্যায় উপায়ে সুবিধা-গ্রহণের চেষ্টার দ্বারাও সমাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৬) উপযুক্ত নেতা বা পরিচালকের অভাবও সামাজিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে।

(৭) মানুষের অজ্ঞতা সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম অন্তরায়রূপে গণ্য হয়।

(৮) জনকল্যাণমূলক গুণের অভাবও সামাজিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

৮। **সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক (Aids to Social Progress):** সামাজিক অগ্রগতির এই সকল বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে সমাজের অগ্রগতির পথ কখনও রুদ্ধ থাকিতে পারে না। সমাজ ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তবে সামাজিক অগ্রগতিকে দ্রুত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্রুত উন্নতিসাধন করিতে পারিলে সামাজিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হইবে।

(১) নূতন নূতন আবিষ্কার সামাজিক অগ্রগতির প্রধান সহায়ক। (২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ সমাজকে দ্রুত উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে পারে। (৩) সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়তা করিতে হইলে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির গভীর আলোচনা এবং উন্নতিসাধন একান্ত প্রয়োজন। (৪) কতকগুলি অবশ্য-প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন-সাধনের জন্য জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করাও সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য দরকার। (৫) সামাজিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে সমাজের সকল নাগরিকের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। (৬) উপযুক্ত নায়কের প্রয়োজনীয়তার কথা বলাই বাহুল্য। কারণ, উপযুক্ত নায়ক ভিন্ন সমাজের অগ্রগতি হওয়া অসম্ভব। (৭)সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য সুপরিকল্পনা গঠন ও তাহা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম সহায়ক। (৮) এতদ্ব্যতীত সমাজদর্শনের শিক্ষাও সমাজের উন্নতিতে কম সহায়তা করে না। সমাজের মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ নিরূপণ করিয়া তাহার দিকে সমাজকে পরিচালিত করিতে হইলে সমাজদর্শনের আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। (৯) সর্বশেষে সুশাসনের ব্যবস্থার দ্বারাই সমাজ প্রকৃতপক্ষে আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। শাসনব্যবস্থা সুপরিচালিত না হইলে সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। সমাজের কার্যাবলীর সুনিয়ন্ত্রণ এবং

আদর্শকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমাজে সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

(ক) সমাজশাসন কি (What is Social Control): সমাজের স্বীকৃত আদর্শ বা নিয়মাবলীকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাব-বিস্তার বা শাসনকে সমাজশাসন বলা হয়।

সমাজশাসন দুই প্রকারে করা যাইতে পারে—প্রত্যক্ষ উপায়ে ও অপ্রত্যক্ষ উপায়ে। প্রকৃত সৎকার্যে, জনকল্যাণকর কার্যে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়া প্রত্যক্ষভাবে সমাজশাসন করা সম্ভবপর। আবার কঠোর আইন-প্রণয়নের সাহায্যে সমাজবিরোধী কার্যে জনসাধারণকে বাধাদানের দ্বারাও পরোক্ষ উপায়ে সমাজশাসন করা যায়।

(খ) সমাজশাসনের উপায় (Means of Social Control):

সমাজশাসন বিভিন্ন উপায়ে করা যাইতে পারে। নিম্নে সমাজশাসনের কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ করা হইল: (১) নৈতিক রীতিনীতির প্রচার, (২) বলপ্রয়োগ, (৩) ভীতি-প্রদর্শন, (৪) সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারকার্য, (৫) পুরস্কার-বিতরণ, (৬) সংযম-শিক্ষা, (৭) আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া প্রভৃতি ও (৮) সুশিক্ষা। এই-সব ব্যবস্থার দ্বারা সমাজশাসন করা সম্ভবপর।

৯। বর্তমান যুগে সমাজের অগ্রগতি (Social Progress at present):

সামাজিক অগ্রগতির পথে বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই। ইহা ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

অগ্রগতি বলিতে আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়া বুঝায়। আদিম যুগ হইতে সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আদিম সমাজের তুলনায় বর্তমান সমাজের বহু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। যে-সকল বিষয়ে সমাজের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলির কথা নিম্নে আলোচিত হইল:

(১) বর্তমান যুগে মানুষের জীবনের ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত। আধুনিক যুগে মানুষ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না, সমগ্র জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থা ও বর্তমানে মানুষের পরিপূর্ণ জীবনযাপনের ব্যবস্থা হইতে সামাজিক অগ্রগতির পরিচয় প্রাপ্ত করা যায়।

(২) শিশুদের প্রতি অধিকতর যত্ন ও তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আধুনিক সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম পরিচায়ক। বর্তমানে শিশুমৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

(৩) দুর্বল ও রুগ্ন ব্যক্তিদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থাও সামাজিক অগ্রগতির পরিচয় দেয়।

(৪) বর্তমানে সকলে যাহাতে প্রয়োজনীয় অবসর সময় বা অবকাশ পায়, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকদেরও শ্রমের পরিমাণ কমাইয়া বিশ্রামের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা সেই সময় আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়াকলাপে অংশ গ্রহণ করিয়া জীবনকে আনন্দময় করিতে পারে।

(৫) শ্রমিকদের গুরুতর পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি-দানও সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন।

(৬) জনসাধারণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইতেও বর্তমান সমাজের অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়।

(৭) বর্তমানে কোন নাগরিক যাহাতে শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এইরূপ শিক্ষার প্রসার ও জনসাধারণের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ও কল্যাণের আয়োজনও বর্তমান সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম নিদর্শন।

যদিও বর্তমানে সামাজিক অগ্রগতিকে সম্পূর্ণ লাভ করা সম্ভব হয় নাই, তথাপি সমাজ অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সমাজের আরও বহু শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে ও সমাজ উন্নততর হইবে।

সামাজিক সত্তা ও জাতিগত নীতিতত্ত্ব
(The Social Self and the Ethos of a People)

সামাজিক সত্তা (The Social Self): সমাজের সকল ব্যক্তির সহিত একাত্মতা-বোধকেই সামাজিক আত্মা বা সামাজিক সত্তা বলা যাইতে পারে। সামাজিক সত্তাই মানুষের প্রকৃত সত্তা। কারণ, মানুষ বিচার-বুদ্ধিশীল সামাজিক জীব। সমাজ-বহির্ভূত কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণাও করা যায় না। অ্যারিস্টটল এইজন্য বলিয়াছেন, যে সমাজে বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, সে হয় পশু না হয় দেবতা ("either a beast or a god")। এইরূপ ব্যক্তির কোন আদর্শ সত্তা থাকিতে পারে না। কারণ, হয় পশুর মত তাহার জীবনেব কোন আদর্শ নাই, অথবা তাহার আদর্শের সঙ্গে মানুষের জীবনের আদর্শের কোন সাদৃশ্য নাই। হয়ত তাহার আদর্শ দেবতার আদর্শের অনুরূপ। সমাজের মধ্যেই মানুষ তাহার প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করে বা সকলের সহিত একাত্মতা অনুভব করে। এই সামাজিক সত্তাকেই মানুষের আদর্শ সত্তা বলা হইয়া থাকে।

সামাজিক সত্তাই প্রকৃত সত্তা

আদর্শকে জীবনে লাভ করিতে সমাজের প্রয়োজন, সমাজ ব্যতীত আদর্শকে লাভ করা অসম্ভব। সমাজই ব্যক্তিকে গঠন করে, সমাজের দ্বারাই ব্যক্তির আদর্শ নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের রীতিনীতিই মানুষের আদর্শকে গঠন করে। এইজন্য ম্যাকেঞ্জি বলিয়াছেন যে, এমন কি, অ্যারিস্টটল অপেক্ষাও অধিকতর অগ্রসর হইয়া আমাদের বলা উচিত যে, দেবতাদেরও সামাজিক হইতে হইবে। ("Hence we must go even beyond the saying of Aristotle, and say that even a god must be social")। সুতরাং মানুষকে আদর্শ জীবনযাপন করিতে হইলে তাহার সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

সামাজিক সত্তার গুরুত্ব

মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা তাহার ক্ষুদ্র সত্তা, আর সামাজিক সত্তা হইল বৃহত্তর সত্তা। এই বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করাই মানুষের জীবনের আদর্শ। সামাজিক চেতনাকে বিসর্জন দিয়া স্বার্থচিন্তাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিলে নিজেকেই ধ্বংস

স্বতন্ত্র সত্তা ও সামাজিক সত্তা

করা হয়। কারণ, সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অপরের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই উচিত পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

কিন্তু সেইজন্য কাহারও ব্যক্তিগত সত্তাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া উচিত হইবে না। আপন আত্মার উন্নতিই সকলের জীবনের লক্ষ্য, ইহাকে লাভ করিবার জন্যই ব্যক্তিকে সামাজিক চেতনাসম্পন্ন হইতে হইবে। আপন উন্নতির চিন্তা বিসর্জন দিয়া সর্বদাই পরের মঙ্গল চিন্তা করিবার কথা এইখানে বলা হইতেছে না। নিজে উন্নত না হইলে অপরের কল্যাণ কিরূপে সাধন করিবে? ইহা ব্যতীত সর্বদা পরোপকার করিতে গেলে পরের উন্নতিতে বাধা দেওয়া হয়। সুতরাং, আপন ক্ষুদ্র সত্তা ও বৃহত্তর সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা একান্ত প্রয়োজন।

উভয় সত্তাব সামঞ্জস্যবিধান

মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য বা আদর্শ হইল আত্মোপলব্ধি (self-realisation)। সামাজিক সত্তার উপলব্ধি ও আত্মোপলব্ধি এক ও অভিন্ন। সামাজিক সত্তার উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন হইলে মানুষের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে। স্বার্থত্যাগের দ্বারাই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হয়। তবে আপন আত্মার উন্নতিসাধনের চেষ্টাকে স্বার্থপরতা বলা যায় না। কারণ উন্নতির দ্বারাই বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। আত্মোন্নতির ফলে মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তা নষ্ট হইয়া যায়, সকলের আত্মার সহিত মানুষ একাত্মতা উপলব্ধি করিতে পারে। ব্যক্তির নিজস্ব ও সামাজিক উভয় সত্তাই সমান গুরুত্বপূর্ণ, উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা ব্যক্তি সমাজের সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া দেখিতে পারে।

সামাজিক সত্তার উপলব্ধিই জীবনের আদর্শ

যেদিন মানুষ জাতিতে জাতিতে সমস্ত বিরোধ ভুলিয়া গিয়া বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারিবে, সেইদিন তাহার সামাজিক সত্তা পরিপূর্ণ বিকশিত হইবে, সেইদিনই ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি সম্পূর্ণ হইবে।

সামাজিক সত্তার বিকাশ

সামাজিক সত্তার বিকাশের উপায়ঃ সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি করিতে হইলে বা তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে (১) ব্যক্তির

সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিতে হইবে। (২) দেশপ্রেম, সমাজসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে অপরের সহিত আপন আত্মার একত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে সামাজিক সত্তার বিকাশ সম্ভবপর হয়। (৩) সর্বভূতে সমদর্শন হইলেই আত্মোপলব্ধি হয়। সুতরাং সকলের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান —এই বোধ জাগ্রত করিতে পারিলেই সামাজিক সত্তা বিকশিত হইবে। (৪) পরিবার, রাষ্ট্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন করিয়া তাহার সামাজিক সত্তার উন্মেষ করা যায়। (৫) আপন কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণ এক ও অভিন্ন এবং পরস্পর নির্ভরশীল বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃত কল্যাণ হয়। এই বিষয়ে ব্যক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে সে তাহার প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারে।

এইভাবে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিলেই সামাজিক আদর্শ লাভ করা সম্ভব হইবে।

২। জাতিগত নীতিতত্ত্ব (The Ethos of a People) ঃ

গ্রীক 'Ethos' শব্দটির মূল অর্থ হইল চরিত্র। ব্যক্তির প্রকৃতি ও মানসিক প্রবণতাকেই 'Ethos' বলা হইত। অ্যারিস্টটলও এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে নাটকের মধ্যে চরিত্রের সেই উপাদানকে 'Ethos' বলা হয়, যাহা ব্যক্তির চিন্তার পরিবর্তে ব্যক্তির কার্যকে নির্ধারণ করে। এইজন্য অ্যারিস্টটল পলিগনেটাসকে (Polygnetus) শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কারণ, তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে ব্যক্তির চরিত্র প্রস্ফুটিত। কিন্তু তিনি আবার বলিয়াছেন যে, চিত্রশিল্পীরা ব্যক্তির বাস্তব চরিত্র অপেক্ষা তাহাকে মহত্তর করিয়া সৃষ্টি করে। এই কারণেই আধুনিক যুগে কোন কোন পণ্ডিত 'Ethos' বলিতে 'সর্বোচ্চ উৎকর্ষ' বুঝাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'Ethos'-এর আরও অনেক অর্থ বা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পূর্বে সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'Ethos' বলিতে মনোবল অথবা চরিত্রবল বুঝাইত। পরবর্তী যুগে নৈতিক অথবা সদ্‌বুদ্ধির সৌন্দর্যকে এবং বর্তমানে কলা এবং চরিত্রের আদর্শ উপাদানকে 'Ethos' বলা হয়। আধুনিক যুগে কেহ কেহ 'Ethos' বলিতে কোন জাতির বিশিষ্ট সমাজের নৈতিক পরিবেশ বা তাহার নীতিতত্ত্বকেও বুঝাইয়াছেন।

'Ethos' শব্দের তাৎপর্য

কিন্তু সমাজের নৈতিক পরিবেশ বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেক জাতির ও তাহার সমাজের কতকগুলি নিজস্ব ভাবধারা, রীতিনীতি, আদর্শ, প্রচলিত নৈতিক মতামত ইত্যাদি বর্তমান। সমাজের ব্যক্তিরা এই-সকল রীতিনীতি, আদর্শ ইত্যাদির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। ইহাই সমাজের নৈতিক পরিবেশ বা নীতিতত্ত্ব।

নৈতিক পরিবেশ কি

এক দেশের নৈতিক পরিবেশের সহিত অন্য দেশের নৈতিক পরিবেশের কোন মিল বা সাদৃশ্য না থাকিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজই আশা করে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা তাহার নির্দিষ্ট নৈতিক পরিবেশ মানিয়া চলিবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা এই পরিবেশের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যে-সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, সেই সমাজের ভাবধারা আমাদের মজ্জাগত হইয়া যায়, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। সমাজের এই নিজস্ব ভাবধারা, রীতিনীতি, আদর্শ ইত্যাদিকে ইংরাজীতে Ethos বা নীতিতত্ত্ব বলে।

নীতিতত্ত্বের প্রভাব

এই নীতিতত্ত্বকে কেহ অতিক্রম করিলে বা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে সমাজে সে নিন্দনীয় হয়। আর, যাহারা ইহাকে মানিয়া চলে, সমাজের চক্ষে তাহারাই প্রশংসনীয়। যে হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, হিন্দুসমাজের ভাবধারা তাহার মজ্জাগত হইয়া যায়। যে মুসলমান-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মুসলমান-সমাজের ভাবধারার দ্বারা সে অনুপ্রাণিত হয়। এইরূপ খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। হিন্দুদের পক্ষে গো-মাংস ভক্ষণ করা মহাপাপ। যাহারা এই নীতিকে অমান্য করিয়া গো-মাংস ভক্ষণ করে, তাহারাও সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত হইয়া তাহা করিতে পারে না। মনে মনে এই সংস্কার তাহাদের পীড়া দেয়। কারণ, সমাজের নিজস্ব ভাবধারা সংস্কাররূপে মানুষের মনে গাঁথা হইয়া থাকে।

নীতিতত্ত্ব ও সমাজ

তবে এই-সকল ভাবধারা যে চিরকাল একইরূপ থাকে বা ইহার কোন পরিবর্তন হয় না, তাহা নহে। ইহারাও পরিবর্তনশীল, কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা যেরূপ পরিবর্তিত হয়, সেইরূপ সমাজের নীতিতত্ত্বও পরিবর্তিত হইতে থাকে। তবে এই পরিবর্তনের গতি খুব দ্রুত নয়। ধীরে ধীরে এই

নীতিতত্ত্ব পরিবর্তনশীল

পরিবর্তন সাধিত হয়। কোন কোন সমাজ-সংস্কারকের দ্বারা সমাজের নৈতিক পরিবেশের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু প্রথম প্রথম এই বিশিষ্ট সমাজগত নীতিতত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া সমাজ-সংস্কারকদের সমাজে নিন্দার্হ হইতে হয়। কিন্তু তাহাদের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব একদিন মানুষের মনের ও সমাজের নীতির পরিবর্তনসাধন করিতে সমর্থ হয়।

সুতরাং এই জাতিগত ও সমাজগত নীতিতত্ত্ব ব্যক্তিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যক্তিও আবার তেমনই নীতিতত্ত্বের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে।

পরিশিষ্ট

সমাজজীবন ও ইহার বহু সমস্যা লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সমাজের উৎপত্তি, ব্যক্তির সহিত সমাজের বাস্তব ও আদর্শ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। বর্তমান যুগে এই-সকল আলোচনা কেবল দার্শনিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বৈজ্ঞানিকরাও সমাজ-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হইয়াছেন। সমাজমনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া বিশদ আলোচনা করেন। আবার, সমাজ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উৎপত্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচ্য বস্তু। কিন্তু কেবল বৈজ্ঞানিক আলোচনার দ্বারা সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতি হওয়া অসম্ভব। সমাজের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হইলে, মানুষ বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার করিয়া সমাজ ও সভ্যতার ধ্বংসসাধন করিবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) সত্যই বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল—হয় সকলেই জীবিত থাকিবে, নতুবা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ("Science has made it inevitable that all must live or all must die.") সুতরাং সমাজের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে সমাজদর্শনের আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সমাজদর্শন

কিন্তু প্রাচীন দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা যে-সকল আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তব-সম্পর্ক-বিহীন (Utopia) এবং তাহা চিরকাল কল্পনাতেই পর্যবসিত থাকিবে, বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিবে না। তথাপি এই-সকল আলোচনা মূল্যহীন নহে, আমাদের বর্তমান সমস্যার আলোচনায় তাঁহাদের আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা যথেষ্ট আলোকপাত করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের আলোচনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে যে-সকল সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছে, দার্শনিকেরা বহু পূর্ব হইতেই সেই-সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

সমাজদর্শনের প্রাচীন আলোচনা

তবে বৈজ্ঞানিকের আলোচনা-পদ্ধতি ও দার্শনিকের আলোচনা-পদ্ধতি ভিন্ন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইল পর্যবেক্ষণমূলক, আর দার্শনিক পদ্ধতি চিন্তামূলক। বৈজ্ঞানিকদের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল বাস্তবতত্ত্ব, আর দার্শনিকরা আলোচনা করেন মূল্য, লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়া।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দার্শনিক পদ্ধতি

আদর্শ সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন। সেণ্ট অগস্টাইন (St. Augustine) পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তোলাকেই সমাজের আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। বেন্থাম (Bentham) অধিকসংখ্যক ব্যক্তির জন্য অধিক-পরিমাণ সুখের ব্যবস্থা করাকেই সামাজিক আদর্শ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্লেটো মনে করিতেন, জ্ঞানী, গুণী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সৃষ্টি করাই সমাজের আদর্শ হওয়া উচিত; আর নীৎসের (Nietzsche) মতে অতিমানব (Superman) সৃষ্টি করাই সমাজের চরম আদর্শ। যাহা হোক যদি দার্শনিকরা আদর্শ সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদিগকে সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত দিতে পারেন, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকগণ সেই আদর্শকে লাভ করিবার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দিতে সক্ষম হন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, আদর্শ সমাজের মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী ধারণা বর্তমান থাকে, যাহার জন্য আদর্শকে লাভ করা সমাজের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। আবার, আদর্শ সমাজের আকার বা গঠন সম্পর্কেও দার্শনিকগণ একমত নহেন। মানুষ যে আদর্শ-সমাজের কল্পনা করে, তাহা কতকগুলি ব্যক্তির পক্ষে বা সমাজের কোন বিশেষ স্তরে বা কোন একটি বিশেষ সময়ের জন্য আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ আদর্শকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলা যায় না।

আদর্শ সমাজের প্রকৃতি

সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কেও ইতিহাসে দুই প্রকারের মতবাদ প্রচলিত আছে। কাহারও কাহারও মতে মানুষ যখন আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে একত্র হইয়া বসবাস করে, তখনই সমাজ গঠিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির একত্র সমাবেশকে সমাজ বলে। ব্যক্তির সমষ্টি ব্যতীত সমাজ হইতে পারে না, সুতরাং সমাজ কেবলমাত্র ব্যক্তির সমষ্টি। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, সমাজ কেবলমাত্র ব্যক্তির সমষ্টি নহে, সমাজের স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব আছে।

সমাজ ও ব্যক্তি

সমাজের সত্তা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নহে, উপরন্তু ব্যক্তিই সমাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই মতবাদ হইতেই একনায়কতন্ত্র, নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

গোষ্ঠী-মনের স্বতন্ত্র সত্তা

বর্তমানে ইহা হইতেই গোষ্ঠী-মনের ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। কতকগুলি ব্যক্তি একত্র হইয়া যখন কোন গোষ্ঠী গঠন করে, তখন গোষ্ঠীর সত্তা ব্যক্তির সত্তা হইতে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে। ম্যাকডুগাল (McDougall) ও অন্যান্য দার্শনিকরা গোষ্ঠী-মন ও সমাজ-মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

সমাজ ও জনতা

তবে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যতীত সমাজের অস্তিত্বের কল্পনাও করা যায় না। সমাজকে এইজন্য সামাজিক সম্পর্কের জাল বলা হয়। এইখানেই সমাজের সহিত জনতার পার্থক্য। জনতা৭ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি, যাহারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে অল্পক্ষণের জন্য সমবেত হয়। কিন্তু এইরূপ জনতাকে মানুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমষ্টিগতভাবে অবস্থানের সহিত এক করিয়া দেখিলে চলিবে না। কারণ, সমাজবদ্ধ হওয়া ও সামাজিক হওয়া এক কথা নহে (Social is not the same as Sociable)।

জনতার প্রভাব

জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা তাহাদের স্বাভাবিক সংযত স্বভাব হারাইয়া অসংযত প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত হইয়া থাকে। অনেক সম্মানিত ও মহৎ ব্যক্তিও জনতার অন্তর্ভুক্ত হইলে কাহাকেও আক্রমণ করিবার জন্য বা হত্যা করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া থাকেন। এইরূপ অদ্ভুত, অস্বাভাবিক আচরণকে তাঁহাদের স্বভাব-বহির্ভূত আচরণ বলা যায় না। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত আক্রমণাত্মক ইচ্ছাই (aggressive desire) জনতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় এইরূপ মনোভাবের প্রকাশ সমাজে স্বীকৃত নহে বলিয়া ব্যক্তি নিজেকে সংযত করিয়া রাখে। কিন্তু জনতার প্রভাবে ব্যক্তির সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া যায়।

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তির সমস্ত কার্যের জন্য ব্যক্তি সমাজের নিকট দায়ী থাকে। বৈজ্ঞানিক নিজেকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও তাহার দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। অপর-

পক্ষে একজন অপরাধী বা অন্যায়কারী সমাজের সহিত গভীরভাবে যুক্ত থাকিলেও সে সমাজের বোঝাস্বরূপ ও কলঙ্কবিশেষ। এইজন্য যে-ব্যক্তি সমাজবহির্ভূত বা যে সমাজ হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে, তাহাকেও উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সমাজের নিকট সে তাহার নিজস্ব কার্যাবলীর জন্য দায়ী। এইজন্য ব্যক্তির আচরণ সর্বদা, শান্ত, সংযত ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান সমাজে এইরূপ আচরণের একান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্তি ও সমাজ

সমাজদর্শনই এইরূপ ক্ষেত্রে সমাজকে ও জনসাধারণকে রক্ষা করিতে পারে। কিরূপভাবে সমাজকে আদর্শের পথে পরিচালিত করিতে হইবে এবং সামাজিক আচরণকে সংযত করিতে হইবে, সমাজদর্শন তাহার উপায় প্রদর্শন করে। সমাজদর্শনের সাহায্যে ব্যক্তি সমাজের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকারী হইতে সমর্থ হইবে।

সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানে জাতিতে ঐক্য-স্থাপনকে কেবলমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না, তাহাকে বাস্তবে পরিণত করাই বর্তমান সমাজের অবশ্যকর্তব্য। আন্তর্জাতিক ঐক্য ও শান্তি-প্রতিষ্ঠাই আধুনিক যুগের একমাত্র কাম্য এবং ইহার দ্বারাই সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করা যাইতে পারে। কারণ, শান্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লাভ করিতে গেলেই অশান্তির উদয় হয়, শান্তি অবিভক্ত। বর্তমানে কোন দেশের পক্ষে নিরপেক্ষ হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করা অসম্ভব। যদিও বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক স্তর বিভিন্ন, তথাপি সমগ্র পৃথিবী অর্থনৈতিক ঐক্যের দ্বারা আবদ্ধ। এই-সকল কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা অবশ্য-প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগের এই বিরাট সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সমাজের কাঠামোকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া নূতন রূপদান করিতে হইবে। সামঞ্জস্যবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারের দ্বারা সমস্যাকে এক ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া অন্য ক্ষেত্রে স্থাপন করিলে আরও অনেক নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। একজন ম্যালেরিয়া-রোগীকে কুইনিন-সেবনের দ্বারা আরোগ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু সমগ্র দেশবাসীকে রোগমুক্ত করিতে হইলে কেবল কুইনিন-

পরিবেশ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

সেবনের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, সকলের প্রয়োজনমত কুইনিন, ডাক্তার বা শুশ্রূষাকারী সংগ্রহ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত ফলপ্রসূ কিছু করিতে হইলে পরিবেশের পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে। বর্তমান সমাজের সমস্যার সমাধান করিবার জন্য পরিবেশের পরিবর্তনসাধন একান্ত প্রয়োজন। সমাজের কাঠামোকে সম্পূর্ণ নূতনরূপে গড়িয়া সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে।

আধুনিক সমাজের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সমাজ সমষ্টির (collectivism) দিকে অগ্রসর হইতেছে। তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়া এইরূপ সমষ্টিবাদ কামনা করা উচিত হইবে না। বর্তমানে এমন সমাজ গঠন করা কর্তব্য, যেখানে চিন্তার স্বাধীনতা বজায় থাকিবে এবং ব্যক্তি সুস্থ সাম্প্রদায়িক জীবন (healthy communal life)-যাপনে সমর্থ হইবে। তখন আর গণ-আন্দোলনের জন্য জনসাধারণকে প্রবোচিত করিতে হইবে না। মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা ও সামাজিক সত্তা উভয়েরই মর্যাদা বজায় থাকিবে। ডাউনের (Doune) ভাষায় বলিতে গেলে, "no man is an island, entire of itself; every man is a piece of the world, a part of the main."

সামাজিক আদর্শ

এই আদর্শকে লাভ করিতে হইলে সমাজদর্শনকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের অন্তরের পরিবর্তনসাধন (change of heart) দ্বারাই আদর্শ সমাজ-গঠন সম্ভব হইতে পারে। সমাজদর্শন-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এইখানেই। সমাজদর্শন মানুষের অন্তরের পরিবর্তনসাধনে সমর্থ হইবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবেশেরও পরিবর্তনসাধন করা প্রয়োজন। কারণ, নূতন পরিবেশের উপরেই মানুষের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভরশীল। পরিবেশের পরিবর্তনসাধন করিতে না পারিলে সমাজদর্শনের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। সুতরাং সমাজদর্শন যে-আদর্শ নিরূপণ করিবে, সেইরূপভাবে সমাজকে গঠন করিতে পারিলে আদর্শকে লাভ করা সহজতর হইবে। ব্যক্তির সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন আদর্শকে লাভ করা সম্ভব নহে। যে-অবস্থার দ্বারা এইরূপ সহযোগিতালাভ সম্ভব হয়, সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করাই হইল প্রকৃত পরিবেশ। সমাজের সকল ব্যক্তির দাবি সমান। তাই সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা-দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্য

আদর্শকে লাভ করিবার উপায়

সমাজের সকল কার্য জনসাধারণের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে করা কর্তব্য। কারণ, জনকল্যাণসাধনই সমাজদর্শনের আদর্শ এবং সামাজিক সকল রীতি-নীতির মাধ্যমেই জনকল্যাণ সাধন সম্ভবপর।

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমাজদর্শন আদর্শের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আদর্শকে লাভ করিবার উপায়ও নিরূপণ করে। সমাজদর্শন অবশ্য বাস্তবজীবনের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে ব্যক্তির অধিকার, দাবি ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কাজেই সমাজদর্শনের আলোচনাই মানুষকে আদর্শ এবং দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত করিতে পারে।

সমাজদর্শনের প্রদর্শিত উপায়ের দ্বারাই জগতে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বভাব গড়িয়া তোলা সম্ভবপর। সমাজদর্শনই সমাজকে আদর্শের পথে পরিচালিত করিতে পারে। যদিও সর্বোচ্চ আদর্শকে লাভ করা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না, আদর্শ চিরকাল আদর্শরূপেই বিরাজ করিবে, তথাপি আদর্শকে লাভ করিবার চেষ্টার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে মানুষের পরম কল্যাণ। ইহার দ্বারাই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিবে এবং সমাজেরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সর্বোচ্চ আদর্শকে সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমাজ অগ্রসর হইতেছে তাহা হইল—

'সত্যং শিবং সুন্দরম্।'

সমাপ্ত

প্রশ্নাবলী

The Meaning and Scope of Social Philosophy

1. What do you mean by society? Discuss the different kinds of relationship found in the society. (পৃঃ ১-৩)
2. "Society is the changing pattern of social relationship"—Discuss. (পৃঃ ১-৩)
3. Clearly explain the meaning of Social Philosophy. (পৃঃ ৩-৬)
4. State clearly the epistemological and axiological aspects of Social Philosophy. (পৃঃ ৩-৬)
5. Indicate the scope of Social Philosophy. (পৃঃ ৬-১০)
6. Discuss the importance of the study of Social Philosophy. (পৃঃ ১০-১২)
7. "Social Philosophy is bound to be the golden crown of the social sciences",—Discuss. (পৃঃ ৬-১০)
8. Discuss the relation of Social Philosophy with Sociology. (পৃঃ ১৩-১৫)
9. What is the relation of Social Philosophy with Psychology? (পৃঃ ১৫-১৭)
10. Explain the relation between Social Philosophy and Politics. (পৃঃ ১৮-১৯)
11. Is there any distinction between Social Philosophy and Ethics? (পৃঃ ২০-২১)

The Social Nature of Man

1. "Man is essentially social"—Do you agree with this statement? If so, why? (পৃঃ ২৩-২৬)
2. Explain clearly three main aspects of human life and indicate their effects on society. (পৃঃ ২৩-২৬)

3. In what sense can man be called a 'social animal' ? (পৃ: ২২-২৬)

Society and the Individual

1. How do you explain the origin of society ? (পৃ: ২৮-৩১)
2. Critically examine the 'Social Cantract Theory' of the origin of Society. (পৃ: ২৯-৩৩)
3. Do you agree with Hobbes, Locke and Rousseau regarding the origin of Society. If not, why ? (পৃ: ২৯-৩৩)
4. Discuss the different theories regarding the relation between the Individual and the Society. Which of these theories do you accept, and why ? (পৃ: ৩৫-৩৯)

Individualism and Socialism

1. Discuss the different theories of the end and purpose of the State or Society. (পৃ: ৪০-৫০)
2. Do you agree with the view that individuals should be the slaves of the community as a whole ? (পৃ: ৪০-৪৩)
3. Is Socialism an ideal theory of the function of the State ? (পৃ: ৪৩-৪৪)
4. Critically explain the 'Laissez Faire' theory of the State. (পৃ: ৪০-৪৩)
5. State and examine the Marxian theory of the State. (পৃ: ৪৬-৪৯)

Society as an Organism

1. Discuss critically the Organic or Organismic Theory of the state. (পৃ: ৫০-৫৩)
2. Do you accept the view that Society is an Organism ? (পৃ: ৫০-৫৩)

3. What do you understand by 'Common Good'? State how this common good is to be realised.
(পৃ: ৫৩-৫৭)

4. Distinguish between 'General Will' and 'Common Good.' (পৃ: ৫৩-৫৭)

Social Groups and Social Institutions

1. Give a clear idea of the Structure of the Society. How do Social Groups and Institutions develop in society ? (পৃ: ৫৮-৬১)
2. State Maciver's classification of 'Interest' and explain how these interests form the basis of different Social Groups and Institutions. (পৃ: ৫৮-৬১)
3. Define a 'Social Group' and explain its nature. Distinguish between 'a quasi group' and a social group. (পৃ: ৬১-৬৩)
4. State the nature of different kinds of social groups. What are the effects of these different groups on society ? (পৃ: ৬৩-৬৫)
5. What do you understand by a Social Institution ? Can 'language' be called an institution ? (পৃ: ৬৫-৬৭)
6. What is Custom ? Distinguish between (a) Social Institutions and Social customs, (b) Institution and Association. (পৃ: ৬৭-৭০)
7. What various types of institutions are found in a society and how do they interact on each other ?
(পৃ: ৭০-৭৩)

The Family

1. Clearly explain the meaning of the Family and state the essential elements of it. (পৃ: ৭৪-৭৫)

2. What are the distinctive features of the Family ? (পৃঃ ৭৫-৭৮)

3. Name the different types of Family found at different places. (পৃঃ ৭৮-৮৩)

4. State the advantages and disadvantages of Hindu Joint-Family and explain the causes of its decay. (পৃঃ ৮৩-৮৪)

5. Explain and examine Morgan's view of the Origin of the Family and state what you think to be the real basis of the family. (পৃঃ ৮৪-৮৮)

6. What are the important functions of the Family ? Do you think that family is essential for the society ? (পৃঃ ৮৮-৯১, ৯২-৯৪)

7. State some of the important Problems of Family-Life and give an idea of its future. (পৃঃ ৯৪-৯৬)

Marriage

1. How and when did the Marriage System originate in the society and with what aims ? (পৃঃ ৯৬-৯৯)

2. What different Types of Marriage are prevalent in the society ? State, in this connection, the different Marriage-Systems of the Hindus. (পৃঃ ৯৯-১০৩)

3. Is the Divorce-System beneficial to the society ? Give your own views. (পৃঃ ১০২-১০৬)

4. What will be the condition of marriage and family in future ? Explain clearly. (পৃঃ ১০৬-১০৮)

Community

1. What is a Community ? What are the bases and characteristics of the community ? (পৃঃ ১০৯-১১১)

2. Distinguish between Community and Association. Is modern civilisation harmful to the small communities of the world ? (পৃ: ১১১-১১৩)

State

1. Give a definition of the State and indicate its essential elements. (পৃ: ১১৪-১১৮)
2. Give a critical statement of the different theories of the Origin of State. (পৃ: ১১৮-১২২)
3. What factors, according to you, are responsible for the development of the State ? (পৃ: ১২৩-১২৪)
4. Is the basis of the state natural or artificial ? (পৃ: ১২৪-১২৬)
5. "Will, and not force is the basis of the state." —Discuss. (পৃ: ১২৬-১২৮)
6. Describe the State's function as a law-giver. (পৃ: ১২৮-১৩০)
7. Discuss the relation of (a) the state with society ; (b) the state with the family. (পৃ: ১৩০ ও ১৩৩-১৩৫)
8. What are the main functions of the State ? (পৃ: ১৩১-১৩৩)
9. What should be the State's proper relation with education and morality. (পৃ: ১৩৫ ও ১৩৬-১৩৮)
10. How would you classify forms of Government ? (পৃ: ১৩৮)
11. What, according to you, is the best form of Government ? (পৃ: ১৪২-১৪৪)
12. Explain and examine different theories of the nature of the State. (পৃ: ১৪৬-১৫২)
13. What, according to you, should be the future of the State ? (পৃ: ১৫২-১৫৪)

Church

1. What is a Church? What are its important functions? (পৃ: ১৫৫-১৫৬)
2. Critically discuss the Influence of the Church on Society. (পৃ: ১৫৭-১৫৯)
3. What should be the proper relation of the Church with the State? (পৃ: ১৫৯-১৬০)
4. What, according to you, should be the Role of the Church for the improvement of the society? (পৃ: ১৬০-১৬২)

Educational Institutions

1. How would you define Education? What are the aims of education? (পৃ: ১৬৩-১৬৪)
2. What are the basic principles of different educational institutions? How do these institutions help the proper development of children? (পৃ: ১৬৪-১৬৭)
3. State some of the important functions of the educational institutions? What, according to you, should be the method of teaching in educational institutions? (পৃ: ১৬৭-১৬৯)
4. Write short notes on (a) Technical Education; (b) Supplementary Education; (c) higher Education and (d) Education and Leisure. (পৃ: ১৬৬, ১৬৯-১৭২)
5. Should the State actively participate in the field of education? (পৃ: ১৭২-১৭৪)

Cultural Associations

1. What do you mean by Culture? Distinguish between Culture and Civilisation. (পৃ: ১৭৫-১৭৮)

2. What are the distinctive aspects of cultural associations ? Explain the social significance of culture. (পৃ: ১৭৯-১৮১)

Social Development

1. What do you mean by social development ? What, according to Hobhouse, are the conditions of Social development ? (পৃ: ১৮২-১৮৯)

Social Ideal

1. Explain the general significance of Social ideals. What, according to Mackenzie, should be the ideals of society ? (পৃ: ১৮৯-১৯৩)
2 What factors, according to you, are necessary for making the Society an ideal one ? (পৃ: ১৯৩-২০০)

Herd Sentiment

1. What is a 'herd ?' What is the social significance of herd sentiment ? Is interest the basis of herd sentiment ? (পৃ: ২০১-২০২)
2. Define 'crowd' and state its characteristics. What is the difference between a crowd and a herd ? (পৃ: ২০২-২০৪)
3. When and how do herd sentiments manifest in society ? (পৃ: ২০৪-২০৫)

Common Interest

1. Explain clearly the meaning of interest. What are the different types of interest ? (পৃ: ২০৬-২০৯)
2. Explain the relation between associations and interests. (পৃ: ২০৯-২১১)

Religion

1. What is religion ? Explain the Social significance of religion. (পৃ: ২১২-২১৫)

2. What do you know about the origin of religion ? Explain the different theories regarding the origin of religion. (পৃ: ২১৫-২২৬)
3. Explain and examine the different theories of Naturalism. (পৃ: ২১৭-২২৩)
4. "Religion is the opium of the masses."—Do you agree with this view ? (পৃ: ২২৩-২২৬)
5. Explain critically the Marxist interpretation of religion. (পৃ: ২২৩-২২৬)
6. Consider religion as a cohesive force. (পৃ: ২২৬-২২৯)
7. What, according to you, should be the proper aim of religious education ? Explain in this connection the role of religion to-day. (পৃ: ২২৯-২৩১)

Social Pathology

1. What is crime ? What are its main causes ? (পৃ: ২৩২-২৩৪)
2. Define law. How do you account for the origin of law ? (পৃ: ২৩৫-২৩৭)
3. What do you mean by punishment ? (পৃ: ২৩৪-২৩৫)
4. What is the social justification for punishment ? Explain and examine in this connection the different theories of punishment. (পৃ: ২৩৭-২৪০)
5. Explain the psychological interpretation of punishment. (পৃ: ২৪২-২৪৫)
6. What are social evils ? How do they originate ? What measures, can you adopt for checking social evils. (পৃ: ২৩২-২৩৪, ২৪৫-২৪৬)

Social Evolution and Social Progress

1. Clearly explain the meaning of evolution. Discuss Spencer's view of the evolution of society. (পৃ: ২৪৭-২৪৯)

2. Distinguish between social evolution and social progress. (পৃঃ ২৪৯-২৫০)
3. What do you understand by social progress? What are the different aspects of social progress? (পৃঃ ২৫০-২৫৪)
4. What measures can you adopt for the progress of the society? What are the hindrances to social progress? (পৃঃ ২৫৪-২৫৬)

The Social Self

1. What do you mean by social self? Describe how the social self is to be realised. (পৃঃ ২৬০-২৬২)

The Ethos of a People

1. What is the meaning of ethos? Explain the significance of the ethos of a people. (পৃঃ ২৬২-২৬৪)
2. Write a short essay on Social Philosophy and indicate its utility as a course of study. (পৃঃ ২৬৫-২৭০)